এমন ছিলেন তিনি

মূল ঃ ড. ইউসুফ কারজাভী
অনুবাদ ঃ ইয়াহইয়া ইউসুফ নদভী

লেখক ও কিতাব পরিচিতি

ড. ইউসুফ কারজাভী। আরব দুনিয়ার সাড়া জাগানো লেখক-সাহিত্যিক ও কবি। জগতখ্যাত ইসলামী চিন্তাবিদ। আরব জাহানসহ বিশ্বময় ইসলামের দাওয়াত প্রচারে ক্লান্তিহীন .. শ্রান্তিহীন। প্রকাশিত গ্রন্থের সংখ্যা শতাধিক। *'ফিকহুয যাকাত'* তাঁর আলোড়ন সৃষ্টিকারী কিতাব। মিসরের জগদ্বিখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয় আল আযহার-এর অন্যতম শ্রেষ্ঠ কৃতিসন্তান। ছাত্রজীবনেই তিনি ইখওয়ানুল মুসলিমীন-এর চিন্তাধারায় জড়িয়ে পড়েন। এজন্য তাকে স্বৈরাচারী জামাল আবদুন নাসেরের প্রচন্ড রোষে পড়ে মিশর ছাড়তে হয় এবং কাতারে আশ্রয় নিতে হয়। কর্মজীবনের বসন্তকাল কেটেছে কাতার বিশ্ববিদ্যালয়ে। এখনো তিনি সেখানেই কর্মরত। একজন সুবক্তা ও বাগ্মী হিসাবে তিনি খ্যাতিমান ও শ্রোতা-নন্দিত। ১৯৫১ সালে শায়খ নদভী'র সাথে তাঁর সাক্ষাত ও ঘনিষ্ঠতা হয়। তিনি নিজেকে শায়খ নদভী'র ছাত্র বলে গর্ব করেন।

'সায়্যিদ আবুল হাসান আলী নদভী ঃ এমন ছিলেন তিনি' কিতাবটি লেখকের একটি অনবদ্য সৃষ্টি এবং শায়খ নদভীর সব্যসাচী জীবন-দর্শনের আলো ঝলমলে নির্ভার উপস্থাপনা এবং তাঁর চিন্তাদর্শনের উপর অপূর্ব ও ব্যঞ্জণাময় পরিবেশনা। কিতাবটিকে আরো বাঙময় করে তুলেছে শিল্প-সাহিত্য ও ভাব প্রাচুর্যের সুসংহত মিশেল। আমাদের নিশ্চিত বিশ্বাস কিতাবটি পাঠকের মন কাঁড়বে, চিন্তা নাড়াবে, বিবেক দুলাবে এবং পাঠককে শায়খ নদভীর জীবন দর্শনের ছায়ায় গিয়ে দাঁড়ানোর স্বপ্ন দেখাবে। আমরা লেখকের দীর্ঘ জীবন কামনা করি।

—অনুবাদক

সায়্যিদ আবুল হাসান আলী নদভীঃ

এমন ছিলেন তিনি

মূল

ড. ইউসুফ কারজাভী

অনুবাদ

ইয়াহইয়া ইউসুফ নদভী

প্রকাশনায়

রাহনুমা প্রকাশনী ™

সায়্যিদ আবুল হাসান আলী নদভীঃ

এমন ছিলেন তিনি

মূল ঃ ড. ইউসুফ কারজাভী
অনুবাদ ঃ ইয়াহইয়া ইউসুফ নদভী

প্রকাশক
রাহনুমা প্রকাশনী
মেরুল বাড্ডা, ঢাকা-১২২৯
মোবাইল ঃ ০১৭৬২-৫৯৩৩৪৯, ০১১৯৭-৩৯৭৩৩৯, ০১৭২৩-০১৬৬২৬

পরিবেশক
মাকতাবাতুল আযহার
মধ্য বাড্ডা, মোল্লা পাড়া, আদর্শ নগর, ঢাকা।
ফোন ঃ ০২-৯৮৮১৫৩২, মোবাইল ঃ ০১৯২৪-০৭৬৩৬৫, ০১৭১৫-০২৩১১৮

প্রথম প্রকাশ–
জানুয়ারী-২০১২

ISBN 978-984-33-3778-8

মুদ্রণ
আইফা প্রিন্টিং এন্ড প্যাকেজিং
মেরুল বাড্ডা, ঢাকা-১২২৯

হাদিয়া
২৭০/- (দুইশত সত্তর টাকা মাত্র)

অনুবাদকের কথা

এক.

অনেক অপেক্ষার পর অবশেষে ***'সায়্যিদ আবুল হাসান আলী নদভী ঃ এমন ছিলেন তিনি'*** প্রকাশিত হলো। সমস্ত প্রশংসা শুধু আল্লাহর জন্যে— আল-হামদুলিল্লাহ। বইটির মূল লেখক ড. ইউসুফ কারজাভী। আরব দুনিয়ার তারকা-লেখক তিনি। জগতখ্যাত ইসলামী চিন্তাবিদ তিনি। আরব জাহানসহ বিশ্বময় ইসলামের দাওয়াত প্রচারে ক্লান্তিহীন.. শ্রান্তিহীন তিনি। তাঁর লেখা প্রকাশিত গ্রন্থের সংখ্যা অনেক আগেই একশত ছাড়িয়ে গেছে। তাঁর দেশ মিসর। পড়াশোনা করেছেন আযহারে। কর্মজীবনের বসন্তকাল কেটেছে কাতার বিশ্ববিদ্যালয়ে। এখনো তিনি সেখানেই কর্মরত। ছাত্রজীবনেই তিনি ইখওয়ানুল মুসলিমীন-এর সাথে জড়িয়ে পড়েন। সংগঠনটির প্রতিষ্ঠাতা শায়খ হাসানুল বান্না রহ. কে তিনি খুব ভালোবাসতেন। তাঁর মুগ্ধ গুণগ্রাহী ছিলেন তিনি।

শায়খ নদভী রহ. কেও তিনি ভীষণ ভালোবাসতেন। এ-কিতাব তার জ্বলন্ত সাক্ষী। আবেগ-অনুভূতি ও শিল্প-সাহিত্যের মিশেলে সুবিজ্ঞ এক গবেষকের প্রজ্ঞায় তিনি এ-কিতাবে শায়খ নদভী'র জীবন ও চিন্তা-দর্শনকে চিত্রিত করেছেন। শায়খ নদভীর দাওয়াতের তত্ত্ব-দর্শনের উপর ব্যাপক আলোকপাত করেছেন। শায়খ নদভী'র চিন্তা-চেতনা-মনন-মনীষাকে তিনি প্রাঞ্জল ও শিল্পময় ভাষায় এ-কিতাবে তুলে ধরেছেন। ১৯৫১ সাল থেকেই তিনি শায়খ নদভী'র পরশ ও সান্নিধ্যে গর্বিত ও মুগ্ধ। সে কথা তিনি নিজেই বলেছেন এ-কিতাবের জায়গায় জায়গায়। এ-কিতাবের এক জায়গায় শায়খ নদভী সম্পর্কে নিজের ভালোবাসার কোমল অনুভূতির কথা তিনি বলেছেন বড়ো আবেগ-উদ্বেল ভাষায়, নমুনা লক্ষ্য করুন :

'হ্যাঁ.. তিনি আমার কাছের মানুষ, প্রিয় মানুষ, ভালোবাসি আমি তাঁকে। এ ভালোবাসা— আল্লাহ্র জন্যে নিবেদিত ভালোবাসা। আমি তাঁকে ভালোবেসেছি— তাঁর দুনিয়া বিরাগের জন্যে,তাঁর ইখলাস ও একনিষ্ঠার জন্যে, তাঁর রাব্বানিয়াত ও আল্লাহমুখী জীবনাচারের জন্যে, তাঁর ইয়াকিন ও দৃঢ় বিশ্বাসের জন্যে, তাঁর তাওয়াক্কুল, অবিচল আস্থা ও বিশ্বাসের জন্যে। তাঁকে আমি ভালোবেসেছি— উম্মাহর জন্যে তাঁর জ্বলন ও দরদের জন্যে, তাঁর আত্মসম্মানবোধের জন্যে, তাঁর মধ্যপন্থা ও সত্যিকারের উদারতার জন্যে। তাঁকে আমি ভালোবেসেছি— কেননা তাঁর চিন্তাধারা ঝরনা-স্বচ্ছ, নির্মেঘ আকাশের মতো পরিচ্ছন্ন। তাঁকে আমি ভালোবেসেছি— কেননা তাঁর হৃদয় হিংসামুক্ত। তাঁর আকিদা-বিশ্বাসে নেই শিরকের কোনো কায়া ও ছায়া, তাঁর লেখায়-কথায়

নেই অন্যের প্রতি আক্রমণ ও বিষোদগার কিংবা শর-বর্ষণ, না স্পষ্ট, না ইশারা! যা কিছু মৌলিক ও গুরুত্বপূর্ণ, ভাবতেন তিনি শুধু তা-ই নিয়ে। বাহ্যিকতার ঝলমলে আভরণ নয়— দেখতেন তিনি অন্তর্নিহিত তাৎপর্য ও গূঢ় রহস্য। কথা নয়— দেখতেন তিনি কাজ। বাহির নয়— দেখতেন তিনি ভিতর। তাঁকে আমি ভালোবেসেছি— তাঁর সুকুমারবৃত্তি ও আদর্শ উন্নত চরিত্র সুষমায় অভিভূত হয়ে। তাঁর উপর নববী উদ্যানের ফুলেল ছাউনি দেখে। আমি তাঁকে ভালোবেসেছি— তাঁর সহজ সরল স্বভাবে মুগ্ধ হয়ে। ঈমানের অন্যতম অঙ্গ— লজ্জার পোশাকে তাঁকে ভূষিত দেখে। মুসলিম উম্মাহর কঠিন দুর্দিনে তাঁর হৃদয়ের রক্তক্ষরণ দেখে। আর তাদের সুদিনে শিশুর মতো আনন্দোদ্বেল হতে দেখে। তাঁর প্রতি এই-যে আমার ভালোবাসা ও শ্রদ্ধাঞ্জলি— আল্লাহ্‌র নৈকট্য লাভের জন্যে এ-ই আমার শ্রেষ্ঠ পূঁজি!!'

দুই.

পাঠক! শায়খ নদভীকে নিয়ে এমন করেই .. এমন ভাষাতেই এঁকেছেন ভালোবাসার এ-পঙতিমালা। আরব দেশের এই জীবন্ত কিংবদন্তী'র মতো আমিও শায়খ নদভীকে ভালোবাসি। কেনো আমি তাঁকে ভালোবাসি? এ-ভালোবাসা আমার ভাগ্যে লেখা ছিলো বলে, ক'জন পারে আল্লাহওয়ালাদেরকে ভালোবাসতে? তাই বলি; আমার ভাগ্যের পুষ্পিত উদ্যানের সর্বশ্রেষ্ঠ ফুল এ-ভালোবাসা।

এ-ভালোবাসার শিকড় অনেক গভীরে প্রোথিত। যখন আমি সেই কিশোর.. নদওয়ার ছাত্র, তখন থেকেই হৃদয়ে রোপন করেছিলাম আমি, ভালোবাসার এ-সবুজ চারা। তাঁকে দেখার আগেই। তাঁর কিতাব পড়েই। যে-সব কিতাব আমাকে বাধ্য করেছিলো তাঁকে ভালোবাসতে তা হলো— ঈমান যখন জাগলো। আরকানে আরবা'আ। শিশু-পাঠ্য-সিরিজ— কাসাসুন্নাবিয়্যিন, আল-ক্বিরাআতুর রাশিদা। এ-সব কিতাব পড়তে পড়তেই আমি শুনতে পেয়েছিলাম একটা অদৃশ্য কণ্ঠ— *ছুটে এসো না দারুল উলুম নদওয়াতুল উলামায়! এসে দেখে যাও তোমার প্রিয় মানুষটিকে!* আমি সাড়া দিয়েছিলাম সে ডাকে! ছুটে গিয়েছিলাম নদওয়ায়! চোখে মুগ্ধতা নিয়ে! বুকে স্বপ্ন নিয়ে! সেখানকার একজন নগন্য ছাত্র হতে এবং সরাসরি তাঁরও ছাত্র হওয়ার মহা গৌরব অর্জন করতে!

তিন.

পাঠক! নদওয়ায় যাওয়ার .. সেখানে গিয়ে তাঁকে অনেক কাছ থেকে দেখার .. এবং তাঁকে ভালোবাসার খণ্ড খণ্ড তিথিগুলোর ষোলকলায় পূর্ণ হওয়ার যে-স্মৃতিটা আমি এতোদিন বয়ে বেড়াচ্ছিলাম, তা এখন বলছি, সংক্ষেপে, অতি সংক্ষেপে। কারণ এ-কিতাব অনুবাদের সাথে তার একটা গভীর সম্পর্ক আছে।

চার.

আমি নদওয়ায় পৌঁছেই প্রথমে খবর নিলাম, হযরত মাওলানা কোথায়? জানতে পারলাম, রায়বেরেলীতে। আসবেন আগামীকাল। আমার অপেক্ষায় অনুপ্রবেশ করলো—অধীর অস্থিরতা। মনে হচ্ছিলো, আগামীকাল যেনো অনে-ক দূর! মাঝখানে পড়ে আছে দীর্ঘ কালো একটা রজনী। বিলম্বিত একটা ঊষা। প্রলম্বিত একটা সকাল। রাত কাটলে .. ঊষা হাসলে .. সকাল এলে— তবে আসবে আগামীকাল। তারপর আবার শুরু হবে নতুন অপেক্ষা, রায়বেরেলীর পথে তাকিয়ে থাকা। কখন আসবেন ভারত উপমহাদেশের সূর্য-পুরুষ? আরব-আজমের মহান বুযুর্গ? হিন্দুস্তানের প্রিয় নাম—(মাওলানা) আলী মিয়া?

আমি এ-সব ভাবতে ভাবতেই রাতে ঘুমোতে গেলাম। ভালো ঘুম হলো না। 'এই-জাগা .. এই-ঘুম' করে ভোর করলাম। ফজর পড়ে বিশালায়তন নদওয়া দেখতে বেরুলাম। চোখে বিস্ময় ছিলো। তারচে' বেশী মুগ্ধতা ছিলো। এতো সুন্দর মাদরাসা-পরিবেশ জীবনে এই প্রথম দেখলাম। তখন বন্ধুদের মুখে এই নদওয়া ও সেই হযরত সম্পর্কে আরো অনেক কিছু শুনলাম, জানলাম। পুষ্ট হতে লাগলাম। তৃপ্ত হতে লাগলাম। আশ্বস্ত হতে লাগলাম। প্রশান্ত হতে লাগলাম। আল্লাহর শোকর আদায় করতে লাগলাম।

পাঁচ.

পাঠক! '*অনুবাদকের কথা*'র ছোট্ট বেষ্টনীতে আবদ্ধ না-থাকলে আরো অনেক কথাই এখানে বলতে ইচ্ছে করছিলো। ঝাঁক-ঝাঁক স্মৃতি এখন আমার সঞ্চয়-ভাণ্ডারে উত্তাপ ছড়াচ্ছে।

ছয়.

একটু আগেই খবর পেলাম, হযরত মাওলানা এসে গেছেন! জোহরের ওয়াক্ত ছুঁইছুঁই। মসজিদে চলে গেলাম। বসলাম তিনি যেখানে বসেন তার কাছাকাছি। এখনো জায়গাটা খালি, এই বুঝি তিনি আসলেন! সবাই দৃষ্টি ফেরাচ্ছেন ছোট্ট ঐ প্রবেশদ্বারটায়। তাঁর হুজরার অদূরেই মসজিদের উত্তর পাশে ছোট্ট একটা সিঁড়ি আছে, ছোট্ট ছোট্ট ধাপের, এটা বেয়েই তিনি আসেন মসজিদে। সবাই অপেক্ষা করছেন, আমিও। অন্য অনেকের অপেক্ষার সাথে আমার অপেক্ষার মিল নেই। আমার গতকালের অপেক্ষার সাথেও আমার আজকের এই অপেক্ষার মিল নেই। আজকের অপেক্ষায় নেই সেই অস্থিরতা .. অধীরতা। এখন আমার অপেক্ষা সুধীর .. সুশান্ত। মসজিদের জান্নাতি আবহের সুনসান নীরবতায় সুগম্ভীর। এই অপেক্ষাময় পরিবেশটা আমার কাছে মনোলোভা মনে হচ্ছিলো। কান পাতলেই যেনো আমি শুনতে পাবো অদৃশ্য কণ্ঠে— *এই সময়! থেমে যাও! চলুক এই অপেক্ষা! মিষ্টি মিষ্টি অপেক্ষা! 'আলী মিয়া' সূর্যের উদয়নের অপেক্ষা! অপেক্ষার এমন মধুলগ্ন ক'বার আসে জীবনে?*

সাত.

একটু পর তিনি এলেন। সবাই তাকিয়ে ছিলেন তাঁর উদয়ের পথে, আমিও। অপলক। বিস্ময়-মুগ্ধতা নিয়ে। চোখ ভরে গেলো। মন ভরে গেলো। অনুভবে ঝড় উঠলো। চিন্তায় যেনো বান ডেকে গেলো। যেনো নূরের ফেরেশতা। যতোক্ষণ জামাত না-দাঁড়ালো, ততোক্ষণ আমি তাকিয়ে থাকলাম। আমার চোখের তারায় যেনো ফুটে উঠলো— শত উদ্যানের হাজার হাজার ফুটন্ত ফুলের মহিমা। আমার কানে যেনো বাজতে লাগলো সেই অদৃশ্য কণ্ঠটা—

তুমি ধন্য হলে!

তুমি ধন্য হলে!

তুমি ধন্য হলে!

আসলেই আমি ধন্য হলাম!

আট.

প্রিয় পাঠক!

এই হলেন আমাদের আলী মিয়া নদভী। তাঁকে নিয়েই লেখক সাজিয়েছেন এই কিতাব, তাঁকে ভালোবেসে। আর আমিও তা অনুবাদ করেছি, তাঁকে ভালোবেসে। আশা করি 'তুমি'ও তা পড়বে, তাঁকে ভালোবেসে। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস; এখানে 'তোমার' জন্যে অপেক্ষা করছে থরে থরে সাজানো— হীরে মোতি পান্না। অবশ্যই। কেননা এ-কিতাবে জমা করা হয়েছে তাঁর জীবনের সার-নির্যাস।

বলতে দ্বিধা নেই; এ-ধরনের একটি কিতাবের তীব্র অভাব অনুভূত হয়ে আসছিলো আমাদের দেশে, অনেকদিন থেকেই। আশা করি সে শূন্যস্থান কিছুটা হলেও পূরণ হবে।

নয়.

আমার এই পাণ্ডুলিপিটা আমি তুলে দিয়েছি *রাহনুমা প্রকাশনী*কে, কর্তৃপক্ষের আন্তরিকতায় সাড়া দিয়ে। দিশেহারা উম্মতের রাহনুমা (পথ প্রদর্শক) হোক— *রাহনুমা....*।

দশ.

ভুল থেকেই যেতে পারে। পাঠকের ক্ষমাসুন্দর উদারতা কামনা করছি। আরো কামনা করছি তাঁদের সুপরামর্শ। পাঠ-উত্তর অনুভূতি।

এগার.

হে আল্লাহ! এ কিতাব তুমি কবুল করো! আমাদের সবাইকে উপকৃত করো! উম্মতের মাঝে আরো *'আবুল হাসন আলী নদভী'* তৈরী করো! আমীন!!

বিনীত

ইয়াহইয়া ইউসুফ নদভী

অর্পণ

শায়খ নদভীকে যারা ভালোবাসেন ..
তাঁর কিতাব যারা পড়েন ..
তাঁর চিন্তা-দর্শন যারা চর্চা করেন ..
তাঁর দাওয়াতের কাজকে যারা নিজের কাজ মনে করেন ..
তাঁর রেখে-যাওয়া 'ইলমী-মিরাস'-এর উত্তরাধীকারী
হওয়ার যারা স্বপ্ন দেখেন...
তাঁর আহ্বানে সাড়া দিতে যারা গর্ববোধ করেন—
এমন 'নদভী-প্রেমিক'দের হাতেই অর্পিত হলো এ-কিতাব।

সূচীপত্র

দ্বিতীয় অধ্যায়

তৃতীয় অধ্যায়

চতুর্থ অধ্যায়

পঞ্চম অধ্যায়

উপসংহার

সায়্যিদ আবুল হাসান আলী নদভীঃ
মহা প্রস্থানের মুহূর্তে

উম্মতের শ্রেষ্ঠ বুযুর্গ ও শীর্ষসারির উলামায়ে কেরামের প্রস্থানের বছরে,
পবিত্র রমজান মাসের শেষ দশ দিনে,
সপ্তাহের সেরা দিন—জুমা'র দিনে,
অনেকের মতে ঈসায়ী সাল অনুযায়ী বিংশ শতাব্দীর শেষ লগ্নে,

জুমা'র নামাজের একটু আগে সায়্যিদ আবুল হাসান আলী নদভী ওজু করলেন। নামাজের প্রস্তুতি নিলেন। আজীবনের অভ্যাস অনুযায়ী সূরা কাহ্‌ফ তিলাওয়াত করতে বসলেন। একটু পর কী যেনো কী ভেবে কাহ্‌ফ শেষ না করেই সূরা ইয়াসিন শুরু করলেন। ঠিক তখনই—এই প্রিয় মুহূর্তেই আল্লাহ তাঁর এই প্রিয় বন্ধুকে ডেকে পাঠালেন নিজের কাছে! ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন!

সত্যি সত্যি চলে গেলেন আল্লাহ্‌র ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে এক মহান পুরুষ,
আল্লাহ্‌র পথের এক মহান দাঈ,
ইলমে ওহী'র আলোকস্নাত এক শ্রেষ্ঠ মনীষা,
খাঁটি আরব রক্তের এক গর্বিত বাহক,
হাসানী খান্দানের এক কৃতী সন্তান,
হিন্দুস্তানের মাটিতে জন্মগ্রহণকারী,
বিশ্বময় হিদায়াতের রৌশনি বিকীরণকারী,
উম্মতের রাহবার ও মুরুব্বী,
সত্যের বাণী উচ্চারণে চির অক্লান্ত,

কল্যাণের পথের আহ্বানে চির জাগ্রত বীর— সায়্যিদ আবুল হাসান আলী হাসানী নদভী, রাহমাতুল্লাহি আলাইহি!!

নতুন করে তাঁর পরিচয় তুলে ধরার কোনো অবকাশ কি আছে? নেই! আগে থেকেই তিনি সুপরিচিত। তাঁকে কোনো শব্দচিত্রে চিত্রিত করারও কোনো সুযোগ নেই, তা যতো সু-সংহতই হোক। শব্দচিত্রের সকল ক্ষুদ্রতা ও সীমাবদ্ধতা পেরিয়ে আপন মহিমায় তিনি মহিমান্বিত! আপন জ্যোতির্লোকে তিনি চির উদ্ভাসিত!!

***

এ-বছরটা (১৪২০ হিজরী মোতাবেক ১৯৯৯ ইংরেজী) ছিলো বিরহ-শোকের বছর। অশ্রু-ছলোছলো দৃষ্টিতে, শোক-কাতর হৃদয়ে এই বছরটাতে আমাদেরকে চিরবিদায় জানাতে হয়েছে অনেক শীর্ষস্থানীয় আলেম, বুযুর্গ ও ইসলামী মনীষীকে। এই শোকাবহ বিদায়ের সূচনা হয়েছিলো আরব মনীষী শায়খ আবদুল আযিয ইবনে আবদুল্লাহ্ ইবনে বায রহ. এর ইন্তেকালের মধ্য দিয়ে। এরপর চলে গেলেন আরব সাহিত্য জগতের নন্দিত তারকা-পুরুষ ও বিশিষ্ট ফিকাহতত্ত্ববিদ শায়খ আলী তানতাভী। এরপর একে একে আরো চলে গেলেন বিশিষ্ট ফিকাহতত্ত্ববিদ আল্লামা মুস্তফা আয-যারকা এবং প্রখ্যাত হাদীসবিদ শায়খ মুহাম্মদ নাসিরুদ্দীন আলবানী।

শোক-বিহ্বল মুসলিম হৃদয়ে শোকের সর্বশেষ আঘাতটি এসে লাগলো যখন এই 'বিদায়ী কাফেলা'র সাথে গিয়ে মিলিত হলেন আরব-আজমের আধ্যাত্মিক পুরুষ ও দিক দিশারী সায়্যিদ আবুল হাসান আলী নদভী।

শোকমথিত হৃদয়ে, আবেগপ্লাবিত কণ্ঠে আমি তাঁদের ওফাতের খবর জানিয়েছি মুসলিম উম্মাহকে বিভিন্ন প্রচার মাধ্যমের সুবাদে। কখনো মুখের কথায়, কখনো কলমের ভাষায় মুসলিম উম্মাহর কাছে আমি তাঁদের জীবন ও কর্মের কথা তুলে ধরেছি। জানিয়েছি মুসলিম উম্মাহর সাথে তাঁদের নিবিড় ঘনিষ্ঠতার কথা। কাতার ও আবুধাবি'র দুটি স্যাটেলাইট চ্যানেলে আমার নিয়মিত দু'টি অনুষ্ঠানে তাঁদের জীবন ও কর্ম এবং কীর্তি ও অবদান নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছি। এভাবে আল্লাহ্র মেহেরবানীতে কিছুটা হলেও তাঁদের হক আদায় করতে পেরেছি। নতুন প্রজন্মের কাছে এই মহান আকাবির কাফেলাকে তুলে ধরা— একটি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বও বটে। নতুন প্রজন্মকে অবশ্যই তাঁদের কথা— তাঁদের অবদান ও কীর্তির কথা জানাতে হবে। জানাতে হবে— তাঁরা দীনের জন্যে, দেশের জন্যে কী করেছেন, কী দিয়েছেন, কী বিলিয়েছেন, তাঁদের কল্যাণময় জীবনের বাঁকে-বাঁকে, তাঁদের ত্যাগ ও কুরবানী'র মঞ্জিলে-মঞ্জিলে এবং তাঁদের দান ও অনুগ্রহের উচ্ছল প্রবাহে-প্রবাহে।

সুতরাং আমি আমার এই দায়িত্ববোধ থেকেই শায়খ নদভীকে নিয়েও হৃদয়-মন উজাড় করে কথা বলেছি। ইতিপূর্বে তাঁকে নিয়ে যখন যা লিখেছি তা থেকেও আমি এ-বই রচনায় সাহায্য নিয়েছি।

এই আল্লাহওয়ালা প্রিয় মানুষটিকে নিয়ে আলোচনা করতে আমার বিবেকই আমাকে তাড়িত করেছে। বারবার। অনেকবার। কিন্তু তাঁর ইন্তেকালের পর তাঁকে নিয়ে আরো বলতে, আরো লিখতে আমি প্রবলভাবে আলোড়িত হই। তাঁকে নিয়ে আমাকে বলতেই হবে। তাঁকে নিয়ে আমাকে লিখতেই হবে। এ আমার এক পবিত্র দায়িত্ব। কারণ—

তিনি ছিলেন আরব-আজমের আধ্যাত্মিক রাহবার!

তিনি ছিলেন রাব্বানী— আল্লাহওয়ালা বুযুর্গ!

তিনি ছিলেন ইসলামের বীর সিপাহসালার!

তিনি ছিলেন কুরআনের মানুষ— কুরআন ছিলো তাঁর ধ্যান-জ্ঞান— গভীর ভালোবাসা! কুরআন মিশেছিলো তার রক্তে-মাংশে, অস্থি-মজ্জায়!

তিনি খান্দানে মুহাম্মদী'র গর্বিত বংশধর!

তিনি আমার ভাই, আমার শায়খ!

তিনি আমার ভীষণ প্রিয় মানুষ!

তাঁর মৃত্যুশোক আমাকে তো কাঁদাবেই!

তাঁর মহান জীবনগাথা ও অমর কীর্তিগাথা উম্মতের সামনে তুলে ধরতে কেনো আমি পিছিয়ে থাকবো?

তিনি যখন শায়খে রাব্বানী

হ্যাঁ .. আমার নি:সংকোচ উচ্চারণ— তিনি ছিলেন শায়খে রাব্বানী। আল্লাহ্‌র ওলী। আমাদের সালাফ ও পূর্বসুরীগণ বলে গেছেন এক সুরে এক কণ্ঠে: রাব্বানী হলেন তাঁরাই, যাঁরা শেখেন, আমল করেন অতঃপর অন্যকে শেখান। সুতরাং শিখেও যিনি আমল করলেন না, মোটেই তাকে রাব্বানী বলা যায় না। বরং এ-'জানা'ই তার জন্যে কাল হয়ে দাঁড়াবে। তার এই 'জানা' তার কোনো কাজে আসবে না। কোনো উপকারে আসবে না। এ ধরনের জ্ঞান থেকে আল্লাহ্‌র নবীও পানাহ চেয়েছেন:

اللهم إني أعوذبك من علم لاينفع ومن قلب لايخشع.

'হে মালিক! এমন ইলম দিয়ো না তো আমায়, যা কোনো কাজেই লাগে না! এমন হৃদয়ও চাই না আমি যা তোমার ভয়ে ভীত হয় না!'

আর যিনি নিজে শিখে আমল তো করলেন কিন্তু অন্যকে জানালেন না, তিনিও রাব্বানী নন। আল্লাহ্‌র ইরশাদ:

وَلَكِنْ كُونُوا رَبَّانِيِّين بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُون الْكِتَابَ وَبِمَا كُنتُمْ تَدْرُسُون.

'তোমরা রাব্বানী (আল্লাহ্ওয়ালা) হয়ে যাও আগের মতো, যেভাবে তোমরা কিতাব শেখাতে এবং নিজেরাও শিখতে।' -আলে ইমরান:৭৯

সুতরাং যিনি শিখবেন আমল করবেন অত:পর অন্যকেও শেখাবেন তিনিই প্রকৃত রাব্বানী বা আল্লাহ্ওয়ালা। হ্যাঁ... তাঁকে ঘিরেই উচ্চারিত হতে পারে উর্দ্ধলোকের এই মহান স্তুতিগাথা:

وَمَنْ أَحْسنُ قَوْلاً مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللّهِ وَعَمِلَ صَالِحاً وَقَالَ إِنَّنِي مِنْ الْمُسْلِمِين.

'তারচে' উত্তম আর কে হতে পারে— যে আল্লাহ্র দিকে ডাকে, সৎ কর্ম করে আর বলে: আমি মুসলমানদেরই একজন!' -ফুসসিলাত:৩৩

'রাব্বানিয়্যাহ' শব্দটি শায়খ নদভী তাযকিয়া বা আত্মশুদ্ধি অর্থে ব্যবহার করেছেন। কুরআনে কারীম যার ব্যাপারে সীমাহীন গুরুত্ব দিয়েছে এবং নবীওয়ালা কাজের একটি বুনিয়াদী অংশ হিসাবে সাব্যস্ত করেছে। শায়খ নদভী 'ইহসান' অর্থেও এ-শব্দটি ব্যবহার করেছেন যা হাদীসে জিবরীলে এভাবে বিধৃত হয়েছে:

'أن تعبد الله كأنك تراه فإن م تكن تراه فإنه يراك.

'এমনভাবে তোমাকে আল্লাহ্র ইবাদত করতে হবে যেনো তুমি তাঁকে দেখছো, আর যদি তুমি তাঁকে দেখতে না পাও তাহলে তিনি তোমাকে অবশ্যই দেখছেন।'

এ বিষয়টি শায়খ নদভী আলোচনা করেছেন তাঁর ছোট্ট অথচ সীমাহীন গুরুত্বপূর্ণ একটি কিতাবে— 'ربانيـــة لا رهبانيـــة' (রুহবানিয়াত নয়— চাই রাব্বানিয়াত)। এই কিতাবে তিনি বলে দিয়েছেন আল্লাহ্র পথের ঠিকানা, নিন্দনীয় বিদ'আত ও বাড়াবাড়িকে পাশ কাটিয়ে। হোক তা আকিদা-বিশ্বাসের ক্ষেত্রেই কিংবা আচার-আচরণের ক্ষেত্রে।

তিনি যখন 'ইসলামী'

আমি নির্দ্বিধায় বলতে চাই— তিনি ছিলেন পরিপূর্ণ ইসলামী ব্যক্তিত্ব। ইসলাম মিশে ছিলো তাঁর রক্ত-কণিকায়, অস্থি-মজ্জায়। ইসলামই ছিলো তাঁর শুরু, ইসলামই ছিলো তাঁর শেষ। তিনি যখন যা কাছে পেতে চেয়েছেন

তা ইসলামের জন্যেই চেয়েছেন আবার দূরে চলে গেলে সেও ইসলামের জন্যেই গিয়েছেন। ইসলামই ছিলো তাঁর একমাত্র ছুটে যাওয়ার জায়গা। ইসলামকে কেন্দ্র করেই প্রবাহিত হয়েছে তাঁর জীবনের সকল ধারা। ইসলামই ছিলো তাঁর কর্মপ্রেরণা। ইসলামই ছিলো তাঁর শক্তি-সঞ্চয়-উৎস। ইসলামের সাথে তাঁর বন্ধন ছিলো অটুট-অবিচ্ছিন্ন— আমরণ-বহমান। তাঁর হৃদয়ে ভালোবাসা ছিলো, পাশাপাশি ঘৃণাও ছিলো, সে-ও শুধুই ইসলামের জন্যে। ইসলামের জন্যেই লিখেছেন তিনি হাজার হাজার পাতা, শত শত কিতাব, দিয়েছেন আবেগমথিত ভাষায় হৃদয় ছুঁয়ে-যাওয়া এবং জীবন বদলে-দেয়া অসংখ্য ভাষণ ও বক্তৃতা। ইসলামের জন্যেই গড়েছেন তিনি সম্পর্ক আবার ভেঙেছেনও। ইসলামই ছিলো তাঁর কর্ম-দিবসের ব্যস্ততা এবং ঘুম-রজনী'র স্বপ্ন। ইসলামই ছিলো তাঁর সফরের সম্বল এবং 'হৃদয়ের' (আবাসভূমির) বান্ধব। অর্থাৎ তিনি ছিলেন ইসলাম কর্তৃক পরিচালিত, ইসলামের জন্যে নিবেদিত, ইসলামের উৎস থেকে সাহায্যপ্রাপ্ত এবং ইসলামের কাছে দায়বদ্ধ।

তাঁর জ্ঞান-বুদ্ধি, তাঁর হৃদয়-মন, তাঁর সকাল-সন্ধ্যা, তাঁর দিবস-রজনীকে নিরন্তর ব্যস্ত রেখেছে কী? অন্যকিছু নয়— শুধুই ইসলাম, ইসলামের পয়গাম, ইসলামের উৎসারণ ও জাগরণ, মুসলিম উম্মাহর সঙ্কট ও সমস্যা এবং ইসলামের দুশমনদের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ হামলা। তাঁকে সবচে' বেশী উদ্বিগ্ন করতো দুশমনের যে কোনো বহিঃআগ্রাসন মুকাবিলায় অভ্যন্তরীণ প্রতিরোধ ক্ষমতাকে শাণিত ও শক্তিশালী করার বিষয়টি এবং আদর্শ সমাজ ও দল গড়ার পূর্ব শর্ত হিসাবে সর্বাগ্রে ব্যক্তিগঠনের বিষয়টি। তিনি বিশ্বাস করতেন— ব্যক্তির পরিবর্তন ছাড়া কখনোই সমাজ ও জাতির পরিবর্তন সম্ভব নয়।

إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ.

'আল্লাহ কোনো জাতির ভাগ্য পরিবর্তন করেন না তারা নিজেরাই নিজেদের ভাগ্য পরিবর্তন না করলে।'

–সূরা রা'দ ঃ ১১

তিনি যখন 'কুরআনী'

নিঃসন্দেহে তিনি ছিলেন কুরআনী অর্থাৎ কুরআনের মানুষ। কুরআনই ছিলো তাঁর প্রথম ও প্রধান উৎস। কুরআনই ছিলো তাঁর শক্তি সঞ্চয়ের কেন্দ্র। কুরআনের প্রতিই ছিলো তাঁর সকল আস্থা ও ভরসা। কুরআনই ছিলো তাঁর সকল অনুরাগের ঠিকানা। কুরআনই ছিলো তাঁর জীবন বিধান। কুরআন তিলাওয়াত ছিলো তাঁর কাছে এক মহিমান্বিত ইবাদত। এই ইবাদতে আন্দোলিত হতো তাঁর ঠোঁট। আলোড়িত হতো তাঁর মন। অশ্রু-বিগলিত হতো তাঁর চোখ। তখন ডুবে যেতেন তিনি এর মর্মে ও গভীরে। অনুভব করতেন এর মজা ও স্বাদ। তাঁর তিলাওয়াত চলতো আর চলতো আর তাঁর ঈমানও বাড়তো আর বাড়তো। আয়াতের অর্থ ও মর্মকে হৃদয়ঙ্গম করে-করে এবং গভীর উপলব্ধির বাগানে ফুল ফুটিয়ে-ফুটিয়ে তিনি বিচরণ করতেন কুরআনের বিস্তৃত আঙিনায়। তিনি যেনো কুরআন তিলাওয়াতের মহা সমুদ্রে ডুব দিতেন আর কুড়িয়ে-কুড়িয়ে আনতেন মণি-মুক্তা-জহরত। আর তা ছড়িয়ে দিতেন তাঁর লেখায়-বক্তৃতায়-আলোচনায়। বুদ্ধিদীপ্ত চিন্তা দিয়ে অনুরাগপূর্ণ হৃদয় দিয়ে যারা শুনতেন তাঁর এ-সব বক্তৃতা আর পড়তেন তাঁর গ্রন্থ, তারা সবাই এতোক্ষণ আমি যা বললাম তার পক্ষে সাক্ষী দেবেন অকপটে। সুতরাং সত্যিকার অর্থেই তিনি ছিলেন কুরআনের মানুষ। আর কুরআন যার ইমাম ও রাহবার তিনি কখনো পথ হারাতে পারেন না। গোমরাহ হতে পারেন না।

তিনি যখন 'মুহাম্মদী'

অবশ্যই তিনি ছিলেন মুহাম্মদী। তিনি রাসূলের খান্দানের লোক বলে বলছি না, তিনি তাঁর রক্তে হাশেমী ও হাসানী রক্তের সাথে তাঁর গভীর সংশ্লেষ রয়েছে— শুধু সে কারণেও বলছি না। এমন হাসানী-হোসাইনী তো কতোই দেখা যায়, কথায়-কাজে এবং আচার-আচরণে যারা বংশের সম্মান ও মর্যাদাকে প্রশ্নবিদ্ধ করেন।

مَنْ بَطَّأَ به عَمَلُه لَمْ يُسْرِعْ بِه نَسَبُه.

'যাকে গতিহীন—নিশ্চল করে দেয় তার কাজ তাকে গতিময় করে দেবে তার বংশ— এটা হয় না।'

বরং আমি বলতে চাই— তিনি মুহাম্মদী খান্দানের এমন সদস্য, রাসূলকে যিনি আদর্শ বানিয়েছেন জীবনের সর্বক্ষেত্রে। রাসূলে আরাবী'র সীরাত ও জীবন-দর্শনকে বানিয়েছেন যিনি আলোকবর্তিকা, ইবাদত ও যুহদের (দুনিয়াবিমুখতার) মানদণ্ড। ঐন্দ্রজালিক পৃথিবীর চাকচিক্য ও রূপ-রস-গন্ধ যিনি অবজ্ঞাভরে পাশ কাটিয়ে জীবন পথের পাথেয়ও সংগ্রহ করেছেন এই সীরাতুন্নবী থেকেই। যিনি 'খালাফ' (পরবর্তী উম্মত) এর মাঝে বসবাস করেও ছিলেন 'সালাফ' (পূর্ববর্তী শ্রেষ্ঠ উম্মত) এর নমুনা। আমাদের মতো তিনি ব্যস্ত হয়ে পড়তেন না দুনিয়ার লাভ-ক্ষতি ও পাওয়া-না পাওয়ার হিসাব নিয়ে। দুনিয়ার ভোগ-বিলাস ও শোভা-সৌন্দর্য তাঁর কাছে ছিলো মূল্যহীন। তাঁকে দেখলে মনে হতো— সেই সালমান ফারসী কিংবা আবু দারদা রা.!

প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নিয়ে তিনি অনেক বলেছেন : অনেক লিখেছেন। কিন্তু এ-বলা বা লেখা নিছক এক আলোচক বা গবেষকের ভাষায় নয় বরং তা উৎসারিত হয়েছে এক নবী-প্রেমিকের হৃদয় ও কলম থেকে। যা শুনলে বা পড়লে মনে হয় তিনি যেনো রাসূল-প্রেমের অতল-সাগরের এক দক্ষ ডুবুরী। কুড়িয়ে আনছেন সাগর-তলের অমূল্য রত্নরাজি। রাসূলে আরাবী'র বিরল ও মহান ব্যক্তিত্বে সীমাহীন মুগ্ধ ছিলেন তিনি। হ্যাঁ.. এ কথা শুধু তাঁর অমর সীরাত গ্রন্থ 'নবীয়ে রহমত' এর ব্যাপারেই প্রযোজ্য নয়; বরং তাঁর সমস্ত কিতাবে-বক্তৃতায়-আলোচনায় ছড়িয়ে আছে নবী-প্রেমের এ পুষ্প-পরাগ! এই যে নবী-প্রেম— যা লালন করেছেন তিনি বুকের মাঝে, এই যে নববী আদর্শ— যা তিনি বাস্তবায়িত করেছেন নিজের জীবনাচারে, এই যে নবী-উদ্যানের তাজা-তাজা ফুল— এ কিন্তু বড়ো সাধনার ধন! এ-ধন অর্জিত হয়েছে তাঁর নিরন্তর সীরাত সাধনার মধ্য দিয়ে। নবুয়ত উদ্যানের মৌমাছি হয়ে মধু আহরণের জন্যে সেখানে তিনি ছুটে বেড়িয়েছেন এক ফুল থেকে আরেক ফুলে! গভীর অনুরাগে অধ্যয়ন করেছেন তিনি নবী-জীবনের সকল পাঠ। জীবনের বাঁকে-বাঁকে করেছেন তার পূর্ণ বাস্তবায়ন। এখান থেকেই নিয়েছেন তিনি শিক্ষা ও দীক্ষা। এখান থেকেই আস্বাদন করেছেন তিনি পূর্ণতার স্বাদ, যে পূর্ণতা আল্লাহ ছড়িয়ে দিয়েছেন পৃথিবীর সমস্ত মানুষের ভিতরে একটু একটু করে আর তার সবটাই একত্রিত করেছেন শুধুমাত্র রাসূলে আরাবীর বিরল ব্যক্তিত্বে!

তিনি যখন আন্তর্জাতিক

হ্যাঁ .. তিনি আন্তর্জাতিক, ভারতে জন্মেও—ভারতের মাটি ও মানুষের সাথে গভীরভাবে বেড়ে উঠেও .. ভারতের শিক্ষাঙ্গনে পাঠ গ্রহণ করেও। কেননা, তাঁর লক্ষ্য ছিলো বিশ্বমুখী, তাঁর কর্মতৎপরতা ছিলো জগতব্যাপী। তাঁর কথা ও লেখাও ছিলো বিশ্বকেন্দ্রিক। যদিও হিন্দুস্তানের মুসলমানদের প্রতি ছিলো তাঁর বিশেষ দৃষ্টি। পাশে থাকতেন তিনি তাদের সুদিনে-দুর্দিনে। এবং এ-ক্ষেত্রে রেখেছেন তিনি শীর্ষ ভূমিকা। মুসলমানদের ধর্মীয় মূল্যবোধ, শরীয়া নীতিমালা ও সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য চির অক্ষুণ্ণ রাখার সার্থে প্রশাসনের চোখে চোখ রেখে করেছেন তিনি সংগ্রাম এবং প্রতিষ্ঠা করেছেন 'মুসলিম পার্সোনাল ল' বোর্ড'। কিন্তু তাই বলে তাঁর কর্মতৎপরতা ও মিশন শুধু ভারত উপমহাদেশেই সীমাবদ্ধ ছিলো না। বরং তা দেশের মানচিত্রের ক্ষুদ্র সীমানা পেরিয়ে বিস্তৃত হয়েছিলো তামাম বিশ্বময়। তাই সুদূর আরবে বসেও আমরা দেখতে পাই যে, ভারতের চাইতে এখানে তাঁর সুনাম-সুখ্যাতি মোটেই কম নয়। শুধু তাই নয়; আরব দুনিয়ার অনেক সংস্থা ও ফাউণ্ডেশনেরই তিনি ছিলেন সম্মানিত সদস্য। অতি সংক্ষেপে তার একটা তালিকা হলো এই ঃ

তিনি ছিলেন রাবেতায়ে আলমে ইসলামী'র প্রতিষ্ঠাতা সদস্য।

তিনি ছিলেন আন্তর্জাতিক মসজিদ মিশনের সদস্য।

তিনি ছিলেন রাবেতাভিত্তিক ফিক্‌হ একাডেমি'র সদস্য।

তিনি ছিলেন ইসলামী সভ্যতা নিয়ে গবেষণার জন্যে প্রতিষ্ঠিত জর্দানের রাজকীয় পরিষদের সদস্য।

তিনি ছিলেন দামেস্কভিত্তিক শিক্ষা পরিষদের সদস্য।

তিনিই পাশ্চাত্যের সুপ্রাচীন ও জগদ্বিখ্যাত 'অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি'তে উড়িয়েছেন ইসলামী চিন্তা-চেতনা ও সভ্যতা-সংস্কৃতির নিশান—প্রতিষ্ঠা করেছেন 'ইসলামিক স্টাডিজ সেন্টার'। প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে একেবারে ওফাত পর্যন্ত তিনিই ছিলেন এ-বিভাগের সর্ববরীত সভাপতি।

তিনিই বাতিল সাহিত্যের কালো আকাশে উড়িয়েছেন ইসলামী সাহিত্যের বিজয় কেতন। প্রতিষ্ঠা করেছেন 'রাবেতায়ে আদবে ইসলামী আল-আলামিয়্যাহ'—আন্তর্জাতিক ইসলামী সাহিত্য সংস্থা। এরও ছিলেন তিনি আমৃত্যু সভাপতি—দরদি অভিভাবক।

তাঁর অসংখ্য বক্তৃতা কাদেরকে লক্ষ্য করে এবং কোথায় উপস্থাপিত হয়েছে? তাঁর ছোট বড় অনেক বই কাদেরকে কেন্দ্র করে রচিত হয়েছে? তাঁর সুবিদিত আন্তর্জাতিকতা উপলব্ধি করার জন্যে লক্ষ্য করুন কয়েকটি শিরোনাম:

১. أحاديث إلي العرب (আরব বন্ধুদের বলতে চাই),

২. أحاديث صريحة في أمريكة (আমেরিকা'কে স্পষ্ট ভাষায় বলতে চাই),

৩. أسبوعان في المغرب (মরক্কো'তে দু' সপ্তাহ),

৪. من نهر كابول إلي نهر اليرموك (কাবুল নদীর তীর থেকে আম্মান নদীর তীরে)।

এ ছাড়া রয়েছে إسماعيات (শোনো হে!)-এর প্রাণস্পর্শী সিরিজ। তার শিরোনামগুলোর শিল্প-আবেদনও একটু লক্ষ্য করুন:

১. !إسمعي يا مصرُ (শোনো হে মিশর!),

২. !إسمعي يا سورية (শোনো হে সিরিয়া!),

৩. !إسمعي يا زهرة الصحراء (শোনো হে মরুফুল!),

৪. !إسمعي يا إيران (শোনো তুমি ইরান!)।

শায়খ নদভী ঃ আমার ভাই! আমার শায়খ! আমার প্রিয় মানুষ!!

হ্যাঁ.. আমি গর্ব করে বলতে চাই— তিনি আমার ভাই। ভ্রাতৃত্বের এ বন্ধন স্থাপন করেছে ইসলাম:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُون إِخْوَةٌ.

'মু'মিনরা পরস্পরে ভাই ভাই।' -হুজুরাত ঃ ১০

المسلم أخو المسلم.

'মুসলমান মুসলমানের ভাই।'

ভ্রাতৃত্বের এ-বন্ধন স্থাপন করেছে—ইলমে ওহী। আল্লাহ প্রদত্ত এ-ইলম সম্পর্ক স্থাপন করে তার বাহকদের মাঝে। ভ্রাতৃত্বের এ-বন্ধন স্থাপন করেছে— ইসলামী দাওয়াত। স্থান-কাল-পাত্র-এর সীমানা পেরিয়ে এ-সম্পর্ক স্থাপিত হয় আল্লাহ্‌র পথের দাঈ ও আহবানকারীদের ভিতরে— সব যুগে, সব কালে। ভ্রাতৃত্বের এ-বন্ধন দৃঢ়তা লাভ করেছে আরো বিভিন্ন কারণে। যেমন:

সঙ্কটঘেরা মুসলিম উম্মাহর মুক্তি-চিন্তা। তাদেরকে গাফলতের 'নিঁদ' (ঘুম) থেকে জাগিয়ে তোলার চিন্তা। এ ছাড়া উলামায়ে কেরামের হতাশাজনক বিভেদ ও অনৈক্য এবং দুশমনের একতা ও ঐক্য। দুশমনের ক্রমবর্ধমান হামলা এবং উম্মাহর প্রতিরোধ-উদাসিনতার নিরন্তরতা। শাসক ও নীতি নির্ধারকদের নষ্টামি এবং জনগণের বে-খবরি ও উদাসিনতা। ধনী ও বিত্তবানদের বিলাসিতা এবং আল্লাহ্‌র পথের যাঁরা দাঈ, মৌলিক ও গুরুত্বপূর্ণ সমস্যাবলীকে বাদ দিয়ে গুরুত্বহীন ও অমৌলিক বিষয়াদি নিয়ে, সামগ্রিকতাকে বাদ দিয়ে প্রান্তিকতাকে নিয়ে, মূলকে বাদ দিয়ে শাখাকে নিয়ে এবং আত্মাকে বাদ দিয়ে দেহকে নিয়ে তাঁদের ব্যস্ত হয়ে পড়া।

তিনি আমার শায়খ ও মুরুব্বী। আমি তাঁর কিতাবের ছাত্র। আমি কতোবার কতোভাবে উপকৃত হয়েছি তাঁর কিতাব থেকে। তাঁর কিতাব থেকে অনেক উদ্ধৃতি দিয়েছি আমি আমার বিভিন্ন লেখায়। তাঁর কিতাবের স্বাদই ভিন্ন। তাঁর লেখার মজাই আলাদা। একেক কিতাবের একেক স্বাদ। একেক লেখার একেক মজা। তাঁর প্রতিটি কিতাব ও লেখা দায়িত্বপূর্ণ ও দরদভরা চিন্তা ও পাথেয়-এর ঊর্মিমালায় উত্তাল কিন্তু বে-সামাল নয়। সমকালীন সকল দাঈ, ইসলামী লেখক-সাহিত্যিক ও চিন্তাবিদ তাঁর গ্রন্থসম্ভার থেকে বিভিন্নভাবে উপকৃত হয়েছেন এবং উদ্ধৃতি পেশ করেছেন। যাঁদের শীর্ষে রয়েছেন বীর শহীদ সায়্যিদ কুতব, মহান দাঈ মুহাম্মদ আল-গাযালী এবং বিজ্ঞ আলেম ও আরব বিশ্বের নন্দিত কথা-সাহিত্যিক শায়খ আলী তানতাভীসহ আরো অনেকেই।

আর আমি কেবল তাঁর কিতাবের ছাত্র হতে যাবো কেনো? আমি তো সরাসরিও তাঁর ছাত্র! কতোবার আমি ধন্য হয়েছি তাঁর সান্নিধ্য-পরশে! শুনেছি তখন তাঁর পাক যবানের কতো কথা, কতো বাণী! যার সূচনা হয়েছিলো ১৯৫১ সালে মিশরে। এরপর যখন যেখানেই তাঁকে কাছে পেয়েছি, দেখেছি তাঁর সেই চিরচেনা ছবি। সব ক্ষেত্রেই তাঁকে আমার কাছে মনে হয় আদর্শ। চলনে-বলনে-নীরবতায়!!

আমার স্মৃতির আয়নায় তিরিশ বছর আগের একটি স্মৃতি ঝলমল করে ভাসছে। শায়খ নদভী কাতার সফরে এসেছেন। কথায়-কথায় তাঁর কাছ থেকে নদওয়াতুল উলামা'র কিছু অর্থ-সঙ্কট ও প্রয়োজনের কথা আমরা জেনে ফেললাম। তখন আমাদের ভিতরে কেউ কেউ তাঁকে প্রস্তাব দিয়ে বললো:

-আমরা কি আপনাকে নিয়ে কাতারের কোনো বিশিষ্ট শায়খ ও বড় ব্যবসায়ী'র সাথে দেখা করে নদওয়ার প্রয়োজনের কথা তুলে ধরতে পারি?

জবাবে তিনি মৃদু হেসে বললেন:

-এ আমার পক্ষে সম্ভব নয়!

জানতে চাইলাম:

-কেনো?

তিনি তখন জানালেন:

-যাদের কাছে যেতে বলছেন তারা তো রুগী। তাদের রোগের নাম حب الدنيا (দুনিয়া প্রীতি)। আর এ ক্ষেত্রে আমরা হলাম ডাক্তার। ডাক্তার হয়ে কীভাবে আমরা রুগীর কাছে চিকিৎসা চাইতে পারি? সাহায্য চাইতে পারি?

আমরা তখন বিনয়ের সাথে আরজ করলাম:

-আপনি তো নিজের জন্যে চাইছেন না, চাইছেন প্রতিষ্ঠান এবং ছাত্র-শিক্ষকদের জন্যে।

-কিন্তু কার জন্যে চাওয়া হলো এরা যে তা বুঝতেই সক্ষম না! এরা শুধু বুঝে কে চাইলো এবং কে নিয়ে গেলো!

তখন রমজান চলছিলো। আমরা বললাম:

-আপনি ঈদ পর্যন্ত আমাদের এখানে অবস্থান করুন! যেখানে যাওয়ার আমরাই যাবো এবং যা চাওয়ার আমরাই চাইবো।

তিনি তখন অপারগতা প্রকাশ করে বললেন:

-কিন্তু রমজানের শেষ দশকে যে আমার গুরুত্বপূর্ণ আমল আছে! আমি কোনোভাবেই তা থেকে বঞ্চিত হতে চাই না! আল্লাহ্‌র সাথে ঘনিষ্ঠ সময় কাটানোর ওটাই তো শ্রেষ্ঠ সময়!'

ততোক্ষণে আমরা বুঝে ফেললাম কার সাথে কথা বলছি! তিনি যে আল্লাহ্‌র এক বিশিষ্ট ওলী! আল্লাহ্‌র সান্নিধ্যধন্য এক মহান পুরুষ! কী করে আমরা তাঁকে আটকে রাখি— দিরহাম-দিনারের জাল ফেলে! তাঁর ইচ্ছে মতোই আমরা সাথে সাথে তাঁর ফিরতি সফরের যাবতীয় আয়োজন সম্পন্ন করলাম। আশ্চর্য! আমরা তাঁকে কিছুই দিতে পারলাম না। দিয়ে গেলেন শুধু তিনিই একা!!

কেনো আমি ভালোবাসি তাঁকে?

হ্যাঁ.. তিনি আমার কাছের মানুষ, প্রিয় মানুষ, ভালোবাসি আমি তাঁকে। এ ভালোবাসা—আল্লাহ্‌র জন্যে নিবেদিত ভালোবাসা।

আমি তাঁকে ভালোবেসেছি—
তাঁর দুনিয়া বিরাগের জন্যে,
তাঁর ইখলাস ও একনিষ্ঠার জন্যে,
তাঁর রাব্বানিয়াত ও আল্লাহমুখী জীবনাচারের জন্যে,
তাঁর ইয়াকিন ও দৃঢ় বিশ্বাসের জন্যে,
তাঁর তাওয়াক্কুল ও অবিচল আস্থা ও বিশ্বাসের জন্যে।

তাঁকে আমি ভালোবেসেছি—
উম্মাহর জন্যে তাঁর জ্বলন ও দরদের জন্যে,
তাঁর আত্মসম্মানবোধের জন্যে,
তাঁর মধ্যপন্থা ও সত্যিকারের উদারতার জন্যে।

তাঁকে আমি ভালোবেসেছি—
কেননা তাঁর চিন্তাধারা ঝরনা-স্বচ্ছ, নির্মেঘ আকাশের মতো পরিচ্ছন্ন।

তাঁকে আমি ভালোবেসেছি—
কেননা তাঁর হৃদয় হিংসামুক্ত।

কেননা তাঁর আকিদা-বিশ্বাসে নেই শিরকের কোনো কায়া ও ছায়া,

তাঁর লেখায়-কথায় নেই অন্যের প্রতি আক্রমণ ও বিষোদগার কিংবা শর বর্ষণ, না স্পষ্ট, না ইশারা!

যা কিছু মৌলিক ও গুরুত্বপূর্ণ, ভাবতেন তিনি শুধু তা-ই নিয়ে।

বাহ্যিকতার ঝলমলে আভরণ নয়— দেখতেন তিনি অন্তর্নিহিত তাৎপর্য ও গূঢ় রহস্য।

কথা নয়— দেখতেন তিনি কাজ।
বাহির নয়— দেখতেন তিনি ভিতর।

তাঁকে আমি ভালোবেসেছি—
তাঁর সুকুমারবৃত্তি ও আদর্শ উন্নত চরিত্র সুষমায় অভিভূত হয়ে।
এবং তাঁর উপর নববী উদ্যানের ফুলেল ছাউনি দেখে।

আমি তাঁকে ভালোবেসেছি—
তাঁর সহজ সরল স্বভাবে মুগ্ধ হয়ে।

ঈমানের অন্যতম অঙ্গ— লজ্জার পোষাকে তাঁকে ভূষিত দেখে।
মুসলিম উম্মাহর কঠিন দুর্দিনে তাঁর হৃদয়ের রক্তক্ষরণ দেখে।
এবং তাদের সুদিনে শিশুর মতো আনন্দোদ্বেল হতে দেখে।
তাঁর প্রতি এই যে আমার ভালোবাসা ও শ্রদ্ধাঞ্জলি—
আল্লাহ্‌র নৈকট্য লাভের জন্যে এ-ই আমার শ্রেষ্ঠ পূঁজি!!

এই ভালোবাসার পবিত্র উদ্যানে হাঁটতে হাঁটতে আমি বারবার এই আশায় বুক বাঁধি— নিশ্চয়ই আমার হাশর হবে সেই পুণ্যাত্মাগণের সঙ্গে–

مَعَ الَّذِيۡن أَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ مِنْ النَّبِيِّن وَالصِّدِّيقِين وَالشُّهَدَاء وَالصَّالِحِينَ وحَسُنَ أُولٰئِكَ رَفِيقاً.

'তাদের সাথে যারা অনুগৃহীত ও পুরস্কৃত হয়েছেন আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে। এরা হলেন: নবী, সিদ্দীক, শহীদ এবং পুণ্যবানগণ। সঙ্গী হিসাবে কতো উত্তম তারা। -নিসা ঃ ৬৯

আর এই পুণ্যবান কবি যেনো আমারই মনের ভাবকে তুলে ধরেছেন এভাবে—

أحب الصالحين ولستُ منهم + عساني أن أنال بهم شفاعة
وأكره من بضاعته المعاصي + وإن كنا سواء في البضاعة

'ভালোবাসি আমি পুণ্যবানদের, নাইবা হলাম তাঁদের কেউ!
আশা তো পুষেছি এ-বুকে— নিশ্চয়ই তাঁদের সুপারিশ পাবো!
অপরাধ যার পণ্য, তাকে আমি ঘৃণা করি। যদিও পণ্যের ক্ষেত্রে উভয়েই আমরা বরাবর!'

আমি একাই শুধু এভাবে ভালোবেসেছি শায়খ নদভীকে? না! আমার মতো আরো কতোজন যে তাঁকে ভালোবেসেছেন, তার কোনো হিসাবই নেই। যে তাঁকে যতো কাছ-থেকে দেখেছেন ততো গভীর করে তাঁকে ভালোবেসেছেন। অর্থাৎ যার নৈকট্য যতো বেশী তার ভালোবাসাও ততো গভীর! এই গভীরতাই তো জন্ম দেয় সেই গভীরতা! নৈকট্যের গভীরতাই টেনে আনে ভালোবাসার গভীরতা!! যেমন রাত টেনে আনে আঁধার-ছায়া আর দিন টেনে আনে আলোর মায়া।

উলামায়ে কেরামের ব্যাপারে একেকজনের একেক মত থাকতেই পারে। এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু আমার মনে হয়, আবুল হাসান আলী নদভী

রহ. এর ব্যাপারে সবার মত— এক ও অভিন্ন। এমনকি তাঁর চিন্তা-দর্শন-পুষ্ট নয় যারা, তারাও এর বাইরে নন। সবাই তাঁর কাছে ছুটে এসেছেন। তাঁকে কাছে পেতে চেয়েছেন। আল্লাহ্-ই তাঁকে দান করেছেন এ-বৈশিষ্ট্য ও মর্যাদা, অন্যদের ভিতরে যা সচরাচর দেখাই যায় না।

وَاللّٰهُ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللّٰهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ.

'আল্লাহ্ স্বীয় রহমত ও করুণায় সিক্ত করেন যাকে ইচ্ছে তাকেই। আল্লাহ্ মহা অনুগ্রহশীল।' -বাকারা ঃ ১০৫

শায়খ নদভী রহ. এর সাথে আমার পরিচয়ের ইতিকথা

শায়খ নদভীকে আমি সুদীর্ঘ ৪৭ বছর যাবত জানি। এ-পরিচয়ের সূচনা-ইতিহাসটাই এখন বলি।

শায়খ নদভী এই প্রথম বাইরের দুনিয়া সফর করছেন। এ-সফরে মিসরের মাটিতে যখন পা রাখেন তিনি তখন ১৯৫১ সাল। আমি আল-আযহার বিশ্ববিদ্যালয়ের শরীয়া অনুষদের ছাত্র। পাশাপাশি সেখানে ইখওয়ানুল মুসলিমীন ছাত্র সংগঠনের দায়িত্বশীল। আমার সাথে ছিলেন আহমদ আস্‌সালসহ আরো কয়েক বন্ধু। আমাদের গ্রামের পাশেই 'আল-মাহাল্লা আল-কুবরা' শহরে একটি মসজিদে আমি জু'মা পড়াতাম। শায়খ নদভী'র সাড়া জাগানো কিতাব ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين (মুসলমানদের অধঃপতনে বিশ্ব কী হারালো) ততেদিনে আমার পড়া হয়ে গেছে। যা কিছুদিন আগে মিসরের প্রসিদ্ধ প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান— 'অনুবাদ, সংকলন ও প্রকাশনা পরিষদ' থেকে প্রকাশিত হয়েছিলো। এই প্রতিষ্ঠানটির সভাপতি ছিলেন তখন ড. আহমদ আমিন রহ.।

সত্যি কথা বলতে কি, বইটি পড়ে আমি সীমাহীন মুগ্ধ হয়েছিলাম। অথচ আমি জানতাম না কে এর লেখক? শুধু এতোটুকু জানতাম যে, তাঁর দেশ সুদূর হিন্দুস্তানে। অবশ্য ড. আহমদ আমিন একটি ভূমিকা লিখেছেন। কিন্তু সে ভূমিকা পড়ে লেখক ও বই সম্পর্কে আমি কিছুই বুঝতে পারি নি। বলতেই হয়; তিনি এই ভূমিকায় লেখকের প্রতি সুবিচার করতে পারেন নি। প্রকৃতপক্ষে বইটিতে প্রতিফলিত হয়েছিলো ইসলামী ইতিহাসের একটি নতুন দৃষ্টিভঙ্গি। পাশাপাশি বিশ্ব-ইতিহাসের প্রতিও এ-গ্রন্থে দৃষ্টিপাত করা হয়েছে ইসলামী ইতিহাসের দৃষ্টিকোণ থেকে। যে দৃষ্টিকোণ

ইতিহাস-সচেতন একজন আলেমের, যে দৃষ্টিকোণ সংস্কারপন্থী একজন দাঈ'র, ইতিহাসের বাঁকে-বাঁকে যাঁর সাবলীল পদচারণা এবং প্রচুর জানাশোনা। যিনি ভালো করেই জানেন কীভাবে লক্ষ্য-উদ্দেশ্যের কাঙ্ক্ষিত পরিণতিতে উপনীত হতে হয়।

এ-গ্রন্থ প্রণয়নে তাঁকে বিশেষভাবে খোরাক যুগিয়েছে ইংরেজি ভাষায় তাঁর সাবলীল পদচারণা। আরো সহযোগিতা করেছে তাঁর গঠনমূলক সমালোচনা-ক্ষমতা ও সুক্ষ্ম অনুভূতি, বিশ্বসভ্যতা সম্পর্কে তাঁর সচেতনতা, দাওয়াত ও তারবিয়াত সম্পর্কে তাঁর সজাগ দৃষ্টি, সংস্কার সম্পর্কে তাঁর আলোকিত চিন্তা-দর্শন। এ সব বহুমুখী প্রতিভার সম্মিলনেই তিনি রচনা করতে সক্ষম হয়েছিলেন এ নতুন ধারার কালজয়ী গ্রন্থটি—

ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين —মুসলমানদের অধঃপতনে বিশ্ব কী হারালো।

শায়খ নদভী'র মিসর আগমন

আযহারে অধ্যয়নরত কয়েকজন হিন্দুস্তানি বন্ধু একদিন আমাকে জিজ্ঞাসা করলোঃ

-আবুল হাসান আলী নদভীকে চেনেন?

-হ্যাঁ, ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين -এর লেখক!

-ঠিক বলেছেন!

-কিন্তু এ-মুহূর্তে তাঁর কথা জানতে চাওয়ার কারণ?

-জানেন না বুঝি! তিনি সহসাই মিসরে আসছেন!

-তাই! আসার সাথে সাথে আমাকে জানাবে তো। আমি তাঁর সাথে সাক্ষাত করার জন্যে উদগ্রীব হয়ে আছি।

কিছুদিন পরই শায়খ নদভী'র আগমনবার্তা জেনে গেলাম। তাঁর সাথে এসেছেন আরো দু'জন। একজন শায়খ মুঈনুদ্দীন নদভী আর অপরজনের নাম এ-মুহূর্তে মনে করতে পারছি না। বিলাসবহুল হোটেল এড়িয়ে আযহারের গলিপথে অবস্থিত অতি সাধারণ একটি বাড়িতে সঙ্গীদ্বয়সহ শায়খ উঠলেন। হোটেল এবং হোটেলের পারিপার্শ্বিকতা ছিলো তাঁর স্বভাব ও প্রকৃতি বিরুদ্ধ। ভীষণ অপছন্দ।

আমার মনে পড়ে; রাবেতায়ে আলমে ইসলামী'র একটি সেমিনারে অংশগ্রহণের জন্যে শায়খ একবার সৌদি আরব এলেন। আমন্ত্রিত অতিথিদের সবাই হোটেলে উঠলেও শায়খ গিয়ে উঠলেন তাঁর এক ভক্তের বাসায়। অথচ হোটেল ছিলো প্রথম শ্রেণীর।

আমির-উমারা ও বিত্তবানদের সুরম্য বাসভবনে থাকতেও তিনি একদম স্বাচ্ছন্দবোধ করতেন না। এর কারণ কী? সম্ভবত এর প্রথম কারণ হবে— এ সব প্রাসাদ ও বিলাসবহুল বাসভবনে অবস্থান করাটা তাঁর স্বভাব-প্রকৃতি ও রুচির সাথে একদমই খাপ খেতো না। দ্বিতীয়ত তাদের সঞ্চিত অর্থবিত্ত সংশয়মুক্ত ও পরিচ্ছন্ন কি না, এ নিয়েও হয়তো তিনি দ্বিধায় ভুগতেন।

শায়খ প্রথম যখন মিসরে এসেছিলেন তখন ছিলেন পূর্ণ যৌবনে। দাড়ি ছিলো ঘন কালো। চেহারায় ছিলো যৌবন-সজিবতার প্রোজ্জ্বল আভা। মনে ছিলো তারুণ্যদীপ্ত সংকল্পের ঝাঁঝ, লক্ষ্যভেদী প্রাণময়তা। দৃষ্টি ছিলো আত্মসম্ভ্রমবোধে জ্বলে-জ্বলে ওঠা। একদিকে যেমন ছিলেন তিনি এই যৌবনের প্রাণময় বাঙ্ময় দীপ্তিতে দেদীপ্যমান ঠিক অপরদিকে ছিলেন প্রবীন প্রাজ্ঞজনের প্রজ্ঞালোকে ধ্রুব তারার মতো জ্বলজ্বলে।

আমি আমার বন্ধু মুহাম্মদ আদ্‌দামিরদাশ মুরাদ (الدمرداش مـــراد)-কে নিয়ে তাঁর সাক্ষাতে হাজির হলাম তাঁর অবস্থান স্থলে। বন্ধুবর মুরাদের কথা এখানে একটু বলে রাখি। তিনি আজ পৃথিবীতে নেই। তিনি ছিলেন আমার ঘনিষ্ঠ সহপাঠি। আমরা একসঙ্গে পড়েছি, একসঙ্গে দাওয়াতের কাজ করেছি, একসঙ্গে এক ছাদের নীচে থেকেছি, একসঙ্গে কষ্টভোগও করেছি। আমরা তাঁর সাথে দেখা করে বিনয়ের সাথে তাঁকে 'শিবরা'য় অবস্থিত আমাদের বাসায় পদার্পণের দাওয়াত দিলাম। এ-ও জানালাম— সেখানে আযহারের একঝাঁক তরুণ তাঁর জন্যে অধীর প্রতিক্ষায় সময় পার করছে। এরা সবাই 'ইখওয়ানুল মুসলিমীন'-এর দাওয়াতি হালকা—'কোতাইবা'র সদস্য। কোতাইবা হলো শবগুযারী। ইলম, ইবাদত ও আধ্যাত্মিক সাধনার রাতব্যাপী বিশেষ আমল। অবশ্য কিছুটা ঘুমেরও ব্যবস্থা থাকতো। শায়খ আমাদের কথা বিস্তারিত জানতে ও শুনতে বেশ আগ্রহ প্রকাশ করলেন। তখন শায়খকে একান্ত কাছে পেতে এবং তাঁর কথা শুনতে আমাদের আগ্রহের কোনো সীমাই রইলো না। কথার ফাঁকে-ফাঁকে শায়খ আমাদেরকে

জিজ্ঞাসা করছিলেন শায়খ হাসানুল বান্না'র কথা, তাঁর চিন্তা ধারা ও কর্ম পদ্ধতির কথা। মতবিরোধপূর্ণ বিষয়ে তাঁর অবস্থানের কথা, তা সে ছোটই হোক আর বড়ই হোক। এভাবেই শায়খ নদভী আমাদের কাছ থেকে হাসানুল বান্না সম্পর্কে একটা মোটামুটি ধারণা নিয়ে নিলেন। হাসানুল বান্না রহ. ছিলেন সত্যিকার অর্থেই ইমামে রাব্বানী। ইসলামী শাসন প্রতিষ্ঠায় সংগ্রামরত নিছক এক নেতাই ছিলেন না তিনি বরং তাঁর সবচে' বড় পরিচয় হলো, তিনি ছিলেন এমন এক আদর্শ রাহনুমা ও মুরুব্বী, যাঁর আজীবন স্বপ্ন ছিলো— ইসলামকে সঠিকভাবে অনুভব ও অনুসরণকারী এমন এক আদর্শ প্রজন্ম গড়ে তোলা, ঈমান হবে যাদের দৃঢ় ও মজবুত, শিক্ষা হবে যাদের কুরআন-সুন্নাহর চেতনা ও আলোকে স্নাত ও প্লাবিত, মিশন হবে যাদের মানুষকে ইসলামের দিকে, ইসলামের সার্বজনীন ও চিরন্তন আদর্শের দিকে আহ্বান ও আকর্ষণ করা এবং আল্লাহ্র জমিনে আল্লাহ্র শাসন কায়েমের দৃঢ় প্রত্যয়ে বলীয়ান হয়ে নিরন্তর সাধনা ও সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়া।

এরপর শায়খ যতোদিন মিসরে ছিলেন বারবার তাঁর সান্নিধ্য পরশে আমরা ধন্য হয়েছি, বিশেষ করে যাদের মিশন ছিলো ইসলামের দাওয়াত—আমি, আহমদ উসসাল, দামিরদাশ মুরাদ, আবদুল্লাহ আকিলসহ আরো অনেকেই।

মিসরে শায়খ নদভীর দিনগুলো ছিলো বড়োই চমৎকার ও বরকতময়—ক্রমবর্ধমান প্রোগ্রামের ব্যস্ততায় ঠাসা। প্রায় প্রতিদিনই তাঁকে ছুটে যেতে হচ্ছিলো এখানে থেকে সেখানে। কখনো বক্তৃতার মাহফিলে, কখনো ইলমী হালকায়, কখনো উলামা-মাশায়েখের মজলিসে।

একদিন তিনি 'দারুশ শুব্বান আল-মুসলিমীন' মিলনায়তনে এক হৃদয়স্পর্শী ভাষণ দিলেন। বিষয় ছিলো— المسلمون على مفترق الطرق—সঙ্কটের ঘূর্ণাবর্তে মুসলামানরা। পাশাপাশি আরেকটি বিখ্যাত ভাষণের কথাও এ মুহূর্তে আমার মনে পড়ছে। সেটি ছিলো ইসলামের মহাকবি ও দার্শনিক মুহাম্মদ ইকবাল রহ. কে নিয়ে। এই বক্তৃতায় শ্রোতাদের ভিতরে প্রবল আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছিলো। শায়খ নদভী ইকবালের কবিতার বড়ো ভক্ত ছিলেন। মুগ্ধ বিস্ময়ে তিনি তাঁর কবিতা পড়তেন। তার মাঝে ডুবে যেতেন। ইকবালের কবিতার অসংখ্য শ্লোকও

তাঁর মুখস্থ ছিলো। এই মহান কবি ও দার্শনিককে নিয়ে শায়খ নদভী روائع إقبال (Glory of Iqbal—ইকবাল সাহিত্যের নন্দনধারা) নামে একটি অনবদ্য গ্রন্থও লিখেছেন।

কায়রোতে অনেক ওলামা-মাশায়েখ, দাঈ, ইসলামী চিন্তানায়কদের সাথে শায়খ নদভী'র বৈঠক ও মতবিনিময় হয়েছে। তাদের সাথে এ-সব বৈঠকের বিস্তারিত বিবরণ এবং তাঁদের সম্পর্কে শায়খের সুক্ষ্ম মূল্যায়ন বিবৃত হয়েছে তাঁর সফরনামা مذكرات سائح في الشرق الأوسط (মধ্যপ্রাচ্য ঘুরে আসা এক পরিব্রাজকের ডায়রী) গ্রন্থে। সফর থেকে ফিরেই তিনি এ-গ্রন্থটি লিখেন।

খ্যাতিমান লেখক ও ইসলামী চিন্তাবিদ শহীদ সায়্যিদ কুতবের সাথে শায়খ নদভীর সাক্ষাত, পরিচয় ও ঘনিষ্ঠতা ছিলো– এই সফরের একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। শায়খের কথা ও ব্যক্তিত্বে শহীদ সায়্যিদ কুতব বড়ো মুগ্ধ হয়েছিলেন। তিনি শায়খের অনুরোধে ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين এর জন্যে একটি চমৎকার ভূমিকাও লিখে দেন, যাতে অকপটে শায়খের এবং তাঁর কিতাবের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছেন তিনি।

এই সফরে ইসলামের জান-কুরবান দাঈ মুহাম্মদ আল-গাযালী'র সাথেও শায়খ নদভী'র একাধিক বৈঠক হয়েছে। দু'জনই দু'জনের প্রতি মুগ্ধ, বিমোহিত। শায়খ নদভী মুহাম্মদ আল-গাযালীকে নিয়ে তাঁর মুগ্ধতার কথা চিত্রিত করেছেন উল্লেখিত সফরনামায়। আমার মনে পড়ে; সে সফরে শায়খ নদভী'র সাথে প্রথম দিকের লেখা কিছু দাওয়াতি রিসালাও (পুস্তিকা) ছিলো। যাতে ফুটে উঠেছিলো শায়খ নদভী'র সূক্ষ্ম অনুভূতি ও গভীর চিন্তা, সাবলীল ভঙ্গি ও প্রাণময় উপস্থাপনা, তাঁর সাহিত্য-চিন্তার বিত্ত-বৈভব এবং আধ্যাত্মিক অনুভূতির বিপুল ঐশ্বর্য। আমার আরো মনে পড়ে মুহাম্মদ আল-গাযালী তাঁর দু'টি পুস্তিকা পড়ে সীমাহীন অভিভূত হয়েছিলেন। একটির শিরোনাম ছিলো— من العالم إلى جزيرة العرب—বিশ্বের পক্ষ থেকে আরব-বদ্বীপের কাছে বার্তা। আর অপরটির শিরোনাম ছিলো— من جزيرة العرب إلى العالم—আরব-বদ্বীপের পক্ষ থেকে বিশ্বের কাছে বার্তা। শিরোনাম থেকেই বিষয়বস্তুর সারমর্ম উপলব্ধি করা যায়। প্রথমটিতে শায়খ নদভী একটু আগে বলে-আসা তাঁর নিজস্ব ধারায় তুলে ধরেছেন বিশ্ব কী চায় আরব জাহানের কাছে। আর অপরটিতে বলেছেন আরব জাহান কী দিতে

পারে বিশ্বকে। মুহাম্মদ আল-গাযালী পুস্তিকাদ্বয় পড়ে শুধু অভিভূতই হন নি, বরং বাধ্য হয়েছেন এই মন্তব্য করতে—

"هذا الإسلام لايخدمه إلا نفس شاعرة محلقة، أما النفوس البليدة المطموسة فلا حظ له فيها، ولا حظ لها فيه!"

'যার আছে আকাশের নীলিমায় ছুটে-চলা একটা কবি-মন, সে-ই পারে কেবল এই ইসলামের সেবা করতে! আর মনটা যার হাহাকার করছে বোকা-বোকা চিন্তার দৈন্যতায়, ইসলাম তাকে কী দেবে আর সে-ই বা ইসলামকে কী দেবে!'

হযরত মাওলানার লেখায় আমরা খুঁজে পাই এক নতুন ভাষা, নতুন প্রাণ, নতুন ব্যঞ্জনা ও নতুন দৃষ্টিকোণ, যা সচরাচর আমরা চিন্তাই করি না। তাঁর লেখা পড়েই সর্বপ্রথম আমাদের দৃষ্টি আকর্ষিত হয় পারস্য সেনাপতি রুস্তমের সামনে মহান বদরী সাহাবী হযরত রবইয়্যবনু আ'মের রা.-এর তেজোদ্দীপ্ত ভাষণের দিকে। সেদিন রুস্তমের চোখে চোখ রেখে তিনি যে শাণিত ও গর্জনময় শব্দমালা উচ্চারণ করেছিলেন তা হাতে-গোনা মাত্র কয়েকটি শব্দ হলেও ইসলামের তত্ত্ব-দর্শন ও দান-অবদানকে এবং লক্ষ্য-উদ্দেশ্যকে বড়ো সুন্দর করে.. বড়ো বীরত্ব-ব্যঞ্জনা-পুষ্ট করে উপস্থাপন করেছে। লক্ষ্য করুন—

"إن الله ابتعثنا لنخرجَ الناس من عِبادةِ العِباد إلي عِبادةِ الله وحْدَه، ومن ضيقِ الدنيا إلي سَعَتها، ومن جَورِ الأدْيانِ إلي عَدْلِ الإسْلامِ.

'আল্লাহ আমাদের পাঠিয়েছেন মানুষকে মানুষের 'ইবাদত' (সৃষ্টিপূজা) থেকে উদ্ধার করে এক আল্লাহ্‌র ইবাদতের দিকে নিয়ে যাওয়ার জন্যে, পৃথিবীর সংকীর্ণতা থেকে বের করে পৃথিবীর অবারিত আঙিনায় পৌঁছে দেওয়ার জন্যে এবং দুনিয়ামুখী ধর্মের নানামুখী নিপীড়নের কবল থেকে মুক্ত করে ইসলামের ইনসাফের ছায়ায় নিয়ে যাওয়ার জন্যে!'

আমার জানা মতে, হযরত রবইয়্যবনু আ'মের রা.-এর এ-অসাধারণ ভাষণের ঐতিহাসিক অবস্থান, মূল্য ও মাহাত্ম্যকে আমাদের সামনে প্রথম তুলে ধরেন শায়খ আবুল হাসান আলী নদভী রহ.। এরপর এর দিকে সবার দৃষ্টি আকর্ষিত হয়। এভাবেই হযরত রবইয়্যবনু আ'মের রা. এর এ-বক্তব্য শাণিত চেতনার ঝলক নিয়ে ছড়িয়ে পড়ে লেখকদের কলমে-কলমে, বক্তাদের মুখে-মুখে।

আমাদের বিশিষ্ট শিক্ষক শায়খ বাহী আল-খাওলী'র সাথেও শায়খ নদভী দেখা করে একান্তে বসে মতবিনিময় করেছেন। শায়খ বাহী আল-খাওলী বড়ো মুগ্ধ হয়েছেন শায়খ নদভী'র সাথে মত বিনিময় করে। পরবর্তীতে শায়খ নদভীকে লেখা এক পত্রে শায়খ বাহী তাঁর এই মুগ্ধতার কথা প্রকাশও করেছেন। শায়খের দেখা হয়েছে আরো অনেকের সাথেই। যেমন সালেহ ইশমাভীসহ 'ইখওয়ানুল মুসলিমীন'-এর শীর্ষ নেতৃবৃন্দ— যাঁদের কথা তিনি أريد أن أتحدث إلى الإخوان পুস্তিকায় উল্লেখ করেছেন।

আরো দেখা হয়েছে আমার শিক্ষক ডক্টর মুহাম্মদ ইউসুফ মূসা'র সঙ্গে। ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين এর জন্যে তিনি একটি চমৎকার ভূমিকাও লেখেন বইটির দ্বিতীয় সংস্করণ ছাপার সময়। আরো দেখা হয়েছে বিশিষ্ট সাহিত্যিক ও কথাশিল্পী ডক্টর আহমদ আশ শিরবাসী'র সাথে। ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين এর দ্বিতীয় সংস্করণে ডক্টর শিরবাসী'র লেখা শায়খ নদভী'র একটি সংক্ষিপ্ত জীবনালেখ্যও সংযোজিত হয়, যা তিনি তৈরী করেছিলেন শায়খ নদভী'র সাথে একটি প্রাণবন্ত সাক্ষাতকারের উপর ভিত্তি করে। সে সাক্ষাতকারের একটি জিজ্ঞাসা ছিলো

-মিসরে সবচে' অদ্ভুত জিনিস আপনার চোখে কী পড়েছে?

জবাবে শায়খ বললেন:

-দাড়িবিহীন উলামায়ে কেরাম!

সত্যিই এটি বড়ো বেদনাদায়ক এমন এক আলেমের জন্যে, যিনি স্বদেশে একজন আলেমকেও দাড়ি-ছাড়া দেখেন নি। সেখানে যারা ইংরেজি পড়ুয়া ও পাশ্চাত্যঘেঁষা কিংবা দীন-বিচ্যুত, তারাই কেবল দাড়ি রাখে না। ঠিক এ জিনিসটিই যদি অপর আরেকটি দেশের শীর্ষ উলামায়ে কেরামের মধ্যে পরিলক্ষিত হয় তাহলে তাকে সবচে' অদ্ভুত ও বিস্ময়কর না বলে উপায় কী? কিন্তু আরো অদ্ভুত ও বিস্ময়কর ব্যাপার হলো আযহারের কিছু সংখ্যক ঐতিহ্য-সচেতন আলেম আযহারকে তার প্রাচীন ঐতিহ্যের দিকে ফিরিয়ে নেয়ার জন্যে ছাত্রদের উপর 'আযহারের বিশেষ পাগড়ি' পরা বাধ্যতামূলক করলেও (যা নিছক একটি ঐতিহ্য বৈ আর কিছুই নয়) দাড়ি সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত একটি ইসলামী সুন্নত হওয়া সত্ত্বেও সে ব্যাপারে তাঁরা কোনো বাধ্যবাধকতা আরোপ করছেন না!

মিসরের গ্রামে গ্রামে শায়খ নদভী

শুধু কায়রোতেই সীমাবদ্ধ থাকলো না শায়খ নদভী'র প্রোগ্রাম ও দাওয়াতি-তৎপরতা, অন্যান্য শহর ও গ্রাম থেকেও একের পর এক আমন্ত্রণ আসতে লাগলো। যারাই শায়খের আগমনের কথা জানতে পেরেছেন তারাই হৃদয়ের উষ্ণতা দিয়ে তাঁকে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। শায়খও হৃদয়ের ডাকে হৃদয় দিয়েই সাড়া দিয়েছেন। প্রথমেই গেলেন তিনি ডাঃ মুহাম্মদ সাঈদের আমন্ত্রণে 'আল-মাহাল্লাতুল কুবরা' শহরে। এখানেই একটি মসজিদে আমি জু'মা পড়াতাম। ডাঃ সাঈদ ছিলেন الجمعية الشرعية (আল-জামইয়্যাহ আশ্ শারইয়্যাহ)-এর সভাপতি। তিনি ছিলেন সুন্নতে রাসূলের এক খাঁটি প্রেমিক। সুন্নতে রাসূলকে বাস্তবায়নের জন্যে বলা যায় তিনি নিজের জীবনকে উৎসর্গ করে দিয়েছিলেন। আল্লাহ্‌র পথের দাওয়াতকে ব্যাপকভাবে সবার মাঝে ছড়িয়ে দেয়ার লক্ষ্যে তিনি তাঁর সংস্থার পক্ষ থেকে ব্যাপক উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন। 'ইখওয়ানুল মুসলিমীন' এর সাথেও তাঁর গভীর সম্পর্ক ছিলো। কিন্তু পাশাপাশি মৌলিক আদর্শ-বিচ্যুতির কারণে ইখওয়ান কর্মীদের একজন কড়া সমালোচকও ছিলেন তিনি। শায়খ নদভী এ-সব জানার পর তাঁকে বললেন:

'ইখওয়ানুল মুসলিমীন' এর দাওয়াত একটি ব্যাপকভিত্তিক দাওয়াত। জনসাধারণ্যে ঐক্য ও একতার সুদৃঢ় বন্ধন স্থাপন করা এবং তাদেরকে ইসলামের সামগ্রিক অবকাঠামো ও মূলনীতির দিকে আহ্বান করাটাই এই সংগঠনের মূল কাজ। আর দ্বিতীয় পর্যায়ে যে কাজটি করতে হবে তা হলো তাদেরকে ইসলামের আদব-আখলাক ও উন্নত চরিত্র-মাধুরি এবং বিশেষ প্রশিক্ষণে প্রশিক্ষিত করে তোলা। উম্মতকে সঠিক পথের দিশা দেয়ার জন্যে সর্বাগ্রে দু'টি পন্থা অনুসরণ করা আবশ্যক। এক. ব্যাপকভিত্তিক পন্থা। যেমন 'ইখওয়ানুল মুসলিমীন'। দুই. বিশেষ পন্থা। যেমন ধর্মতত্ত্বভিত্তিক সংস্থা।'

ডাঃ সাঈদ তন্ময়চিত্তে শায়খ নদভী'র কথা শুনলেন এবং খুবই প্রীত ও চমৎকৃত হলেন। এরপর তাঁর সাথে দুপুরের খাবার গ্রহণের জন্যে আমাকেও আমন্ত্রণ জানালেন। কিন্তু অনাকাঙ্খিত বিপত্তি দেখা দিলো একটু পরই। ঘটনা হলো, এক সঙ্গে সফর করে আমরা 'নাবরূহ' শহরে পৌঁছলাম। তখন আমার কী কথায় যেনো ডাঃ সাঈদ ভীষণ ক্ষুব্ধ হয়ে গেলেন। প্রকৃত

কারণটা আজো আমি খুঁজে পাই নি। তবে শায়খ তাঁর ধীরস্থির মেযাজ ও প্রজ্ঞা দিয়ে উদ্ভূত পরিস্থিতি বেশ দ্রুতই সামাল দিলেন।

রাতে শায়খের আহ্বানে সেখানে এক মসজিদে শবগুযারি হয়েছিলো। অনেক মানুষ তাঁর এ-আমলে অংশ নিয়েছিলো এবং তিলাওয়াতে-ইবাদতে-যিকিরে-ফিকিরে স্বর্গীয়-আমেজে স্নাত একটি রাত কাটিয়েছিলাম আমরা।

এই সফরেই শায়খের সাথে আমার প্রথম পরিচয় হয়, ঘনিষ্ঠতা হয়। পরবর্তীতে তাঁর সাথে আমার অবিচ্ছিন্ন যোগাযোগের সুবাদে এ-সম্পর্ক আরো দৃঢ় হয়, প্রগাঢ় হয়, হৃদয়ের গভীরে গিয়ে প্রোথিত হয়। কিন্তু মিসরে আমাদের উপর যখন নেমে এলো 'জুলাই ঝড়' .. 'জুলাই তাণ্ডব', তখন কিছুদিনের জন্যে তাঁর সাথে আমার যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। তখন দানবীয় বর্বরতায় ইখওয়ানের উপর নাসের সরকার ঝাঁপিয়ে পড়ে। বর্বর নিষ্ঠুরতায় তারা ইখওয়ানকে দমন করতে লাগলো। হায়! সে নিষ্ঠুরতার কালো দিনগুলোতে কতো যে ইখওয়ানী'র রক্তে মিসরের মাটি লাল হলো আর কতো যে ইখওয়ানী কারাগারের অন্ধকার প্রকোষ্ঠে নির্মম অত্যাচারের শিকার হলো তার কোনো সীমা রইলো না। এই 'নাসেরী-তাণ্ডবে' বন্ধ হয়ে গেলো তাদের সকল দাওয়াতি তৎপরতা ও সাংগঠনিক কার্যক্রম। ভারত উপমহাদেশে বসে শায়খ নদভী তীব্র ভাষায় এর প্রতিবাদ জানালেন। তাঁর সাথে প্রতিবাদ জানালেন মাওলানা মওদূদী সাহেবও। এ প্রতিবাদের কারণেই আযহারভিত্তিক ইসলামী গবেষণা সংস্থা مجمع البحـــوث الإســـلامية (بـــالأزهر) প্রতিষ্ঠার সময় বিশ্ববরেণ্য উলামায়ে কেরামকে এর সদস্য করার কথা থাকলেও এ দু'জনের নাম বাদ দেয়া হয়েছিলো। অথচ ব্যক্তিত্বে-প্রতিষ্ঠায়-যোগ্যতায়-অভিজ্ঞতায়-আন্তর্জাতিক খ্যাতি-প্রসিদ্ধিতে এ দু'জন এ পদের সবচে' বেশি হকদার ছিলেন।

আর আমি? কুদরতের ইচ্ছায় মিসরকে বিদায় জানিয়ে আমাকে চলে আসতে হলো কাতারে। পেছনে পড়ে থাকলো কতো স্মৃতি— দুঃখভরা, বেদনাঘেরা, রক্তঝরা!!

এরই মধ্যে শায়খের সাথে মিসরে আমার প্রথম সাক্ষাতের পর কেটে গেলো দশটি বছর। (১৯৫১ ইংরেজি-১৯৬১ ইংরেজি) কিন্তু আমার সৌভাগ্যই বলতে হবে; কাতারে আসার পর শায়খ যখন কাতার সফরে এলেন, অনেকদিন পর আবার পেলাম তাঁকে। এ-সাক্ষাতপর্বে শায়খের সাথে আমার সেই সম্পর্ক নতুনরূপে প্রতিষ্ঠিত হলো। আরো দৃঢ় হলো।

আরো অনেক গভীর হলো। তারপর এই মহান সম্পর্কে আর কখনো কোনো ছেদ পড়তে দিই নি আমি। আমি তাঁর সাথে এক মহান অবিচ্ছিন্ন সম্পর্কের ডোরে বাঁধা পড়ে গেলাম। তিনি আমার কাছে হয়ে উঠলেন আপনের চেয়ে বড় আপন।[১] প্রকাশিত হওয়ার সাথে সাথেই তাঁর যে কোনো কিতাব ও পুস্তিকা কিংবা বক্তৃতা ও প্রবন্ধ-নিবন্ধ আমি সংগ্রহ করে নিতাম। হিন্দুস্তানে ইসলামী দাওয়াত ও গবেষণা'র আরবী মুখপত্র البعث الإسلامي আমার কাছে মাসে মাসে পৌঁছে যেতো। যার সম্পাদনার দায়িত্বে ছিলেন তাঁর দুই বিশিষ্ট শাগরেদ– মুহাম্মদ আল-হাসানী রহ. (তাঁর ভাইপো) ও সাঈদ আল-আ'জমী নদভী (বর্তমানে দারুল উলুম নদওয়াতুল উলামা'র মুহতামিম)। এই মাসিকটিতে শায়খের কোনো না কোনো গবেষণাধর্মী লেখা বা বক্তৃতা থাকতোই।

এ সময়ে শায়খের কিছু গুরুত্বপূর্ণ কিতাব প্রকাশিত হয়। যেমন ঃ

১. رجال الفكر والدعوة في الإسلام (ইসলামের চিন্তানায়ক ও দাঈগণ)-এর প্রথম খণ্ড। এটি একটি অনন্য কিতাব। বলা যায় এ-কিতাব তাঁর একক নির্মাণ। কিতাবটি মূলত: ইসলামের কিছু সুনির্বাচিত কীর্তিমান ব্যক্তিত্ব ও মুজাদ্দিদকে নিয়ে একটি অনবদ্য বক্তৃতা সংকলন, যা তিনি প্রখ্যাত ইসলামী চিন্তানায়ক ও ফিকাহতত্ত্ববিদ ডক্টর মোস্তফা আস-সিবাঈ রহ. এর আমন্ত্রণে দামেস্ক বিশ্ববিদ্যালয়ের ধর্মবিজ্ঞান অনুষদের ছাত্রদের উদ্দেশ্যে উপস্থাপন করেছিলেন।

তত্ত্ব ও তথ্যের বড়ো চমৎকার গাঁথুনিতে শায়খ এ-বক্তৃতামালা বিন্যস্ত করেছিলেন। যাতে ফুটে উঠেছে ইসলামের ইতিহাসে তাঁর পাণ্ডিত্য ও গভীরতা, ইসলামের ইতিহাসের বিভিন্ন পর্যায় ও ধাপ সম্পর্কে তাঁর সুক্ষ্ম মূল্যায়ন। দীনের মুজাদ্দিদ ও উম্মতের দিক-দিশারীদের সম্পর্কে তাঁর গভীর গবেষণালব্ধ ও প্রজ্ঞাপূর্ণ আলোকপাত। এতে আরো ফুটে উঠেছে যে, যাঁদের নিয়ে তিনি সাজিয়েছেন এই অনবদ্য বর্ণনাগাথা, তাঁদের সবাই

---

[১] হে মহান আকাবির কাফেলার গর্ব! হে আজম দেশের আরব দূত!! কোন্ সে 'যাদুবলে' আপনি আরবের শ্রেষ্ঠ সন্তানদেরকে অমন করে গভীর মায়া ও সম্পর্কের বাঁধনে জড়িয়ে ফেলেছিলেন?! কেমন করে বাধ্য হলো আরবজগত, আজমের গুণগানে এমন করে মুখর হতে? আপনার নেতৃত্বকে মেনে নেয়ার বরং লুফে নেয়ার প্রতিযোগিতায় কোন্ সে জিনিস উদ্বুদ্ধ করেছিলো তাঁদেরকে? আপনার মতো 'আজমী' কি আর আসবে না! (অনুবাদক)

ছিলেন স্বীয় যুগ ও শতাব্দীকালের মুজাদ্দিদ এবং মুসলিম উম্মাহর সকল চাহিদা ও শূন্যস্থান পূরণের জন্যে একমাত্র অপরিহার্য ইসলামী ব্যক্তিত্ব ও রাহনুমা।

প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হওয়ার পর পরবর্তীতে এর অন্য খণ্ডগুলিও একে একে প্রকাশিত হয়েছে। খণ্ডগুলোতে যথাক্রমে আলোচনা করা হয়েছে আল-হাফেজ ইমাম ইবনে তাইমিয়া রহ., ইমাম সারহান্দী (মুজাদ্দিদে আলফে সানী) রহ., শায়খুল ইসলাম শাহ ওয়ালিউল্লাহ দেহলভী রহ. এবং ইমাম আহমদ ইবনে ইরফান শহীদ (সায়্যিদ আহমদ শহীদ) রহ.কে নিয়ে।

২. الصراع بين الفكرة الإسلامية والفكرة الغربية في الأقطار الإسلامية

(মুসলিম বিশ্বে ইসলামী ও পাশ্চাত্য সভ্যতার দ্বন্দ্ব)। এই কিতাবে আলোচিত হয়েছে কীভাবে পাশ্চাত্য সভ্যতা মুসলিম ভূখণ্ডে অনুপ্রবেশ করে শিকড় গেড়ে বসেছিলো এবং পরিণতিতে কীভাবে ইসলামী সভ্যতার উপর নেমে এসেছিলো পাশ্চাত্য সভ্যতার সর্বনাশা ঝড়। তারপর এ-ঝড়বিধ্বস্ত ভূখণ্ডে আগমন হলো ইসলামী সভ্যতার পতাকাবাহী একদল মর্দে মু'মিনের। তারা এসে পাশ্চাত্য সভ্যতার বিরুদ্ধে শক্ত অবস্থান গ্রহণ করে ইসলামী সভ্যতার মহিমা প্রচার করলেন। এভাবে ইসলামী সভ্যতাকে সমহিমা ও সগৌরবে ফিরিয়ে আনার ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় ব্যয় করলেন হাজার হাজার সাধনাঘেরা দিবস-রজনী। দুর্যোগের ঘনঘটায় দেখা গেলো কিছুটা হলেও আশার আলো।

৩. الأركان الأربعة (ইসলামের চার স্তম্ভ) । এই কিতাবে আলোচিত হয়েছে ইসলামের চারটি রুকন বা স্তম্ভের তত্ত্বকথা। সালাত, যাকাত, সিয়াম ও হজ্ব। এক যুগ-সচেতন দাঈ'র চিত্তাকর্ষক ভাষায় এবং গাফলতের নিঁদ-ভাঙানো বর্ণিল উপস্থাপনায় প্রতিটি রুকনের নিগূঢ় রহস্য ও গভীর তাৎপর্যের ছবি আঁকা হয়েছে এ-কিতাবে। এ-কিতাব পড়লে দোল উঠে বিবেক ও বুদ্ধির জগতে এবং আলোড়ন সৃষ্টি হয় হৃদয় ও মনের ভুবনে। পাঠকের মন নিজের অজান্তেই বারবার বলে উঠে—ইসলাম এতো সুন্দর! ইসলাম এতো যৌক্তিক!!

৪. ربانية لا رهبانية (বৈরাগ্য নয়—চাই রাব্বানিয়াত)। এ-কিতাবে আলোকপাত করা হয়েছে ইসলামের দৃষ্টিতে রূহানিয়াত ও আধ্যাত্মিকতা কী— তা নিয়ে। সেই নষ্ট সুফিবাদের কথা এখানে আলোচিত হয় নি, যা কুরআন-হাদীসের গণ্ডি থেকে বেরিয়ে '(ভন্ড) পীর-মুরিদী' এর নামে

মানুষের মাঝে ঐক্য ও একতার বদলে বিভেদ ও বিভক্তি ছড়ায়। বরং এ-কিতাবে কুরআন-সুন্নাহর গভীর অনুরাগী এক আদর্শ আধ্যাত্মিক সাধকের চিত্র তুলে ধরা হয়েছে, যিনি আধ্যাত্মিকতার অথৈ সমুদ্রে নিত্য অবগাহন করে চলেন, সাঁতার কেটে চলেন অথচ তলিয়ে যান না—ডুবে যান না। বরং সমুদ্র-বক্ষ থেকে তুলে আনেন আধ্যাত্মিকতার মণি-মুক্তা-হিরা-জহরত। আধ্যাত্মিকতার প্রচলিত পরিভাষার নিগড়ে যিনি বন্দি না হয়ে খুঁজে ফিরেন সারাবেলা আধ্যাত্মিকতার অন্তর্নিহিত গভীর তাৎপর্য ও রহস্য। মাওলার নৈকট্য ও ভালোবাসা। পরিভাষার এই যে ঝলক, নাম-উপনামের এই যে বাহার, কী-ইবা তাতে আসে যায়? যদি না থাকে তাতে হৃদয়-জগত বদলে দেয়ার রূপালী দীপ্তি? অন্তর্জগত আলোকোদ্ভাসিত করার সোনালী আভা?

এরপর শায়খের একে একে আরো অনেক কিতাবই প্রকাশিত হয়েছে। প্রতিটি কিতাবই পাঠক মহলে বিপুলভাবে সাড়া জাগিয়েছে। পাঠকনন্দিত হওয়ার সব মঞ্জিলই পেরিয়েছে। শুধু এশিয়ায় নয়, সারা বিশ্বে। আরব জাহান তো বটেই।

শায়খের গভীর সান্নিধ্যে,
তাঁর স্বপ্নের ভুবনে,
তাঁর কর্মের কেন্দ্রভূমিতে!!

আমি জীবনে কোনোদিন ভুলতে পারবো না নদওয়াতুল উলামা'র শহর—লখনৌ সফরের স্মৃতি। নদওয়াতুল উলামা'র পঁচাশি বছর পূর্তি উপলক্ষে এক বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হলো। শায়খ নদভী আমন্ত্রণ জানালেন দেশ-বিদেশের শীর্ষস্থানীয় উলামায়ে কেরামকে। তাঁর আমন্ত্রণে সাড়া দিয়ে উপস্থিত হলেন শায়খুল আযহার আবদুল হালীম মাহমুদ রহ.। শায়খ নদভী এই মনীষীকে অনুষ্ঠানের সভাপতি হিসাবে ঘোষণা করে সেদিন তাঁকে উপযুক্ত সম্মানই দিয়েছিলেন। আরো উপস্থিত হয়েছিলেন মিসরের ধর্মমন্ত্রী হোসাইন আল-যাহাবী, আরব আমিরাতের প্রধান বিচারপতি আবদুল আযিয আল-মোবারক, কাতারের ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা আবদুল্লাহ আল-আনসারী, শায়খ আবদুল আযিয আবদুস সাত্তারসহ সউদি আরব ও উপসাগরীয় অঞ্চলের আরো অনেকেই। আমিও এই পুণ্য কাফেলায় শরীক ছিলাম।

সেই অনুষ্ঠানের মুহূর্তগুলো কেমন কেটেছিলো আমাদের? নদওয়াতুল উলামা'র সবুজ আঙিনায়—তার জান্নাতি পরিবেশে কেমন কেটেছিলো আমাদের দিন-রাত্রি? এক কথায়: অপূর্ব! সে ছিলো বড়ো হৃদয়কাড়া ও দৃষ্টিনন্দন এক অনুষ্ঠান। উপস্থিত হয়েছিলো হাজার হাজার স্থানীয় মুসলমান। এমন কি অনেক হিন্দুও। শায়খ নদভী'র মেহমানদারিতে আমরা শুধু মুগ্ধই হই নি, প্লাবিত হয়েছি। এই প্লাবনে ভাসতে ভাসতে এক পর্যায়ে শায়খ মুহাম্মদ আল-মাহদী তো মজা করে বলেই ফেললেন: 'শায়খ আমাদেরকে সবই দিয়েছেন। দিয়ে দিয়ে ভরিয়ে দিয়েছেন। এখন শুধু দেয়ার আছে একটি জিনিসই! আমাদের প্রত্যেককে হিন্দুস্তানি কোনো মুসলিম ললনা'র সাথে বিবাহ পড়িয়ে দেয়া!!'

ঐ অনুষ্ঠানে ফটো সাংবাদিকরা এলো ফটো তুলতে। শায়খ বললেন: 'আমাদের উপমহাদেশের উলামায়ে কেরামের অবস্থান— ছবি তোলার বিরুদ্ধে। কিন্তু আজ আমি আমার আরব বন্ধুদের সম্মানার্থে ছবি তোলার অনুমতি দিচ্ছি। যেহেতু তাঁরা ছবি তোলা জায়েয মনে করেন।'

বক্তব্যের পর বক্তব্যে প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছিলো সে অনুষ্ঠান। মধুময়-স্মৃতিময়-স্বপ্নময় অভিব্যক্তির কী দ্যুতিময় ছড়াছড়ি! অনেককে তো শায়খ নিজেই বক্তব্য প্রদানের জন্যে এগিয়ে দিচ্ছিলেন। যেমনটা ঘটেছে আমার বেলায় এবং শায়খ আবদুল ফাত্তাহ আবু গুদ্দা রহ. এর বেলায়। আমার বক্তব্যের পর তিনি আমাকে কানে কানে বললেন:

"إن الناس تأثروا بكلامك، وإن لم يفهموه، لأن للكلام روحا، قد يصل إلي المستمع مباشرة، وإن عجز المترجم عن توصيله.

'শ্রোতারা আপনার বক্তব্য না বুঝলেও প্রভাবিত হয়েছে। কোনো কোনো কথায় থাকে সঞ্জীবনী প্রবাহ, যা সরাসরি শ্রোতার মনে রেখাপাত করে। যদিও অনুবাদক তার যথার্থ অনুবাদ করতে হিমশিম খায়।'

আমার মনে পড়ে আমার বক্তব্যের ব্যাপারে আরেকবার তিনি আমাকে বলেছিলেন:

"إن في كلامك روحا وحرارة خاصة وهذه قلما تترجم، لأن المترجم يترجم المعاني والأفكار، ولا يترجم الحرارة والروح إلا مترجم يملك ما تملك.

'আপনার ভাষণে রয়েছে প্রাণময়তা ও উষ্ণতা। এ ধরনের ভাষণ অনুবাদ করা বড়ো কঠিন। কেননা অনুবাদক অনুবাদ করে কেবল অর্থ ও

মর্ম। প্রাণময়তা ও উষ্ণতা অনুবাদ করতে সক্ষম কেবল সে অনুবাদকই, যার নিজেরও রয়েছে আপনার মতো এই প্রাণময়তা ও উষ্ণতা!'

একদিন এমন অনুবাদকের সন্ধানও আমি পেয়ে গেলাম। সে অন্য কোথাও নয়— শায়খের খান্দানেই। তিনি সালমান হোসাইনী নদভী। প্রাচ্যতত্ত্ববাদ সংক্রান্ত অন্য এক সেমিনারে আমার বক্তব্যের অনুবাদ করেছিলেন তিনিই। বড়ো অভিভূত হয়েছিলাম আমি তাঁর নিখুঁত উপস্থাপনা ও নৈপুণ্যে! অনুবাদ শেষ হওয়ার পর শায়খ আমাকে বললেন:

'الحمد لله، لقد نقل سلمان المعني والروح معا'

'আল-হামদুলিল্লাহ! অর্থ ও মর্মের পাশাপাশি সালমান আপনার বক্তব্যের প্রাণ ও উষ্ণতাও অনুবাদ করতে সক্ষম হয়েছে!'

***

নদওয়াতুল উলামা দেখে-দেখে আমাদের চোখ জোড়ালো। তার শিক্ষাঙ্গনের ক্যাম্পাস ঘুরে-ঘুরে আমাদের হৃদয়-নদীতে তৃপ্তি ও খুশির ঢেউ খেলে গেলো। এই সেই নদওয়া, এতোদিন যা'র কথা দূরে বসে-বসে কেবল শুনেই এসেছি। আজ তার কোলে বসে-বসে.. তার আঙিনায় ঘুরে-ঘুরে চোখ ভরে দেখলাম। মন ভরে উপলব্ধি করলাম। চোখে দেখার আগেই মন যাকে ভালোবেসে ফেলেছিলো তাকে এখন চোখের সামনে পেয়ে কী অবস্থা হতে পারে— এই মনের?

'الأذن تعشق قبل العين أحيانا'

'মাঝে মধ্যে চোখে না দেখে শুধু কানে শুনেই ভালোবাসার গভীর বন্ধনে আটকে যেতে হয়!'

তাই এবার নদওয়াকে চোখে দেখে আমার ভালোবাসাময় হৃদয়ের নীরব প্রবাহে খুশি ও তৃপ্তির বান ডেকে গেলো। এক প্রাচীন কবির কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়ে বলে উঠলাম:

كانت محادثة الركبان تخبرنا + عن جعفر بن رَبَاح أطيبَ الخبرِ

حتي التقينا، فلا والله ما سمعت + أذني بأحْسن مما قد رأي بصري!

'দূরে বসে বসে জা'ফর ইবনে রাবাহ সম্পর্কে
কতোজনের কাছে কতো প্রশংসাবাণীই তো শুনলাম।
কিন্তু যখন হলো চোখের দেখা .. যখন বসলো সাক্ষাতের বর্ণিল মেলা,
কসম আল্লাহ্‌র! আমার কান যা কিছু শুনেছে চোখ তারচে' ঢের বেশি
দেখেছে!'

এই সেই নদওয়া, যাকে নিয়ে কবি-সাহিত্যিকেরা প্রশস্তি গেয়েছেন। উলামা-মাশায়েখ তার প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়েছেন। আর আরব জাহানের স্বনামধন্য কথা সাহিত্যিক আল্লামা আলী তানতাভী? তিনি কী বলেছেন নদওয়া নিয়ে?! তিনি বলতে বাধ্য হয়েছেন—

'كم وددت لو رددت إلي عهد الصبا ، فـــــــــأعود لأتعلم في هذه الدار، واتلمذ علي شيوخها، وأرافق طلابها، وأتنفس في رحابها، وأقتبس منها العلم والإيمان.

أو كما قال:

إنها الندوة التي اتخذت شعارها:

الاستفادة من كل قديم نافع، والترحيب بكل جديد صالح، والجمع بين الإيمان الراسخ والعلم الواسع، والثبات علي الأهداف والغايات، والتطور في في الفروع والآلات، والأخذ مما صفا من التراث، وترك ما كدر منه.

'আমার বড়ো সাধ হয় শৈশবে ফিরে যেতে! তাহলে যে আমি এই দারুল উলুম নদওয়াতুল উলামা'র ছাত্র হয়ে এখানে পড়তে পারতাম! এখানকার মহান শিক্ষকদের ছাত্র হয়ে ধন্য হতে পারতাম! এখানকার ছাত্র বন্ধুদের সহপাঠি হওয়ার সাধ কার না জাগে? এই বিদ্যাপীঠের দৃষ্টিনন্দন ক্যাম্পাসের গাঢ় সবুজের বুকে হাঁটতে হাঁটতে প্রাণভরে শ্বাস নেওয়ার স্বপ্নটা কে না দেখে! হায়! যদি পেতাম এখান থেকে ইলম ও ঈমান শেখার সুবর্ণ একটা সুযোগ!!'

নদওয়া সম্পর্কে আরো বলেছেন তিনি—

'এই হলো নদওয়া। যা'র অন্যতম শ্লোগান হলো:

উপকারী যে কোনো প্রাচীন থেকে উপকৃত হওয়া। ভালো ও উপযোগী হলে যে কোনো নতুনকে স্বাগত জানানো। হৃদয়ের গভীরে প্রোথিত ঈমান এবং ব্যাপক-বিস্তৃত জ্ঞানের মাঝে সুসমন্বয় করা। লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের উপর এবং নীতি ও আদর্শের উপর অটল-অবিচল থাকা। স্বকীয়তা ধরে রেখে আধুনিক পদ্ধতি ও পন্থায় বিকাশমানতার দ্বার উন্মোচিত করা। সর্বোপরি যা কিছু ভালো ও কল্যাণকর তা সাদরে গ্রহণ করা এবং যা কিছু মন্দ ও ক্ষতিকর তা বর্জন করা।'

***

তখন মুসলিম বিশ্বে ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থা ছিলো গভীর সঙ্কটাপন্ন। মুসলিম বিশ্ব এমন দু'টি শিক্ষা ব্যবস্থার মুখোমুখি হয়েছিলো যার একটির সাথে আরেকটির ছিলো বৈপরিত্যের সম্পর্ক।

শিক্ষা ব্যবস্থা-১ ঃ যুগ যুগ ধরে চলে-আসা ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থা। আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থার সাথে যার কোনো সম্পর্ক ছিলো না। আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে উন্নতি ও সমৃদ্ধি আনয়নের লক্ষ্যে আধুনিক শিক্ষাকে ইসলামীকরণের মাধ্যমে একটি সমন্বয় সাধনের কোনো ধারণাই তখন খুঁজে পাওয়া যেতো না এই ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থায়।

শিক্ষা ব্যবস্থা-২ ঃ আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থা। যুগের সাথে তাল মিলিয়ে চলাই যার একমাত্র নীতি। বস্তুবাদ ও ধর্মনিরপেক্ষতার আবহে যার জন্ম ও লালন-প্রতিপালন। যেখানে ধর্ম, ধর্মীয় শিক্ষা ও মূল্যবোধের কোনো আলোচনা ও গুরুত্ব নেই।

কেনো সৃষ্টি হয়েছিলো এই বিপরীতমুখী বিভক্তি?

প্রাচীনপন্থীরা মনে করতেন (কেউ কেউ এখনো মনে করেন) পূর্বসুরীরা উত্তরসুরীদের জন্যে সবই করে গেছেন, কিছুই বাকি রাখেন নি। সুতরাং নতুন করে এখন কিছু উদ্ভাবনের অবকাশ কোথায়? কোনো অবকাশ নেই ফিকাহশাস্ত্র নিয়ে নতুন করে 'ইজতিহাদ' বা নতুন আইন প্রণয়ণের জন্যে কোনো গবেষণারও। কোনো অবকাশ নেই শিল্প-সাহিত্যে নতুন কোনো সংযোজনারও কিংবা জ্ঞান-বিজ্ঞান ও শিল্পে নতুন কোনো আবিস্কারেরও। অবকাশ নেই দীনের ব্যাপারে কিংবা মানুষের জীবন প্রবাহ নিয়ে নতুন কিছু খাড়া করারও।

অপরদিকে প্রগতিবাদিরা সবকিছুকেই নতুন করে ঢেলে সাজাতে চায়। তাদের এই মানসিকতার তীব্র সমালোচনা করে আল্লামা ইকবাল বলেছেন ঃ 'এরা কি কা'বাকেও নতুন অস্তিত্ব দান করতে চায়? কিন্তু কা'বার নব-সংস্করণ যে সম্ভব নয়!'

আররাফেঈ রহ. এদের সম্পর্কে বলেছেন ঃ 'এরা কি দীন-ধর্ম ও ভাষা-সাহিত্য এবং চন্দ্র-সূর্য সবকিছুকেই বদলে দিতে চায়?'

যাইহোক; এই বিপরীতমুখী দুই শিক্ষা ব্যবস্থার মাঝে সার্থক সমন্বয় সাধনের এবং উত্তরমেরু ও দক্ষিণমেরুতুল্য যোজন-যোজন দূরত্বকে কমিয়ে এনে একটিকে আরেকটির পরিপূরক করার প্রত্যয় ও অঙ্গীকার নিয়েই— নদওয়াতুল উলামা'র সৃষ্টি ও আবির্ভাব। সুতরাং নদওয়াতুল উলামা'র

আবির্ভাবে ঘুচে গেলো নতুন পুরাতনের ব্যবধান-রেখা। সাধিত হলো সু-সমন্বয়— যুগ যুগ ধরে চলে-আসা ঐতিহ্যিক শিক্ষা এবং যুগ চাহিদার আলোকে নব-আবিস্কৃত (প্রণীত) শিক্ষার মাঝে। অতীত ও বর্তমানের মাঝে। প্রাচীনতা ও আধুনিকতার মাঝে। এভাবে সর্বত্র মুখরিত হলো নদওয়াতুল উলামা'র সেই শ্লোগান, একটু আগে আমরা যা বলে এসেছি।

নদওয়াতুল উলামা'র সৌভাগ্যই বলতে হবে, তা নিজের সংস্কার মিশনে পুরোপুরি সফল। কেননা একেবারে সূচনাকাল থেকেই এই মহান প্রতিষ্ঠানটির হাল ধরার জন্যে আল্লাহ তা'আলা একদল শীর্ষসারির বুযুর্গ ও মনীষীকে তৈরি করে দিয়েছিলেন। তাঁরা নদওয়াতুল উলামাকে সার্বিকভাবে সুসংহত করে তার লক্ষ্য-উদ্দেশ্যের শীর্ষচূড়ায় উন্নীত করতে সক্ষম হয়েছেন। সত্যি তাঁরা অনেক বড় ছিলেন।

তাঁরা বড় ছিলেন জ্ঞান ও প্রজ্ঞায়,
তাঁরা বড় ছিলেন চিন্তা ও চেতনায়,
তাঁরা বড় ছিলেন ধর্মতত্ত্ব ও আধ্যাত্মিকতায়,
তাঁরা বড় ছিলেন সুকুমারবৃত্তি ও চরিত্র সুষমায়,
তাঁরা বড় ছিলেন দৃঢ় প্রতীজ্ঞায় ও বর্ণিল স্বপ্ন-বাসনায়।

তাঁদের শীর্ষভাগে রয়েছেন নদওয়ার স্বপ্নদ্রষ্টা ও প্রতিষ্ঠাতা আল্লামা মুহাম্মদ আলী মুঙ্গেরী রহ. (হযরত ফজলুর রহমান গঞ্জমুরাদাবাদী রহ. এর অন্যতম খলীফা), আল্লামা শিবলি নু'মানী রহ., আল্লামা সায়্যিদ সুলায়মান নদভী রহ. (হযরত থানভী রহ. এর অন্যতম খলীফা), আল্লামা সায়্যিদ আবদুল হাই (শায়খ নদভী রহ. এর পিতা) রহ. এবং সর্বশেষে উল্লেখ্য আল্লামা সায়্যিদ আবুল হাসান আলী নদভী রহ. (আবদুল কাদের রায়পুরী রহ. ও শায়খুল হাদীস যাকারিয়া রহ.-এর খলীফা)।

এই মহান কীর্তিপুরুষেরা পরবর্তীতে নদওয়াকে নেতৃত্ব দানের জন্যে গড়ে তুলেছেন এমন উপযুক্ত উত্তরসুরী, যাঁরা চিন্তা-চেতনায়, চরিত্র-সুষমায় এবং গভীর জ্ঞান-গরিমায় পূর্বসুরীদের আদর্শ নমুনা। ফলে নদওয়ার শিক্ষা-পরিবেশ ও আবহ উদ্ভাসিত হয়েছে গভীর ঈমানী চেতনার দ্যুতিময় পরশে। তাই আমি দাবি করেই বলতে পারি, আপনি দারুল উলুম নদওয়াতুল উলামা'র মতো ইলমে নববী'র এমন দরসগাহ ও বিশ্ববিদ্যালয় খুঁজে পাবেন না। শিক্ষকদের আদর-স্নেহের সযত্ন তত্ত্বাবধানে তিলে-তিলে গড়ে উঠছে ছাত্ররা। শিক্ষকরা তাঁদের মহান পেশা ও দায়িত্বে সদা সচেতন, সদা তৎপর ও উজ্জীবিত। আদর্শ ছাত্র গড়ার স্বপ্নে বিভোর ও আত্মনিবেদিত।

অন্যান্য মাদরাসা ও বিশ্ববিদ্যালয়ে এমন সুসমন্বয় আমার চোখে খুব একটা পড়ে নি। প্রায় সব প্রতিষ্ঠানেরই এক অবস্থা। একটি থাকলে আরেকটি নেই। ভালো সিলেবাস আছে, কিন্তু ভালো কিতাব নেই। ভালো কিতাব আছে কিন্তু ভালো শিক্ষক নেই। আর শিক্ষকের ইলমী যোগ্যতা হয়ত পাওয়া গেলো, কিন্তু হৃদয়টা তাঁর প্রাণহীন, নির্জীব ও নিরস। নিভে গেছে তাঁর ঈমানী চেতনা। নিষ্প্রভ হয়ে গেছে ছাত্র গড়ার মানসিকতা।

আমি নিজে কাতারে এই অনিভিপ্রেত অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হয়েছি। ধর্ম বিজ্ঞান অনুষদের সিলেবাসে খুব ভালো ভালো কিতাব অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, কিন্তু নেই উপযুক্ত শিক্ষক। তীব্র শিক্ষক সঙ্কট চলছে আমাদের সব প্রতিষ্ঠানেই। একটি প্রাণময় ও সরস বিষয়বস্তু শুধুমাত্র শিক্ষকের যোগ্যতা ও উপস্থাপনার কারণে প্রাণহীন নিরস বিষয়ে পরিণত হচ্ছে।

যাই হোক; বলছিলাম প্রিয় নদওয়াতুল উলামা'র কথা। সৌভাগ্যই বলতে হবে, এই পঁচাশিসালা অনুষ্ঠান ছাড়াও আমি আরো তিনবার নদওয়াতুল উলামায় গিয়েছি। একবার গিয়েছিলাম আজমগড়ে 'দারুল মুসান্নিফীন' কর্তৃক অনুষ্ঠিতব্য 'المستشـــرقون في الإســـلام' —ইসলামে প্রাচ্যতত্ত্ববিদ—শীর্ষক সেমিনারে অংশ নিতে। কাতার বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আমার সাথে আরো এসেছিলেন ড. আবদুল আযিম আদ-দাইব ও ড. আলী আল-মুহাম্মদী। তিনদিনব্যাপী এই সেমিনারে আমাকেই সভাপতিত্ব করতে হয়েছিলো শায়খ নদভী'র একান্ত ইচ্ছা ও পীড়াপীড়িতে। এ ছিলো আমার জন্যে এক বিরল সম্মান। সেখানে আমার দেখা হয় আজমগড়ের বিশিষ্ট মুহাদ্দিস আল্লামা হাবীবুর রহমান আজমী'র সাথে। বড়ো ভালো লেগেছিলো তাঁকে। সেমিনার শেষে কাতার নয়— ছুটে গেলাম আমি নদওয়ায়! আগের সফরের অসংখ্য স্মৃতি ঝলমলিয়ে ভেসে উঠলো তখন আমার স্মৃতিপটে!

আরেকবার নদওয়ায় গিয়েছিলাম দাওয়া বিভাগের সমাপনি বর্ষের ছাত্রদের উদ্দেশ্যে محاضـــرة (বক্তব্য) পেশ করার জন্যে। নদওয়ার পরিবেশ আমার সবচে' প্রিয় পরিবেশ— সে কথা তো আগেও বলেছি! এখন আবার বলছি! আসলে এ-কথা আমার বারবার বলতে ইচ্ছে করে! ভালো লাগার কথা মানুষ বারবার বলতে চায়! সব সময় বলতে চায়! নদওয়ার পরিবেশ 'ক্বালাল্লাহ' আর 'ক্বালার রাসূল'-এর মধুময় গুঞ্জরনের পরিবেশ। এই পরিবেশে অবস্থান করলে ঈমান তাজা হয়, আমল বাড়ে। এখানে যাঁরা থাকেন তাঁরা শুধু আল্লাহকে নিয়েই ভাবেন, আল্লাহ্‌র জন্যেই সবকিছু করেন

এবং থাকেনও তাঁরা সব সময় আল্লাহ্র সাথে, তাঁর গভীর সান্নিধ্যে। আমার অবস্থাও ছিলো তাই। কিন্তু তবুও হৃদয়টা আমার প্রচণ্ড এক শূন্যতায় হাহাকার করছিলো। গুমরে গুমরে কাঁদছিলো। কেননা তখন আমার পাশে শায়খ ছিলেন না। তিনি গুরুত্বপূর্ণ এক সফরে ইন্ডিয়ার বাইরে অবস্থান করছিলেন। আমার ইন্ডিয়া ত্যাগের একেবারে শেষ মুহূর্তে তাঁর সাথে আমার সাক্ষাত হয়েছিলো বটে, কিন্তু তাও এই নদওয়ায় নয়, দারুল উলুম দেওবন্দের শতবর্ষপূর্তি অনুষ্ঠানে। আলোচনার এক ফাঁকে শায়খ তাঁর স্বভাবসুলভ হাসিমাখা মুখে আমার কানে কানে বললেন ঃ 'আমি জানতে পারলাম যে, আপনি কথার যাদুতে নদওয়ায় সবার আকল-বুদ্ধি ও হৃদয়-মনকে বন্দি করে ফেলেছেন!' আমি বিনয়ের সাথে তাঁকে উত্তর করলাম ঃ 'যদি এমনটি হয়েই থাকে তাহলে তা প্রথমত আল্লাহ্র মেরেবানীতে অতপর আপনাদের দু'আ ও ভালোবাসায়!'

শায়খের ডাকে সাড়া দিয়ে শেষবার নদওয়ায় এসেছিলাম খুব বেশি দিন আগে নয়। ছাত্র শিক্ষকদের সামনে বেশ ক'টি দীর্ঘ বক্তৃতা করতে হয়েছিলো। সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্র। তিনিই তাওফিক দিয়েছেন। শায়খ নদভী'র জীবদ্দশায় নদওয়ার এই সর্বশেষ সফরটিকে ঘিরে আমার স্মৃতির ভাণ্ডারে যে সমৃদ্ধ সঞ্চয় সংরক্ষিত রয়েছে তার উপর ভর করে বলছিঃ সেবার আমি নদওয়ায় আমার জীবনের শ্রেষ্ঠতম সময় কাটিয়েছি। একেকটা দিন যেনো ছিলো একেকটা বসন্ত। পাখির কলরবে মুখরিত আর ফুলের সুবাসে সুবাসিত বসন্ত। এমন বসন্ত মানুষের জীবনে খুব কমই আসে। সবচে' সৌভাগ্যের ব্যাপার হলো আমার প্রতিটি দীর্ঘ বক্তৃতা অনুষ্ঠানে শায়খ আমার পাশে বসা ছিলেন। এ-ই আমার নদওয়ায় শেষ আসা।

***

শায়খ নদভী'র সাথে আমার যোগাযোগ ছিলো অবিচ্ছিন্ন। বিভিন্ন উপলক্ষে বিভিন্ন জায়গায় তাঁর সাথে আমার দেখা হতো। তাঁর সাথে আমার দেখা হয়েছে কাতারে। কাতার বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠালগ্নে। সেবার 'প্রজন্ম ও জাতি গঠনে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূমিকা' শীর্ষক একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য পেশ করে শায়খ আমাদের সবাইকে মুগ্ধ করেছিলেন। ১৪০১ হিজরীর সূচনালগ্নে তাঁর সাথে আবার আমার দেখা হয়েছিলো সীরাত ও সুন্নাহ বিষয়ক একটি আন্তর্জাতিক সেমিনারে এই কাতারেই। এই সেমিনারের মাধ্যমে মুসলিম উম্মাহ হিজরী পনেরো শতককে স্বাগত জানিয়েছিলো।

শায়খ নদভী ছিলেন এই সেমিনারের সহ-সভাপতি। এ ছাড়া তাঁর সাথে আমার দেখা হয়েছিলো আলজেরিয়ায় ইসলামী চেতনা বিকাশ কেন্দ্রে। তাঁর সাথে আমার সবচে' বেশি দেখা হতো মক্কা মুকাররমাভিত্তিক রাবেতায়ে আলমে ইসলামী'র ফিকাহ একাডেমি'র বৈঠকে, আমরা দু'জনই এই একাডেমি'র সদস্য ছিলাম। অনুরূপভাবে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের গভর্নিং বোর্ডের সভায় তাঁর সাথে আমার দেখা হতো। তিনি ছিলেন এই বোর্ডের সভাপতি।

পাঠক! এতোক্ষণ আপনাকে বললাম তাঁর সাথে আমার কোথায় কখন কোন সুবাদে দেখা হয়েছে—সে কথা। এ ছিলো চোখের দেখা। বিশ্বাস করুন! আমার অন্তর তাঁকে সবসময় দেখতো! তাঁর চিন্তা-পরশে ধন্য হতো! আল্লাহ্‌র ভালোবাসার ছায়ায় বসে-বসে এবং ইসলামের বিস্তৃত আঙিনায় বসে-বসে আমরা একে অপরকে সব সময় দেখতাম, অনুভব করতাম!!

আজ শায়খ নেই! চলে গেছেন আমাদের ছেড়ে চিরতরে আল্লাহ্‌র সান্নিধ্যে! আর কোনোদিন তিনি আমাদের মাঝে ফিরে আসবেন না!

তাঁর আত্মার আত্মীয় যারা,
তাঁর রক্তের বাঁধনে আবদ্ধ যারা,
তাঁর ইলমের সৌরভে সুরভিত যারা,
তাঁর শিষ্যত্বের সবুজ ছায়ায় দাঁড়িয়ে আছেন যারা–
তাদেরকে কী বলে আজ সান্ত্বনা দিই?!

কোন্ ভাষায় সমবেদনা জানাই আরব-আজমের কোটি কোটি মুসলমানকে?!

সবাই তো তাঁকে ভালোবাসতো হৃদয়ের গভীর থেকে!!

হে আল্লাহ! এই শোকাবহ মুহূর্তে আমাদেরকে দাও ধৈর্য! দাও উত্তম বদলা! আর তাঁর কবরকে নূরে রহমতে দাও পূর্ণ করে!! আমীন!

إنا لله وإنا إليه راجعون.

***

প্রথম অধ্যায়

সায়্যিদ আবুল হাসান আলী নদভী'র জীবনালেখ্য

> জন্ম পরিবার শিক্ষা
> তাঁর জীবনে প্রভাব ফেলেছে যে সব কিতাব ও ব্যক্তিত্ব
> কর্ম জীবন, দাওয়াতি জীবন ও বিশ্ব সফর
> তাঁর মহান ব্যক্তিত্বের মৌলিক উপাদান
> বিশ্ব মুসলিম উম্মাহর কাছে তাঁর মর্যাদা, অবস্থান ও ভালোবাসা

প্রথম অধ্যায়

জন্ম পরিবার শিক্ষা

শায়খ নদভী রহ. এর জীবনালেখ্য লিখতে বসে আমাকে কোনো সঙ্কটে পড়তে হয় নি। কোনো বেগ পেতে হয় নি। কেননা শায়খ নিজেই তাঁর যাদুমাখা শক্তিশালী কলমে একেবারে শৈশব থেকে শুরু করে জীবনের নানা দিক ও ধাপ ফুটিয়ে তুলেছেন তাঁর বিভিন্ন কিতাবে। এর ভিতরে উল্লেখযোগ্য হলো في مسيرة الحياة—জীবন সফরে— কিতাবটি। এটি তিন খণ্ডে বিভক্ত। আরেকটি উল্লেখযোগ্য কিতাব হলো مذكرات سائح في الشرق العربي—মধ্যপ্রাচ্য ঘুরে আসা এক পরিব্রাজকের ডায়রী। এ-কিতাবটি তিনি লিখেছেন হিজায (মক্কা-মদিনা), মিসর, সিরিয়া, জর্দান, কুয়েতসহ আরো কিছু আরব দেশ সফর করে এসে। সময়টা ছিলো ১৯৫১ সাল। এ ছাড়া আরো কিছু সফরনামা থেকে শায়খের জীবনের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে স্পষ্ট একটা ধারণা নিতে মোটেই কষ্ট হয় না।

পাঠক! আপনাকে নিয়ে আমরা শায়খের জীবনের বিস্তৃত-অঙ্গনে প্রবেশ করতে পারবো না। শুধুমাত্র তাঁর বর্ণাঢ্য জীবনের অতি গুরুত্বপূর্ণ দিক ও ধাপগুলোই আমরা আপনার সামনে তুলে ধরার চেষ্টা করবো। তবে এর মানে অবশ্যই এ নয় যে, কোনো কিছু আমরা বাদ দিচ্ছি। বলবো সবই। তবে সংক্ষেপে, সুসংহত শব্দচিত্রে—না বেশি, না কম।

নাম, জন্ম ও বংশ

নাম সায়্যিদ আবুল হাসান আলী। (ভারত উপমহাদেশে সবাই তাঁকে আদর করে শ্রদ্ধাভরে ডাকতো— 'আলী মিয়াঁ, মাওলানা 'আলী মিয়াঁ) পিতার নাম সায়্যিদ আবদুল হাই আল-হাসানী আর দাদার নাম সায়্যিদ ফখরুদ্দীন আল-হাসানী। ১৩৩২ হিজরী'র মুহররম মাসে তাঁর জন্ম। লখনৌ প্রদেশের রায়বেরেলী জেলার তাকিয়াকিলাঁ গ্রামে। লখনৌ থেকে রায়বেরেলী'র দূরত্ব ৮০ কিলোমিটার।

কয়েক শতাব্দীকাল থেকে তাঁর পূর্বপুরুষেরা হিন্দুস্তানে বসবাস করলেও তাঁর বংশ পরম্পরা গিয়ে মিলিত হয়েছে খাঁটি আরব রক্তের

সাথে। ইসলামের সাথে রয়েছে যাঁদের নাড়ির টান। ইলমে নববী'র প্রচার প্রসারে, ইসলামের নানামুখী খিদমতে এবং মুসলিম উম্মাহর কল্যাণ কামনায় যাঁরা ছিলেন সদা তৎপর ও নিবেদিতপ্রাণ।

শুধু খাঁটি আরব রক্তের কথা বলছি কেনো? তাঁর বংশের পুণ্যধারা বরং মিলিত হয়েছে একেবারে হযরত আলী রা. পর্যন্ত গিয়ে! এ জন্যেই তাঁর বংশের সবাই 'হাসানী' হিসাবে প্রসিদ্ধি লাভ করেছেন। তাঁর পূর্বপুরুষের মধ্যে সর্ব প্রথম হিন্দুস্তানে আগমন করেন আমির সায়্যিদ কুতবুদ্দীন মুহাম্মদ আল-মাদানী (৫৮১-৬৭৭ হিজরী)।

হিজরী সপ্তম শতাব্দীর প্রারম্ভে মোগলদের ভিতরে যখন গোলযোগ চলছিলো তখন তিনি কিছু সংখ্যক সাথী সঙ্গীসহ বাগদাদ ও গজনী হয়ে হিন্দুস্তানে আগমন করেন। প্রথমে কিছুদিন দিল্লিতে অবস্থান করেন। সেখানে দাওয়াতের কাজে আত্মনিয়োগ করেন। তখন অনেকেই তাঁর শিষ্যত্ব বরণ করেন। এরপরই বেরিয়ে পড়েন তিনি জিহাদে। বীর বিক্রমে লড়তে থাকেন। কেল্লার পর কেল্লায় উড়াতে থাকেন বিজয় নিশান। পাশাপাশি ছড়িয়ে দিতে থাকেন ইসলামের শাশ্বত পয়গাম। ইলমী যোগ্যতা ও প্রজ্ঞার ছায়ায় এবং দীপ্ত জিহাদী চেতনায় তিনি গড়ে তুলেন এমন এক মুবারক জামাত যারা ছিলেন বিশুদ্ধ আকিদা-বিশ্বাসে, আলোকিত চিন্তা-চেতনায়, গভীর জ্ঞান-প্রজ্ঞায় এবং ইসলামের দাওয়াত ও তাবলিগে—অবিকল তাঁরই নমুনা।

আমির সায়্যিদ কুতবুদ্দীনের বংশধরদের ভিতরেও আল্লাহ বরকত দান করেছিলেন। তাঁদের ভিতরে জন্ম নিয়েছেন শীর্ষসারির উলামা এবং আল্লাহ্‌র পথের নিষ্ঠাবান দাঈ। মুসলমানদের কল্যাণ-কামনায় তাঁদের সবাই ছিলেন আত্মনিবেদিত। যুগে-যুগে তাঁরা নেতৃত্ব দিয়েছেন বিভিন্ন দীনি প্রতিষ্ঠানের। তাঁদের অগ্রভাগে ছিলেন সায়্যিদ শাহ আলামুল্লাহ ইবনে ফোযাইল আল-হাসানী রহ.। ১০৯৬ হিজরীতে তিনি রায়বেরেলীতে ইন্তেকাল করেন। রায়বেরেলীর তাকিয়াকিলাঁয় তিনিই প্রতিষ্ঠা গেছেন المركز الديني —আল-মারকাজুদ দ্বীনি।

অনুরূপভাবে সায়্যিদ শাহ আলামুল্লাহ ইবনে ফোযাইল আল-হাসানী রহ. এর বংশধরেও জন্ম নিয়েছেন ইসলামের জন্যে আত্মনিবেদিত আলেম দাঈ ও মুজাহিদ। তাঁদের ভিতরে যে নামটি ধ্রুব তারার মতো ইতিহাসের আকাশে জ্বলজ্বল করে জ্বলছে, তিনি ভারত উপমহাদেশের বৃটিশ খেদাও

আন্দোলনের বীর সেনানী ইমাম সায়্যিদ আহমদ ইবনে ইরফান শহীদ রহ.—সায়্যিদ আহমদ শহীদ রহ. নামে যিনি অধিক প্রসিদ্ধ ও পরিচিত। জিহাদ আর দাওয়াত মিশেছিলো তাঁর রক্তের কণায়-কণায়। জিহাদের পথে আর দাওয়াতের ময়দানে উৎসর্গ করে দিয়েছিলেন তিনি জীবনকে। মেহনতে-মেহনতে আর সাধনায়-সাধনায় ভারতের উত্তর-পূর্ব সীমান্তে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন সত্যিকারের পরিপূর্ণ ইসলামী হুকুমত। যদিও ইংরেজদের ষড়যন্ত্রে-চক্রান্তে বেশি দিন তা স্থায়ী হতে পারে নি।

জিহাদ যাঁর জীবনের ব্রত, শাহাদত তো তাঁকে হাতছানি দিয়ে ডাকবেই! ডেকেছেও! ২৪ শে জিলকদ ১২৪৬ হিজরী মোতাবেক ৬ই মে ১৮৩১ ঈসায়ীতে 'বালাকোট'-এর সেই ময়দানে লড়তে-লড়তে এবং লড়াতে-লড়াতে নীরবে হারিয়ে যান তিনি শাহাদতের কাঙ্খিত গন্তব্যে। প্রতিপক্ষ ছিলো ইংরেজ বেনিয়াদের লেলিয়ে-দেয়া শিখ সম্প্রদায়। শায়খ নদভী তাঁকে নিয়ে লিখেছেন একাধিক গ্রন্থ।

পাঠক! এই পরিবারের জ্ঞান ও প্রজ্ঞার কথা এবং গুণ ও বৈশিষ্ট্যের কথা লিখে শেষ করা যাবে না।

এই পরিবারে জন্ম নিয়েছে প্রতিভার পর প্রতিভা।
এই পরিবারে জন্ম নিয়েছেন আলেম,
এই পরিবারে জন্ম নিয়েছেন দাঈ,
এই পরিবারে জন্ম নিয়েছেন মুজাহিদ,
এই পরিবারে জন্ম নিয়েছেন ইতিহাসবিদ,
এই পরিবারে জন্ম নিয়েছেন কবি,
এই পরিবারে জন্ম নিয়েছেন লেখক-সাহিত্যিক,
এই পরিবারে জন্ম নিয়েছেন আধ্যাত্মিক জগতের বড় বড় ইমাম,
এই পরিবারে জন্ম নিয়েছেন আরো কতো রবি-শশী-গ্রহ-তারা!

সেই তাঁদেরই একজন হলেন শায়খ নদভী'র দাদাজান সায়্যিদ ফখরুদ্দীন ইবনে আবদুল আলী আল-হাসানী রহ.। জন্ম নিয়েছেন তিনি ১২৫৬ হিজরীতে। অতি অল্প বয়সেই শেষ করেন কুরআন পড়া। তারপর দক্ষতা অর্জন করেন উর্দূ ও ফারসীতে এবং শরীয়তের অন্যান্য বুনিয়াদি বিষয়ে। তারপর সদরুল মুদাররিসীন হিসাবে যোগ দেন হায়দারাবাদের একটি সরকারী মাদরাসায়।

তিনি ছিলেন একজন সুলেখক ও শক্তিমান সাহিত্যিক এবং বিদগ্ধ গবেষক। তাঁর রেখে যাওয়া অমর কীর্তিসমূহের মধ্যে রয়েছে مہر جان تاب । এ-গ্রন্থটি তিন খণ্ডে বিভক্ত। ফারসী ভাষায় রচিত। এ-গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয় হলো— জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিল্প-সাহিত্য ও মহা মনীষীদের জীবন-কথা। তাঁর আরেকটি গ্রন্থ হলো سیرۃ السادات । এতে তিনি আলোচনা করেছেন মহা মানব ও বড়দের জীবন চরিত ও বংশনামা নিয়ে। তাঁর আরেকটি গ্রন্থ হলো سیرۃ الشیخ علم الدین الحسنی (শায়খ আলামুদ্দীন আল-হাসানী রহ. জীবন-কথা, ফারসী)। এ ছাড়া উর্দূ ভাষায় রয়েছে তাঁর একটি অনবদ্য কাব্যগ্রন্থ। তিনি ছিলেন দুনিয়া-বিরাগ এক আল্লাহওয়ালা বুযুর্গ। ১০ই রমজান ১৩২৬ হিজরী মেতাবেক অক্টোবর ১৯০৮ ঈসায়ীতে তিনি ইন্তে কাল করেন। আল্লাহ তাঁর কবরকে নূরে রহমতে পূর্ণ করে দিন!

পরিবার

ব্যক্তি গঠনে পরিবারের ভূমিকাই মুখ্য। ভালো পরিবার থেকেই জন্ম নেয় ভালো মানুষ। আদর্শ পরিবার থেকেই জন্ম নেয় আদর্শ মানুষ। পরিবারে যদি থাকে দীনি পরিবেশ ইলম ও জ্ঞানের আবহ, পরিবারে যদি থাকে মায়া ও মমতা এবং সুশাসন ও সুনিয়ন্ত্রণ, তাহলে এমন পরিবারে সৃষ্টি হবেই উন্নত চরিত্রের আদর্শ মানুষ। সজাগ চেতনার শ্রেষ্ঠ নাগরিক। পরিচালিত হবে তাদের জীবন সুকুমারবৃত্তির সবুজ ছায়ায় এবং প্রবাহিত হবে কল্যাণমুখিতার উচ্ছল ধারায়। থাকবে না আবিলতা। কোনো ক্লেদ।

পাঠক! আমার শায়খ আবুল হাসান আলী নদভী রহ. এমন পরিবারেই জন্ম নিয়েছিলেন। বেড়ে ওঠার সুযোগ পেয়েছিলেন। তাঁর পরিবারে ছিলো শুধুই দীনের চর্চা। ইলমের চর্চা। ঈমান শেখার চর্চা। আমল বাড়ানোর চর্চা। আদর্শ মানুষ হিসাবে গড়ে ওঠার চর্চা। তাবৎ সুকুমারবৃত্তির আধারে পরিণত হওয়ার চর্চা। এ জন্যেই শায়খ নদভী 'বড়' হতে পেরেছিলেন। কেননা তিনি বড়দের তারবিয়াত লাভ করেছিলেন। ইসলামী দুনিয়ার তথা আরব-আজমের এক শ্রেষ্ঠ আলেমে পরিণত হতে পেরেছিলেন।

এখন আমরা এই পরিবারের পরিচয় তুলে ধরবো। অবশ্যই এ পরিবারের সকল সদস্য দীন ও তাকওয়ার শ্রেষ্ঠ নমুনা। ইলম ও আমলের আদর্শ দৃষ্টান্ত। চিন্তা ও চেতনার আলোকিত মশাল। তাঁদের স্বভাব-চরিত্র

যেনো শিশিরস্নাত সাদা গোলাপের পাপড়ি! এই পরিবারের পরিচয় জানলেই আমরা জানতে পারবো— পরিবার কেমন হয়। পরিবারকে কেমন হতে হয়!

"وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ"

'উৎকৃষ্ট জমিন থেকে তার ফসল উৎপন্ন হয় তার প্রতিপালকের নির্দেশে।' -আ'রাফ: ৫৮

আরব কবি যোহায়র ইবনে আবি সুলমার ভাষায়

وهل يُنْبتُ الخَطِي إلا وشيجهُ + وتُغْرَسُ إلا في منابتها النخْلُ؟

'কোন্ সে উদ্ভিদ উৎপন্ন হয় শিকড় ছাড়া?
যেখানে-সেখানে রোপন করা যায় কি খর্জুরবীথি?'

শায়খের পিতা

তিনি আল্লামা সায়্যিদ আবদুল হাই আল-হাসানী রহ.। জন্ম ১৮ই রমজানের ১২৮৬ হিজরী.. মোতাবেক ২২সে ডিসেম্বরের ১৮৬৯ ঈসায়ী। হিজরী চৌদ্দ শতক কিংবা বিংশ শতাব্দী'র তিনি এক কীর্তিপুরুষ। এক শীর্ষস্থানীয় আলেমে দীন। তাঁর গোটা সময়কালটাই ছিলো হিন্দুস্তানের ইতিহাসে সভ্যতা ও চিন্তা-দর্শন এবং রাজনৈতিক ও সামাজিক দিক থেকে সবচে' বেশি গোলযোগপূর্ণ ও ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ সময়কাল। প্রাচ্য-প্রতীচ্যের ভিতরে চলছিলো সভ্যতা ও চিন্তানৈতিক সংঘাত। ১৮৫৭ সালের মহা গোলযোগপূর্ণ সময়টাও তিনি দেখেছেন। ইংরেজরা মেতে উঠেছিলো তখন ভয়ঙ্কর ধ্বংস তাণ্ডবে। প্রবল ইংরেজ-বিরোধিতার কারণে তাঁর পিতা সায়্যিদ ফখরুদ্দীন রহ.-কে তখন ইংরেজ-রোষ থেকে বাঁচার জন্যে কিছুদিন অজ্ঞাত পল্লীতে গা-ঢাকা দিতে হয়েছিলো। এ-সময়টা এতো ভয়াবহ ছিলো যে, মুসলমানদের শত শত বছরের লালিত সভ্যতা-সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের উপর প্রলয়ঙ্করী তাণ্ডব নেমে এসেছিলো। ইংরেজদের ত্রাসনে-শোসনে-নিপীড়নে পিষ্ট হতে লাগলো মুসলমানরা। নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতে লাগলো তাদের ইতিহাস-ঐতিহ্য ও সমাজ-সভ্যতা।

আল্লামা সায়্যিদ আবদুল হাই রহ. এই সঙ্কটাপন্ন পরিবেশের ভিতরেই বড় হয়েছেন। দেখেছেন মুসলমানদের কক্ষচ্যুতি ও অধঃপতন। বেদনার্ত হৃদয়ে দেখেছেন হাজার বছরের ক্ষমতা ও নেতৃত্ব থেকে মুসলমানদের

অপমানজনক বিদায়। 'নেতৃত্ব' যাদের 'শোভা' তারাই আজ নেতৃত্বহারা হয়ে ইংরেজদের হাতে মার খাচ্ছে— এ দৃশ্য তাঁর হৃদয়ে সবচে' বেশি রক্তক্ষরণ ঘটিয়েছে। অথচ অন্যদিকে অমুসলিমরা—শাসক মুসলমানের সেই শাসিত প্রজারা তখন ইংরেজদের আনুকূল্য পেয়ে তরতর করে সামনে এগিয়ে যাচ্ছিলো। কী ব্যবসা-বাণিজ্যে, কী নেতৃত্ব ও সুযোগ-সুবিধায়। নেতৃত্ব ও ক্ষমতার পালাবদলে তারা মোটেই বিচলিত হলো না। প্রভাবিত হলো না। বরং ইংরেজ শাসনকে নিজেদের জন্যে আশির্বাদই মনে করতে লাগলো। পরিস্থিতি এতোটা নাজুক পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছিলো যে, কোনো কোনো মুসলামান ইংরেজদের প্রতি সীমাহীন ঘৃণা ও স্তূপীকৃত ক্ষোভের কারণে ইংরেজী ভাষাকে বয়কট করার সিদ্ধান্ত নিলো এবং আধুনিক শিক্ষা ও পাঠক্রম থেকেও নিজেদেরকে দূরে সরিয়ে নিলো। কিন্তু প্রতিবাদের এ ধরনটা তাদের জন্যে খুবই ক্ষতিকর প্রমাণিত হয়েছিলো। এ কারণে তারা অনেক পিছিয়ে পড়েছিলো— শিক্ষা, রাজনীতি, অর্থনীতি ও চাকরি-বাকরির ক্ষেত্রে। অপরদিকে অমুসলিম সম্প্রদায় এ-সুযোগে শিক্ষা, রাজনীতি, অর্থনীতি ও চাকরি-বাকরির ক্ষেত্রে অনেক এগিয়ে গিয়েছিলো। মুসলমানদের জন্যে এ ছিলো এক বিরাট ক্ষতি ও শূন্যতা।

আল্লামা সায়্যিদ আবদুল হাই রহ. এই ক্ষতি ও শূন্যতা পুরোপুরি অনুভব করলেন এবং কীভাবে তা পূরণ করা যায়, গভীরভাবে তা ভাবতে লাগলেন। তিনি মনে করতেন যে, মুসলমানদের ভিতরে জাগরণ সৃষ্টি করতে হলে, তাদেরকে সমাজ জীবনের স্বাভাবিক স্রোতধারায় ফিরিয়ে আনতে হলে, বিশ্বের কাছে ইসলামের পয়গাম নিয়ে ছুটে যাওয়ার জন্যে অবশ্যই তাদেরকে সঠিকভাবে ইসলামকে বুঝতে হবে, জীবনের বাঁকে- বাঁকে তার সঠিক বাস্তবায়ন করতে হবে। গুরুত্ব দিতে হবে শিক্ষা ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রতি। প্রচলিত সমাজ-সভ্যতা সম্পর্কেও তাদেরকে থাকতে হবে সজাগ ও সচেতন । মুকাবিলা করতে হবে দৃঢ়তার সাথে সময়ের সকল চ্যালেঞ্জ। তিনি আরো মনে করতেন যে, মুসলমানদের অধঃপতনের সবচে' বড় কারণটা হলো— চলমান জীবনধারা ও প্রচলিত জ্ঞান-বিজ্ঞান থেকে নিজেদেরকে দূরে সরিয়ে রাখা এবং উম্মতকে সঠিক দিক-নির্দেশনা প্রদানে ব্যর্থ হওয়া।

হ্যাঁ.. এই অনুভবের আগুনে জ্বলতে জ্বলতেই তিনি এসে যোগ দিলেন নদওয়াতুল উলামা'র মিছিলে। আর এ-মিছিলে শরীক হওয়াটাই

ছিলো তখন সময়ের সেরা দাবি। কেননা, মুসলমানদেরকে ঘিরে যে স্বপ্ন তিনি দেখছিলেন তা বাস্তবায়নের সকল আয়োজনই তিনি এখানে এসে দেখতে পেলেন। তাই নদওয়াকে কেন্দ্র করেই এরপর থেকে আবর্তিত হতে লাগলো তার সকল চাওয়া-পাওয়া। অত্যন্ত নিষ্ঠার সাথে জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তিনি পালন করে গিয়েছিলেন নদওয়াতুল উলামা'র মহা পরিচালকের দায়িত্ব।

তাঁর বর্ণাঢ্য জীবনে প্রতিবিম্বিত হয়েছিলো এক মহান সমাজ-সংস্কারক ও আলেম এবং এক স্বাধীন চিন্তানায়ক ও সূক্ষ্মদর্শী সাহিত্যিকের যাবতীয় গুণাবলী ও বৈশিষ্ট্য।

তাঁর আবেগ কখনো টলাতে পারে নি তাঁর দৃঢ়তাকে। বরং
তাঁর আবেগ ছিলো তাঁর দৃঢ়তায় পরিপুষ্ট।
তাঁর আবেগ ছিলো তাঁর ঈমানী চেতনায় বলীয়ান।
তাঁর আবেগ ছিলো তাঁর সংস্কার মানসে শক্তিমান।
তাঁর আবেগ ছিলো তাঁর দূরদর্শিতায় আলোকিত।
তাঁর আবেগ ছিলো তাঁর উম্মতমুখী কল্যাণকামিতায় সিক্ত।

যুগের চাহিদা ও চ্যালেঞ্জ সম্পর্কেও তিনি উদাসীন ও অসচেতন ছিলেন না। তিনি তাঁর সময়কালের সকল চ্যালেঞ্জ মুকাবিলা করেছেন– আপন ব্যক্তিত্বের মহিমা ছড়িয়ে ছড়িয়ে। আর ফেলে-আসা অতীতের প্রতিনিধিত্ব করেছেন তাঁর অমর ঐতিহাসিক গ্রন্থসম্ভার দিয়ে। সুতরাং তিনি ছিলেন নদওয়াতুল উলামা'র সংস্কার-আন্দোলনের বুনিয়াদি স্তম্ভ। তাঁর জাগ্রত তত্ত্বাবধানেই নদওয়া থেকে সৃষ্টি হয়েছিলেন জগদ্বিখ্যাত ও বিশ্ববরেণ্য উলামায়ে কেরাম এবং খ্যাতিমান লেখক-সাহিত্যিকগণ, যাঁরা সমৃদ্ধ করে গেছেন ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞানের ভাণ্ডারকে। আরবী ভাষা ও সাহিত্যে এবং অনুরূপ উর্দূ ভাষা ও সাহিত্যে রেখে গেছেন মূল্যবান অবদান। তিলে তিলে গড়ে তুলেছেন 'দারুল মুসান্নিফীন'[১] এর মতো সমৃদ্ধ গবেষণাগার ও লাইব্রেরী।

[১] 'দারুল মুসান্নিফীন' আজমগড়ে অবস্থিত। এশিয়া মহাদেশের অন্যতম সেরা ও দুর্লভ এবং বিষয়-বৈচিত্রে সমৃদ্ধ ও সুবিন্যস্ত একটি লাইব্রেরী। সুদূর আরব মুলুক থেকেও এখানে গবেষণার জন্যে ছুটে আসেন আরব দেশের শীর্ষস্থানীয় উলামায়ে কেরাম। বাংলাদেশ ভারতের প্রতিবেশী হওয়া সত্ত্বেও বাংলাদেশে এমন লাইব্রেরী এখনো অকল্পনীয়। -অনুবাদক

তিনি ভালোবাসতেন ঐতিহ্যকে লালন করতে—বুকের ভিতর ধরে রাখতে তারপর উম্মতের মাঝে ছড়িয়ে দিতে। তিনি ভালোবাসতেন পূর্বসুরীদের মহান কীর্তিগাথা দুনিয়াবাসির সামনে আঁধার রাতের জ্বলজ্বল নক্ষত্রের মতো দেদীপ্যমান করে রেখে যেতে। তাই বুঝি তাঁর ঐতিহ্যপ্রেমী কলম থেকে বেরিয়ে এসেছিলো نزهة الخـــواطر (নুযহাতুল খাওয়াতির)[১] এর মতো 'অমর-অক্ষয়' ও কালজয়ী ঐতিহাসিক গ্রন্থ! সারে চার হাজার কীর্তিমান পুরুষকে চিরস্মরণীয় করে রাখার শ্রেষ্ঠ প্রয়াস!! যা লিখতে তাঁর সময় লেগেছিলো সুদীর্ঘ ৩০ বছর!! কিন্তু এ-তো ছিলো তাঁর অনেক অনে-ক অবদানের একটি অবদান। সব অবদানের কথা এই সংক্ষিপ্ত পরিসরে বলিই বা কেমন করে? সংক্ষেপে বলা যায়; তিনি আমাদেরকে দিয়ে গেছেন অনেক কিছু। الثقافة الإســـلامية في الهنـــد (হিন্দুস্তানে ইসলামী সভ্যতা-সংস্কৃতি) তাঁর আরেকটি অবদান। الهنـــد في العهـــد الإســـلامي (ইসলামী শাসনামলে হিন্দুস্তান) তাঁর আরেকটি অবদান। এ সবই ঐতিহাসিক গ্রন্থ। এ সব ঐতিহাসিক অবদানের জন্যে তাঁকে যদি হিন্দুস্তানের 'ইবনে খাল্লিকান' আখ্যা দেয়া হয়, তাহলে তা কি বাড়িয়ে বলা হবে? হাদীস এবং ফিক্‌হের ময়দানেও তাঁর কলম অতি সাবলীলভাবে বিচরণমান ছিলো। تهذيب الأخلاق (তাহযিবুল আখলাক) । قـــانون في انتفـــاع المـــرتهن بـــالمرهون (বন্ধকী বস্তু দ্বারা বন্ধকগ্রহীতার উপকৃত হওয়ার বিধান) এবং الغناء وحكمه في الشـــرع (শরীয়তের দৃষ্টিতে গান) তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। এ সবই ছিলো আরবী ভাষায় লেখা। উর্দূতেও লিখেছেন তিনি গুজরাট রাজ্যের ইতিহাস ও স্মৃতিকথা নিয়ে يـــاد أيـــام এবং উর্দূ কবিতার ইতিহাস নিয়ে كـــل رعنـــا (নজরকাড়া গোলাপ)-এর মতো গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ। كل رعنـــا গ্রন্থটি একাধিক বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ানো হয়। এ ছাড়া দীনি শিক্ষা, সমাজতত্ত্ব ও নৈতিকতায় উৎকর্ষ সাধনের জন্যেও তিনি লিখেছেন। আত্মীয়তার বন্ধন দৃঢ় ও অটুট রাখা সম্পর্কে তিনি লিখেছেন إصـــلاح (ইসলাহ বা সংশোধন) নামে একটি গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ।

শিশুদের জন্যে লিখতেও তিনি ভুলেন নি। তাদের জন্যে লিখে গেছেন মনের মাধুরি মিশিয়ে আর শিশু মনের সাথে একেবারে একাকার হয়ে تعليم

---

[১] এ কিতাবটি বর্তমানে الإعلام بمن في تاريخ الهند من الأعلام নামে প্রকাশিত হয়েছে নয় খণ্ডে।

الإسلام (তা'লিমুল ইসলাম বা ইসলাম শিক্ষা) এবং نـــور الإيمـــان (নূরুল ঈমান বা ঈমানের আলো)-সহ আরো অনেক কিছু।

একদিকে নদওয়াতুল উলামা'র মহাপরিচালকের দায়িত্ব পালন করেছেন তিনি, অন্যদিকে পড়ানোর দায়িত্বও পালন করেছেন সমানভাবে। একাধারে তিনি পড়াতেন– তাফসীর, হাদীস, আরবী ভাষা ও সাহিত্য এবং একজন চিকিৎসক হিসাবে চিকিৎসা বিজ্ঞানও। কিন্তু শেষ দিকে আরবী ভাষা ও সাহিত্য এবং চিকিৎসা বিজ্ঞান পড়ানো ছেড়ে দিয়েছিলেন। শুধু তাফসীর আর হাদীস পড়ানোর জন্যেই নিজেকে নিবেদিত করেছিলেন। এ খিদমত জারি ছিলো একেবারে ওফাত পর্যন্ত। ১৫ই জমাদিউস সানি শুক্রবার ১৩২৩ হিজরী মোতাবেক ২রা ফেব্রুয়ারি ১৯২৩ সালে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

তিনি দু'বার বিবাহ করেছেন। প্রথম স্ত্রী ছিলেন মামাতো বোন সায়্যিদা যয়নাব বিনতে সায়্যিদ আবদুল আযিয আল-হাসানী। বিবাহের দশ বছর পর তিনি ইন্তেকাল করলে সায়্যিদা খায়রুননেসা বিনতে সায়্যিদ জিয়াউদ্দীন আল-হাসানী'কে বিবাহ করেন তিনি। প্রথম স্ত্রী ইন্তেকাল করেন ১৩১৯ হিজরীতে আর তিনি দ্বিতীয় বিবাহ করেন ১৩২২ হিজরীতে। প্রথম স্ত্রী রেখে যান একমাত্র পুত্র সন্তান ডা. সায়্যিদ আবদুল আলী আল-হাসানী রহ.কে। দ্বিতীয় স্ত্রীর ঔরষে জন্ম নেন শায়খ নদভীসহ দু' বোন– সায়্যিদা আমাতুল আযিয ও সায়্যিদা আমাতুল্লাহ তাসনীম আয়েশা।

শায়খের আম্মা

তিনি হলেন সায়্যিদা খায়রুন নেসা বিনতে জিয়াউন্নবী আল-হাসানী। তিনি কুরআনে কারিমের হাফেজা ছিলেন। একজন সুলেখিকাও ছিলেন। باب الرحمة (রহমতের দরোজা) ও مفتاح بـــاب الرحمـــة (রহমতের দরোজার চাবি) নামে তাঁর দু'টি কবিতা সংকলন রয়েছে। باب الرحمـــة লিখেছেন তিনি আবেগঘন দু'আ ও মুনাজাতের ভাষায়। مفتاح بـــاب الرحمـــة লিখেছেন তিনি রাসূলে আরাবী'র প্রশস্তি গেয়ে। এ ছাড়া মহিলাদের শিক্ষা-দীক্ষা, পরিবার ও সমাজ-জীবন নিয়ে লিখেছেন الذائقة (আয্ যাইকা) ও حســـن المعاشـــرة (আদর্শ পারিবারিক জীবন)। তাঁর আরেকটি গ্রন্থের নাম الـــدعاء والقـــدر (দু'আ ও তাকদীর)।

১৩৬৬ হিজরীতে হজব্রত পালনের উদ্দেশ্যে মক্কা গমন করেন। তখন মসজিদে হারাম ও মসজিদে নববী'র পাশে প্রায় ছয়মাস ইবাদত-বন্দেগী ও যিকির-আযকারের মধ্য দিয়ে কাটান। খান্দানের মহিলাদের মধ্যে তিনি ছিলেন নিয়মিত তাহাজ্জুদগুযার। আল্লাহ্‌র রহমতস্নাত শেষ রজনী'র নীরব প্রহরগুলো নীরবে বয়ে যেতো তাঁর হৃদয়মথিত অশ্রুঘন কাব্যময় মুনাজাতে মুনাজাতে! দরবারে ইলাহিতে তাঁর কাকুতি-মিনতিতে ঘরময় এক জান্নাতি আবহ সৃষ্টি হতো! খান্দানের অন্যান্য মহিলারাও তাঁর সাথে কখনো কখনো জুড়ে বসতেন। তিনি ছিলেন এক মহিয়সী মা। শায়খ নদভীকে তিনি মায়া ও শাসনে তিলে তিলে গড়ে তুলেছিলেন। ১১৮৮ হিজরীতে তিনি ইন্তেকাল করেন।

শায়খের বড় ভাই

তিনি ডা. সায়্যিদ আবদুল আলী ইবনে আবদুল হাই আল-হাসানী। প্রথম জীবনে তিনি মেডিকেল কলেজ থেকে কৃতিত্বের সাথে ডাক্তারি পাশ করেন। অতঃপর দারুল উলুম নদওয়াতুল উলামায় শরীয়া অনুষদের সকল বিষয়ে ব্যুৎপত্তি অর্জন করে কৃতিত্বের সাথে পড়াশুনা শেষ করেন। পরবর্তীতে তাঁর কাঁধে ন্যস্ত হয় নদওয়াতুল উলামা'র মহাপরিচালকের দায়িত্ব। পিতার ইন্তেকালের সময় শায়খ নদভী'র বয়স ছিলো মাত্র ন' বছর। এতিম ছোট্ট ভাইটির সার্বিক দায়িত্ব তখন তিনিই নিজের কাঁধে তুলে নেন। সজাগ-সচেতন এক অভিভাবক হিসাবে তিনিই তাঁকে ধাপে ধাপে গড়ে তুলেন।

جغرافيــة الجزيــرة العربيــة (আরব ব-দ্বীপের ভূগোল) সম্পর্কে একটি গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থও তিনি রচনা করেন। উল্লেখ্য যে, নদওয়া থেকে البعــث الإســلامي নামে আরব-আজমে আলোড়ন সৃষ্টিকারী যে মাসিকটি প্রকাশিত হয়, তার প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক ও প্রসিদ্ধ লেখক ও কলামিস্ট সায়্যিদ মুহাম্মদ আল-হাসানী'র তিনি গর্বিত পিতা। ২১শে জিলকদ ১৩৮০ হিজরী.. মোতাবেক ৭ই নভেম্বর ১৯৬১ সালে তিনি ইন্তেকাল করেন।

শায়খের বড় বোন

তিনি সায়্যিদা আমাতুল আযিয বিনতে আবদুল হাই। ১৩২৪ হিজরী.. মোতাবেক ১৯০৬ সালে তিনি জন্ম গ্রহণ করেন। বড়ো ইবাদতগুযার মহিলা

ছিলেন তিনি। ছিলেন সুলেখিকাও। তাঁর লেখা কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ ও পুস্তিকা হলো: في السيرة النبوية (রাসূলের জীবন-কথা), سيرة أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها (উম্মুল মু'মিনীন হযরত খাদিজা রা.), سيرة أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها (হযরত আসমা বিনতে আবু বকর রা.)।

তিনি এক রত্নগর্ভা জননী। তাঁর কোলে জন্ম নিয়েছেন এমন চারজন ছেলে, যাঁদের প্রত্যেকেই স্বনামধন্য আলেম, সাহিত্যিক ও গবেষক।

এক. শায়খ সায়্যিদ মাহমুদ হাসান রহ.।

দুই. শায়খ সায়্যিদ মুহাম্মদ সানী রহ.। তিনি ছিলেন বিশিষ্ট লেখক ও কবি। তিনি তাবলিগ জামাতের আমির এবং سنن أبي داود (আবু দাউদ শরীফ) এর প্রখ্যাত ব্যাখ্যাগ্রন্থ بذل المجهود -এর রচয়িতা শায়খ আল্লামা ইউসুফ কান্ধলভী রহ. এর একটি জীবনীগ্রন্থ লিখেছেন। নাম: سيرة الشيخ محمد يوسف الكاندهلوي (শায়খ মুহাম্মদ ইউসুফ কান্ধলভী রহ. এর জীবন-কথা)।

তিন. শায়খ মুহাম্মদ রাবে আল-হাসানী নদভী। আল্লাহ তাঁর হায়াতকে আরো বাড়িয়ে দিন! তিনি একজন বিদগ্ধ গবেষক, বিজ্ঞ আলেম, শক্তিমান লেখক ও সাহিত্যিক। শায়খ নদভী'র পর তিনিই এখন নদওয়াতুল উলামা'র নাজেম বা মহাপরিচালক। পাশাপাশি তিনি ইসলামী গবেষণা একাডেমি (المجمع الإسلامي العلمي) -এর প্রধান। শায়খ নদভী প্রতিষ্ঠিত আন্তর্জাতিক ইসলামী সাহিত্য সংস্থার ভাইস চেয়ারম্যান। চেয়ারম্যান হিসাবেই তাঁকে সবাই চেয়েছিলেন, কিন্তু অত্যন্ত বিনয়ের সাথে তিনি অপারগতা প্রকাশ করেন।

চার. শায়খ সায়্যিদ ওয়াজেহ রশিদ আল-হাসানী নদভী। তিনিও একজন বিশিষ্ট আলেম, গবেষক, সাংবাদিক, লেখক ও সাহিত্যিক। নদওয়া থেকে প্রকাশিত পাক্ষিক الرائد (আর রাইদ)-এর সম্পাদক।

শায়খের ২য় বোন

তিনি সায়্যিদা আমাতুল্লাহ তাসনীম আয়েশা। তিনিও ছিলেন বড়ো গুণবতী ও পুণ্যবতী। তাঁর লেখা একটি গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ হলো: زاد سفر (সফরের পাথেয়)। এটি মূলত হাদীসের বিখ্যাত কিতাব رياض الصالحين

(পুণ্যবানদের উদ্যান) এর প্রাঞ্জল ও সাবলীল অনুবাদ। হিন্দুস্তানের বিভিন্ন মাদরাসায় তা সিলেবাসের অন্তর্ভুক্ত। তাঁর আরেকটি গ্রন্থ হলো: موج تسنيم (তাসনীম তরঙ্গ)। এ ছাড়া তাঁর রয়েছে দু'আ ও মুনাজাতের ভাষায় রচিত একগুচ্ছ কবিতা। মুসলিম নারীদের মুখপত্র উর্দূ মাসিক 'রিদওয়ান'-এর তিনি সম্পাদিকা ছিলেন। ১৩৯৬ হিজরীতে তাঁর ইন্তেকাল হয়।

শায়খের ভাতিজা

সায়্যিদ মুহাম্মদ ইবনে আবদুল আলী ইবনে আবদুল হাই। তাঁর পিতার পরিচয় দিতে গিয়ে একটু আগেই আমরা তাঁর নাম উল্লেখ করে এসেছি। লেখায় এবং বলায় তিনি ছিলেন শায়খ নদভী'র প্রতিচ্ছায়া। তাঁর সাহিত্য ছিলো— শিল্পনৈপুণ্যে পরিপুষ্ট। তাঁর উপস্থাপনা ছিলো— বিবেক-দোলানো, হৃদয়-কাঁপানো। তাঁর প্রতিষ্ঠিত ও সম্পাদিত আরবী মাসিক البعث الإسلامي আরব দুনিয়ায় ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি করেছিলো। মাত্র ৪৪ বছর বয়সে তাঁকে আমরা হারিয়েছি। এই ক্ষণজন্মা প্রতিভার প্রতি বর্ষিত হোক আল্লাহ্র রহমতের অফুরন্ত বারিধারা। জান্নাতুল ফিরদাউসের শ্রেষ্ঠ মাকাম হোক তাঁর শেষ ঠিকানা!

শায়খের মামা

সায়্যিদ উবায়দুল্লাহ হাসানী। তিনি কুরআনে কারীমের হাফেজ ছিলেন। শায়খ নদভী'র শিক্ষা, নৈতিকতা ও বুদ্ধিবৃত্তিক মানস গঠনে তাঁর ছিলো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। সে কথা বিস্তারিত আলোচনা করেছেন শায়খ নদভী তাঁর 'পূরানে চেরাগ' গ্রন্থে।

শায়খের খালা

সায়্যিদা সালেহা বিনতে জিয়াউন্নবী হাসানী। তিনি কুরআনে কারীমের হাফেজা ছিলেন। বড়ো সুললিত কণ্ঠে তিনি উর্দূ কবিতা আবৃত্তি করে করে হেরেমের মহিলাদেরকে শোনাতেন এবং তাদেরকে আল্লাহ্র আনুগত্য, রাসূলের ভালোবাসা ও তাঁর সুন্নতের অনুসরণের প্রতি উদ্বুদ্ধ করতেন।

শায়খের স্ত্রী

তিনি ছিলেন শায়খের মামা সায়্যিদ আহমদ সাঈদ হাসানী'র মেয়ে, সায়্যিদ জিয়াউন্নবী হাসানী রহ.-এর পৌত্রি এবং সায়্যিদ আবদুর রাযেক

কালামী'র মেয়ের মেয়ে। সায়্যিদ আবদুর রাযেক কালামী একজন বিশিষ্ট লেখক ছিলেন। صمصام الإسلام (ইসলামের ধারালো তলোয়ার) তাঁর লেখা একটি অনবদ্য গ্রন্থ। এটি মূলত ইমাম আল-ওয়াকিদী'র সাড়া জাগানো কিতাব: فتوح الشام (সিরিয়া বিজয়ধারা)-এর চমৎকার কাব্যানুবাদ।

শায়খ নদভী'র স্ত্রী ছিলেন বড়ো আদর্শবতী ও পুণ্যবতী। শায়খ নদভী'র সুখ যেমন তাঁকে আনন্দ দিতো, দুঃখ দিতো তেমনি বেদনা। সারাটা জীবন ত্যাগ-নিষ্ঠায়-ভালোবাসায় তিনি শায়খ নদভী'র খিদমত করে গিয়েছেন। আল্লাহ্ তাঁকে উত্তম বদলা দান করুন।

***

তাঁর জীবনে প্রভাব ফেলেছে যে সব কিতাব

শায়খ নদভী'র জীবনীকাররা উল্লেখ করেছেন যে, প্রথম জীবনে শায়খ কিছু কিছু কিতাব পড়ে সীমাহীন প্রভাবিত হয়েছিলেন। তাঁর চিন্তা-চেতনা ও মন-মানসে গভীর রেখাপাত-করা এ-সব কিতাবের প্রতি তাঁর অনুরাগ ছিলো বড়ো বেশি! প্রসঙ্গ আসলেই তিনি এ-সব কিতাবের আলোচনা করতেন। গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি কিতাব হলো এই:

১- صمصام الإسلام (ইসলামের ধারালো তলোয়ার)। শায়খের পিতার চাচা সায়্যিদ আবদুর রাযেক হাসানী এর লেখক। এটি মূলত ইমাম আল-ওয়াকিদী বিরচিত فتوح الشام (সিরিয়া বিজয়ধারা) নামক ঐতিহাসিক গ্রন্থের অনবদ্য কাব্যানুবাদ।

২- مسدس حالي আলতাফ হোসাইন হালি'র কাব্যগ্রন্থ। যা'র ছন্দ ছয় মাত্রার পর্বে বিন্যস্ত। চিন্তা-বিপ্লব নিয়ে রচিত এ কাব্যগ্রন্থটি হিন্দুস্তান ও ইসলামী বিশ্বে বেশ সমাদৃত।

৩- رحمة للعالمين (রহমাতুল-লিল-আ'লামীন), এটি কাজী সোলায়মান মানসুরপুরী বিরচিত সীরাতের একটি কালজয়ী গ্রন্থ। এ-গ্রন্থের সাহায্যে শায়খ নদভী সীরাতে রাসূলের সাথে গভীরভাবে পরিচিত হয়েছিলেন। তাঁর কিশোর হৃদয়ের পেলব জমিনে ফুটেছিলো নবী-প্রেমের শত শত ফুল। এ গ্রন্থের পুরো কাহিনী লিখেছেন তিনি নিজের মুগ্ধ-অনুভূতির মিশেলে এই শিরোনামে— الكتاب الذي لا انسي فضله (সেই কিতাব, যার অবদান ভোলবার নয়)।

৪- الفــاروق (আল-ফারূক), দ্বিতীয় খলীফা হযরত ফারূকে আজমকে নিয়ে আল্লামা শিবলি নু'মানী'র অমর রচনা।

৫- قيــام الليــل (কিয়ামুল লাইল বা তাহাজ্জুদ), এর লেখক হলেন মুহাম্মদ ইবনে নসর আল-মারুযী আল-বাগদাদী।

৬- শায়খুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমিয়া রহ.এর সূরায়ে নূরের তাফসীর।

৭- ইবনে কায়্যিম আল-যাওজিয়াহ প্রণীত: الجواب الكافي لمن سأل عــن الدواء الشــافي (আরোগ্যদানকারী ঔষধ সম্পর্কে জানতে চাওয়া ব্যক্তির পূর্ণ জবাব)।

৮- نزهة الخواطر وبهجة المسامع والنواظر (হৃদয় ভাসে বিনোদনে .. কানে বয়ে যায় আনন্দ-স্রোত .. দৃষ্টিতে হাসে কতো সুখ)। এটি তাঁর পিতার অমর ঐতিহাসিক কীর্তি। যাঁর কথা আমরা পূর্বে বলে এসেছি। বর্তমানে গ্রন্থটির নতুন সংস্করণ ছাপা হয়েছে বৈরুত থেকে এই নতুন নামে ঃ الإعلام بمن في الهند من الأعلام (হিন্দুস্তানের প্রতিভার সন্ধানে)।

৯- আল্লামা আবদুল বারী নদভী'র লেখা مذهب و عقليات (মাযহাব ও যুক্তি) এটি উর্দূ ভাষায় লেখা। শায়খ নদভীর ভাগিনে দক্ষ হাতে তার আরবী তরজমা আঞ্জাম দিয়েছেন।

শায়খ নদভী'র বিশিষ্ট শিক্ষকগণ

এক. শায়খ খলীল ইয়ামেনী রহ. ঃ

শায়খের শিক্ষা জীবনে তাঁর প্রভাব ছিলো বড়ো বেশি। ১৩৮৬ হিজরীতে তিনি ইন্তেকাল করেন। এই 'শফিক' (দয়ামায়াময়) উস্তায সম্পর্কে বড়ো আবেগঘন ভাষায় শায়খ নদভী নিজের অনুভূতি তুলে ধরেছেন। নিজেদের মনের মতো করে যাঁরা ছাত্রদের হৃদয়-মনকে সুরভিত করেন—ইলমে নববী'র ফুল ফুটিয়ে ফুটিয়ে, তাঁদের সেই সুরভিত ছাত্ররা তো তাঁদের সম্পর্কে বলতে গিয়ে আবেগাপ্লুত হবেনই! শায়খ নদভী'র ভাষায় ঃ

'তিনি ছিলেন অনন্য ব্যক্তিত্বের অধিকারী। নিজের আবেগ-অনুভূতি ও চিন্তা-চেতনার সাথে মিশে যেতে ছাত্রদেরকে বাধ্য করতেন তিনি। মোটেই

জোর-জবরদস্তিমূলকভাবে নয়— তাঁর অদ্ভুত বিস্ময়কর যোগ্যতার ক্ষমতাবলে। যে কিতাবই তিনি পড়াতেন, তা পড়াতে গিয়ে ছাত্রদের মন-মানসের গভীরে মিশে যেতেন একেবারে রক্ত-মাংসের ন্যায়। কিতাবের প্রতিটি বর্ণ, ছত্র সর্বোপরি তার মর্মের গভীরে চলে যেতেন তিনি। একাকী নয়— ছাত্রদেরকে সঙ্গে নিয়ে। ফলে কিতাবের বিষয়বস্তু ও মর্ম এবং কিতাব লেখার লক্ষ্য-উদ্দেশ্য— সবই ছাত্রদের সামনে পরিস্কার হয়ে যেতো। এ ক্ষেত্রে তাঁর দৃষ্টান্ত খুঁজে পাওয়া আসলেই কঠিন। হয়ত সেরা সেরা শিক্ষকদের হাজার সংখ্যার ভিতরে দু' একজন পাওয়া যেতে পারে। এ প্রতিভা অর্জন করা যায় না— এ আল্লাহ্‌র এক বিশেষ দান। আরবী ভাষা ও সাহিত্যের সঠিক স্বাদ আস্বাদনের এক অদ্ভুত ও বিস্ময়কর যোগ্যতা আমি তাঁর মাঝে দেখেছি।'[১]

দুই. ড. তাকি উদ্দীন আল-হিলালী রহ.ঃ

তাঁর পূর্ণ নাম হলো ড. মুহাম্মদ তাকি উদ্দীন ইবনে আবদুল কাদের আল-হিলালী আল-মাগরিবী। তিনি ছিলেন মরক্কো'র অধিবাসী। আরবী ভাষা ও সাহিত্যে ছিলো তাঁর সীমাহীন দক্ষতা ও নৈপুণ্য। শায়খ নদভী তাঁর সম্পর্কে বলেছেন ঃ

'সত্যি কথা হলো; আরবী ভাষা ও সাহিত্যের দূ-র দিগন্তকে স্পর্শ করার জন্যে আমি যে-সফর শুরু করেছিলাম— আমার উস্তায শায়খ খলীল আল-ইয়ামেনী রহ.-এর হাত ধরে, তা-ই ষোলকলায় পূর্ণতা লাভ করে ড. তাকি উদ্দীন আল-হিলালী রহ. এর হাতে। নিয়মিত দরসের বাইরে সুযোগ খোঁজে-খোঁজে আমি হাজির হয়ে যেতাম তাঁর কাছে প্রতিদিনই। তাঁর সান্নিধ্য-পরশ আমার পিপাসার্ত মনকে অনেক দিয়েছে—তৃপ্ত করেছে। বড় ভাইজানের সাথে তাঁর ঘনিষ্ঠতার সুবাদে এবং শায়খ খলীল আল-ইয়ামেনী'র পরিচয়ে তিনি আমাকে বড়ো স্নেহ করতেন। দরসে বসে আমি তাঁর কাছে পড়েছি ديوان النابغة (নাবিগা আয-যুবইয়ানি'র কাব্য-সঙ্কলন)[২] তাঁর বলা প্রতিটি ব্যাখ্যা ও সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ আমি খাতায় লিখে রেখেছিলাম।'[৩]

---

[১] في مسيرة الحياة — জীবন সফরে:১/৮৭)

[২] তিনি জাহিলী যুগের একজন বিশিষ্ট কবি।

[৩] في مسير الحياة

তিন. আল্লামা শায়খ হায়দার হাসান খান আত-তূংকী রহ.ঃ

শায়খ নদভী'র আরেকজন বিশিষ্ট উস্তায হলেন আল্লামা শায়খ হায়দার হাসান খান রহ.। তাঁর সম্পর্কে শায়খ বলেন ঃ

'শায়খুল হাদীস আল্লামা হায়দার হাসান খান রহ. এর কাছে 'নদভী ছাত্র'দের সাথে আমিও মিশে গেলাম। তিনি তখন দারুল উলূম নদওয়াতুল উলামা'র শায়খুল হাদীস ছিলেন। তাঁর কাছে আমি বুখারী-মুসলিমসহ আবু দাউদ, তিরমিযী অক্ষরে-অক্ষরে পড়েছি। তা ছাড়া তাফসীরে বায়যাবীও কিছুটা পড়েছি।'[১]

চার. বিশিষ্ট মুফাসসির শায়খ আহমদ আলী লাহুরী রহ.ঃ

তাঁর কাছে শায়খ নদভী বিশেষভাবে তাফসীর অধ্যয়ন করেছেন। পাশাপাশি শায়খ ওয়ালিউল্লাহ দেহলভী রহ. এর حجة الله البالغة (হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ)ও পড়েছেন।

পাঁচ. শায়খুল হাদীস আল্লামা হোসাইন আহমাদ মাদানী রহ.ঃ

শায়খের আরেকজন বিশিষ্ট উস্তায হলেন শায়খুল হিন্দ আল্লামা হোসাইন আহমদ মাদানী রহ.। তিনি ছিলেন স্বাধীনতা আন্দোলন ও বৃটিশ বিতাড়নের অগ্রনী বীরপুরুষ। জমিয়তে উলামায়ে হিন্দের সভাপতি। দারুল উলুম দেওবন্দে বসে শায়খ নদভী তাঁর কাছে হাদীস অধ্যয়ন করেছেন। তাঁর সম্পর্কে শায়খ বড়ো আবেগময় ভাষায় বলেছেন ঃ

'দেওবন্দে দারুল হাদীসের পরিবেশে ছেয়ে থাকতো অদ্ভুত এক ঐশীধারা ও আধ্যাত্মিকতা! আজো আমার কানে বাড়ি খায় শায়খ মাদানী'র সুমিষ্ট আওয়াজ, তাঁর আরবীয় কন্ঠ-লহরী!'[২]

সমকালীন মহান ব্যক্তিত্বঃ পরশ যাঁদের লেগেছে হৃদয়ে

এক. শায়খ মুহাম্মদ ইলিয়াস কান্ধলভী রহ. (১৩০৩-১৩৬২ হিজরী)ঃ

তিনি আল্লাহ্‌র পথের এক মহান দাঈ। মুসলিম বিশ্বের শীর্ষ উলামায়ে কেরামের মধ্যে অন্যতম ব্যক্তিত্ব। তাবলীগ জামাতের প্রতিষ্ঠাতা। যে

---

[১] في مسيرة الحياة

[২] شخصيات وكتب للشيخ الندوي. دار القلم، دمشق.

জামাতের দাঈগণ আজ প্রাচ্য-প্রতীচ্যের সীমানা পেরিয়ে বিশ্বময় ছড়িয়ে পড়েছে ইসলামের পয়গাম ও দাওয়াত নিয়ে। পৃথিবীর প্রায় সর্বত্রই এই জামাতের আমল চালু রয়েছে। এই কাজের সুবাদে শায়খ নদভী শায়খ ইলিয়াস রহ. এর সাথে গভীরভাবে সম্পৃক্ত হয়ে পড়েছিলেন। ফলে ঘুরে গিয়েছিলো তাঁর জীবনের মোড়। লক্ষ্য করুন শায়খ নদভী'র নিজের ভাষায় ঃ

'জীবনে আমি সবচে' বেশি প্রভাবিত হয়েছি আল্লাহ্‌র পথের মহান দাঈ, মুসলিম উম্মাহর দরদি বন্ধু হযরত মাওলানা ইলিয়াস রহ. এর সুমহান ব্যক্তিত্ব-পরশে। তিনি ছিলেন আল্লাহ্‌র মা'মুর (আল্লাহ কর্তৃক নির্দেশিত)। আমি বলছি না যে, তাঁর কাছে ওহী বা আসমানী প্রত্যাদেশ আসতো। কিন্তু তাবলীগ জামাতের এই সুমহান কাজের জন্যে তিনিই ছিলেন আল্লাহ্‌র মনোনীত বান্দা। পথভোলা মানুষকে ইসলামের কাছে নিয়ে আসার জন্যে তাঁর এই যে চিন্তা-ভাবনা, এর মধ্যে তিনি নিজেকে একেবারে বিলীন করে দিয়েছিলেন। পথভ্রষ্ট ও দিকভ্রান্ত মানুষের কাছে ছুটে গিয়েছিলেন দরদভরা মনের ব্যাকুলতা নিয়ে। ডেকেছিলেন তাদেরকে গভীর মমতায় ইসলামের শাশ্বত বাণীর দিকে। আল্লাহ-রাসূলের সর্ব-আনুগত্যের দিকে। আল্লাহ্‌র খলীফা হিসাবে তাঁর নির্দেশ পালনের জন্যে এ লক্ষ্যে তিনি ছুটে গিয়েছিলেন ব্যাকুল-বে-কারার চিত্তে মানুষের দ্বারে-দ্বারে। তাঁর চালু করা এ-আমল ও দাওয়াতের কাজ বর্তমানে শুধু হিন্দুস্তানেই নয়— এশিয়া মহাদেশসহ ইউরোপ-আমেরিকায়ও ছড়িয়ে পড়েছে। এখন বিশ্বময় এ-কাজ চলছে সকাল-সন্ধ্যা। তাবলীগ জামাতের দাওয়াতের সুফল ও সাফল্য, অন্য যে কোনো দাওয়াতের তুলনায় বেশি, অনেক বেশি।' (সাপ্তাহিক আল-মুজতা'মা, কুয়েত, সংখ্যা নং:১৩৩৮)

দুই. শহীদ হাসানুল বান্না (১৯০৬-১৯৪৯ ঈসায়ী)ঃ তিনি 'ইখওয়ানুল মুসলিমীন'-এর প্রতিষ্ঠাতা। শহীদ হাসানুল বান্না'র সাথে সাক্ষাত না হলেও তাঁর সাথে সাক্ষাতের তীব্র আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করেছিলেন তিনি। এমনই হয়, কিছু কিছু জিনিস চাইলেও হয় না। যেমন এই তীব্র আকাঙ্ক্ষা সত্ত্বেও শেষ পর্যন্ত তাঁদের সাক্ষাত হলোই না। আল্লাহ হয়ত এই অদেখা-গভীর সম্পর্কের ভিতরেই কোনো মঙ্গল লুকিয়ে রেখেছেন। শায়খ নদভী শহীদ হাসানুল বান্না সম্পর্কে জানতে বেশ কৌতূহলী ছিলেন এবং ইখওয়ানের

কর্মী ও বই-পুস্তকের সাহায্যে তাঁর সম্পর্কে একটা স্পষ্ট ধারণাও লাভ করেছিলেন। তিনি ইখওয়ানের কর্মীদেরকে মহান শহীদের অসমাপ্ত কাজ এগিয়ে নিয়ে যেতে বারবার উৎসাহ দিয়েছেন।

আমার স্পষ্ট মনে পড়ে; ১৯৫১ সালে শায়খ যখন মিসর এসেছিলেন, তখন ইখওয়ানের বেশ কিছু কর্মী তাঁর সাথে সাক্ষাত করতে এসেছিলো। সাথে আমিও ছিলাম। তখন তাদের কাছে শহীদ বান্না সম্পর্কে শায়খ নদভী অনেক কিছুই জেনে নিয়েছিলেন। তাঁর ব্যাপারে শায়খের সীমাহীন আগ্রহ দেখে আমরাও মন খোলে তাঁর সাথে কথা বলেছি এবং নিজেরা যা-যা জানতাম সব তাঁকে বলেছি। তিনি আমাদের কথা তখন বড়ো মনোযোগের সাথে শুনছিলেন। তাঁর আলোকোদ্ভাসিত চেহারা দেখে মনে হচ্ছিলো, তিনি যেনো ইমাম বান্নার মধ্যে নিজের জীবনের অনেক কিছুরই মিল খুঁজে পেয়েছেন।

আমাদের এ-ধারণা আরো বদ্ধমূল হয়েছে, ইমাম বান্না'র গুরুত্বপূর্ণ একটি কিতাবের জন্যে তাঁর লেখা একটি ভূমিকা পড়ে। কিতাবটির শিরোনাম ছিলো: مذكرات الدعوة والداعية (দাওয়াত ও দাঈর পথ-নির্দেশ)। আমি সেই ভূমিকা থেকেই আমার একটি কিতাবে শায়খ নদভী'র একটি 'জীবন্ত' বাক্য উদ্ধৃত করেছি। আমার কিতাবটির শিরোনাম ছিলো— الإخوان المسلمون: سبعون عاما في الدعوة والتربية والجهاد—ইখওয়ানুল মুসলিমীন: দাওয়াত, প্রশিক্ষণ ও জিহাদের সত্তর বছর।

তিন. শায়খ আবদুল কাদের রায়পুরী (১৩৮২ হিজরী)ঃ তিনি ছিলেন রুহানিয়াত ও আধ্যাত্মিকতার আদর্শ ও জীবন্ত নমুনা। আল্লাহওয়ালা বুযুর্গদের মধ্যে বড়ো মর্যাদাপূর্ণ অবস্থান ছিলো তাঁর। তিনি সেই সব আধ্যাত্মিক রাহবারদের অন্তর্ভুক্ত, উম্মত যাঁদের প্রতি সর্বযুগে.. সর্বকালে তাঁদের ঐশী বরকত ও ফুয়ূযে ক্বালব থেকে সুরভিত হওয়ার ভীষণ মুখাপেক্ষী। শায়খ নদভী তাঁর কাছে আধ্যাত্মিক দীক্ষা অর্জন করেন এবং তাঁর সান্নিধ্য ও তারবিয়তি জলসা থেকে সীমাহীন উপকৃত হন। (শেষ পর্যন্ত তাঁর খেলাফত লাভেও ধন্য হন।)

চার. ডক্টর মুহাম্মদ ইকবাল (১৮৭৬-১৯৩৮ ঈসায়ী): ভারত উপমহাদেশের বিখ্যাত কবি, দার্শনিক ও ইসলামী চিন্তানায়ক। হিজরী চৌদ্দ শতকটা ছিলো তাঁর শ্রেষ্ঠ সময়। শায়খ নদভী ছিলেন আল্লামা ইকবালের লেখা ও ব্যক্তিত্বে সীমাহীন প্রভাবিত, বিমোহিত। শায়খ নদভী'র লেখায়-সাহিত্যে-কথায় বারবার ফুটে উঠেছে 'ইকবালী' চেতনা-দর্শন। তাঁকে নিয়ে আল্লামা নদভী দীর্ঘ গবেষণা করেছেন। গভীরভাবে অধ্যয়ন করেছেন তাঁর কবিতা। এমনকি তাঁর কাব্য-ভাণ্ডারের একটি সমৃদ্ধ অংশকে তিনি প্রাণময় বাঙ্ময় আরবীতে রূপ দিয়ে সমৃদ্ধ করেছেন আরবী সাহিত্য-ভাণ্ডারকেও। মুগ্ধ করেছেন আরব দুনিয়াকে। আল্লামা ইকবালকে নিয়ে শায়খ নদভী'র সব-প্রয়াসের শেষ-নির্যাস জমা হয়েছে তাঁর অমর গ্রন্থ روائع إقبال —ইকবাল সাহিত্যের নন্দনধারা-এর শব্দে-শব্দে, বাক্যে-বাক্যে। এ ছাড়া তাঁর অন্যান্য বই-পুস্তকেও 'ইকবাল-মানস'কে অপূর্ব শিল্প-নৈপুণ্যের প্রভায় ফুটিয়ে তোলা হয়েছে।

মিসর সফরের সময় শায়খ নদভী ছাত্রদের সামনে ইসলামের এই দার্শনিক কবিকে নিয়ে মন ছুঁয়ে-যাওয়া এক ভাষণ দিয়েছিলেন। (একটু পর তার আলোচনা আসছে।)

আরব-আজমের রাজা-বাদশা ও শীর্ষ নের্তৃবৃন্দের সাথে শায়খ নদভী'র সাক্ষাত

১. ১৯৫১ সালে শায়খ নদভী জর্দানের তৎকালীন বাদশা আবদুল্লাহ বিন হোসাইনের সাথে সাক্ষাত করে মতবিনিময় করেন।

২. ১৯৭৩ সালে তাঁর (বাদশা আবদুল্লাহ বিন হোসাইনের) নাতি বাদশা হোসাইন বিন তালালের সাথে সাক্ষাত করেন এবং মতবিনিময় করেন।

৩. ১৯৬৩ সালে বাদশা ফয়সল বিন আবদুল আযিযের সাথে সাক্ষাত করেন—যখন তিনি যুবরাজ। বাদশা হওয়ার পরও তাঁর সাথে শায়খের কয়েকবার সাক্ষাত হয় এবং মুসলিম উম্মাহর সার্থ-সংশ্লিষ্ট বিষয়ে মতবিনিময় হয়।

৪. বাদশা ফাহদ ইবনে আবদুল আযিযের সাথে তাঁর সাক্ষাত হয় দু'বার। একবার—যখন তিনি যুবরাজ। আরেকবার—যখন তিনি বাদশা।

৫. ১৯৭৪ সালে মরক্কো'র বাদশা দ্বিতীয় হাসানের সাথে তাঁর সাক্ষাত হয়।

৬. ১৯৭৬ সালে শারজা'র প্রশাসক শায়খ সুলতান বিন মুহাম্মদ আল-কাসেমী'র সাথে তাঁর অন্তরঙ্গ বৈঠক হয়।

৭. ১৯৮৪ সালে ইয়ামেনের প্রেসিডেন্ট আলী আবদুল্লাহ সালেহ'র সাথে তাঁর সাক্ষাত হয়।

৮. ১৯৮৪ সালে পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট জিয়াউল হকের সাথে তাঁর অন্তরঙ্গ বৈঠক হয় এবং গভীর মতবিনিময় হয়।

এ ছাড়া দেশ-বিদেশের শীর্ষ নেতৃবৃন্দের সাথেও তাঁর বিভিন্ন সময় সাক্ষাত ও মতবিনিময় হয়।

যে সব গুরুত্বপূর্ণ সংস্থা, সংগঠন বিশ্ববিদ্যালয়ের সভাপতি বা সদস্য ছিলেন

১. নদওয়াতুল উলামা'র মহাসচিব ও নদওয়াতুল উলামা পরিচালিত দারুল উলুমের সভাপতি।

২. রাবেতায়ে আলমে ইসলামী'র প্রতিষ্ঠাতা সদস্য।

৩. মক্কাভিত্তিক মসজিদ সংক্রান্ত সর্বোচ্চ পরিষদের সদস্য।

৪. মিসরভিত্তিক দাওয়াত ও ত্রাণ বিষয়ক সর্বোচ্চ পরিষদের সদস্য।

৫. নদওয়াতুল উলামা'র ইসলামী গবেষণা একাডেমি ও প্রকাশনা পরিষদের সভাপতি।

৬. ভারতের দ্বীনি শিক্ষা কাউন্সিল-এর সর্বোচ্চ পরিষদের সভাপতি।

৭. ভারতের মুসলিম পার্সোনাল ল' বোর্ড-এর সভাপতি।

৮. আজমগড় দারুল মুসান্নিফীন-এর সভাপতি।

৯. অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ সেন্টারের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি।

১০. আন্তর্জাতিক ইসলামী সাহিত্য সংস্থার স্বপ্নদ্রষ্টা, প্রতিষ্ঠাতা ও সভাপতি।

১১. দারুল উলুম দেওবন্দের মজলিসে শূরার সদস্য।

১২. পাকিস্তান আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের মজলিসে শূরার সদস্য।

১৩. মদিনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের মজলিসে শূরার সদস্য।

১৪. দামেস্ক আরবী ভাষা ফাউণ্ডেশনের সদস্য।

১৫. কায়রো আরবী ভাষা ফাউণ্ডেশনের সদস্য।

১৬. জর্দান আরবী ভাষা ফাউণ্ডেশনের সদস্য।

১৭. জর্দান রাজকীয় ইসলামী গবেষণা পরিষদের সদস্য।

শায়খ নদভী'র ইলমী ও দীনি খিদমতের বর্ণিল স্বীকৃতিঃ দেশ-বিদেশের বিভিন্ন পুরস্কার

১. ইসলামের খিদমতের জন্যে ১৯৮০ সালে বাদশা ফয়সাল আন্ত র্জাতিক পুরস্কার লাভ।

২. ১৯৮১ সালে কাশ্মির বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সাহিত্যে (সম্মানজনক) পিএইচডি ডিগ্রী লাভ।

৩. ১৪১৯ হিজরীর শ্রেষ্ঠ ইসলামী ব্যক্তিত্ব হিসাবে দুবাই সরকারের পুরস্কার লাভ।

৪. ১৪২০ হিজরীতে ইসলামী গবেষণা ও অধ্যয়নের জন্যে ব্রুনাই সুলতানের পুরস্কার লাভ।

যাঁদের সাথে হয়েছে তাঁর পত্র যোগাযোগ

ক. আসাতিযায়ে কেরাম ও ওলামা-মাশায়েখ এবং লেখক সাহিত্যিক

১. শায়খ খলীল ইবনে মুহাম্মদ আল-ইয়ামেনী।

২. শায়খ মুহাম্মদ ড. তাকি উদ্দীন আল-হিলালী।

৩. শায়খ সায়্যিদ আলাভী আব্বাস আল-মালেকী।

৪. শায়খ আবদুল্লাহ ইবনে হোমায়দ।

৫. শায়খ আবদুল আযিয বিন আবদুল্লাহ বিন বায।

৬. শায়খ মুহাম্মদ বাহজা আল-বিতার।

৭. শায়খ মুহাম্মদ বাহজা আল-আসারী।

৮. শায়খ আবদুল্লাহ বিন আলী আল-মাহমুদ।

৯. শায়খ আহমদ আবদুল আযিয আল-মুবারক।

১০. শায়খ আবদুল ফাত্তাহ আবু গুদ্দাহ।

১১. শায়খ আলী তানতাভী

১২. অধ্যাপক আল-বাহি আল-খাওলী।

১৩. ড. আহমদ আমিন।
১৪. শহীদ সায়্যিদ কুতব।
১৫. অধ্যাপক মুহাম্মদ আল-মুবারক।
১৬. শায়খ মুহাম্মদ আল-গাযালী।
১৭. অধ্যাপক মাহমুদ মুহাম্মদ শাকের।
১৮. মুহাম্মদ আসাদ।
১৯. অধ্যাপক আহমদ আশ-শিরবাসী।
২০. অধ্যাপক আনোয়ার আল-জুনদি।
২১. অধ্যাপক আবদুর রহমান রাফাত পাশা।
২২. এই বইয়ের লেখক (ড. ইউসুফ আল-কারজাভী)।

খ. নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ

১. শায়খ মুহাম্মদ আমিন আল-হোসাইনী।
২. ড. মোস্তফা আস-সিবাঈ।
৩. শায়খ মুহাম্মদ আস সুরুর আশ শুব্বান।
৪. শায়খ মুহাম্মদ সালেহ আল-কাজ্জাজ।
৫. শায়খ মুহাম্মদ মাহমুদ আস-সাওয়াফ
৬. ড. সাঈদ রমাযান।

গ. রাজা-বাদশা, যুবরাজ ও মন্ত্রী পরিষদ

১. বাদশা ফয়সাল বিন আবদুল আযিয।
২. বাদশা খালেদ বিন আবদুল আযিয।
৩. বাদশা ফাহদ বিন আবদুল আযিয।
৪. যুবরাজ মুসাইদ বিন আবদুর রহমান আলে সওদ।
৫. যুবরাজ হোসাইন বিন তালাল।

কর্মের ময়দানে.. দাওয়াতের ময়দানে

১৯৩৪ সালে দারুল উলুম নদওয়াতুল উলামা'র শিক্ষক হিসাবে কর্মজীবন শুরু করেন তিনি। একাধারে পড়াতে থাকেন তাফসীর, হাদীস, আরবী সাহিত্য, আরবী সাহিত্যের ইতিহাস ও মানতেক। পাশাপাশি আরব বিশ্ব থেকে প্রকাশিত বিভিন্ন আরবী সংবাদপত্রসহ দীনি, দাওয়াতি ও

সাহিত্য-পত্রিকার সাথে গড়ে তুলেন গভীর সম্পর্ক। এভাবেই তাঁর সামনে উন্মোচিত হতে থাকে আরব সাংবাদিকতা ও সাহিত্যের অজানা দিগন্ত। এই সুবাদে তিনি জানতে পারেন সেখানকার শীর্ষসারির উলামায়ে কেরাম ও লেখক-সাংবাদিক-কবি-সাহিত্যিকদেরকে। আরো জানতে পারেন আরব বিশ্বের পরিবেশ-পরিস্থিতিসহ নানামুখী প্রেক্ষাপট।

১৯৩৭ সালে তাফসীর, হাদীস, সাহিত্য ও ইতিহাসের নির্দিষ্ট সীমানা পেরিয়ে তিনি পা রাখেন আরেকটু বিস্তৃত আঙিনায়— তাঁর জানার জগতকে আরো সমৃদ্ধ করতে। এ-লক্ষ্যে একদিকে আরব বিশ্বের প্রখ্যাত উলামায়ে কেরাম, দাঈ ও চিন্তাবিদ এবং অন্যদিকে পাশ্চাত্য শিবিরের খ্যাতনামা লেখক, গবেষক ও রাজনীতিকদের গুরুত্বপূর্ণ রচনা সম্ভার গভীর অভিনিবেশ সহকারে তিনি পড়তে শুরু করেন।

১৯৩৯ সালে শায়খ নদভী'র জীবনে আসে সেরা বসন্ত। সে বসন্তের হাজার গাছে ফুটেছিলো যেনো লক্ষ ফুল! হৃদয়ের একটা ডাক শুনতে পেলেন তিনি। সাড়া দিলেন সাথে সাথে। বেরিয়ে পড়লেন এক ব্যতিক্রমী অনুসন্ধানী অভিযানে। প্রাথমিক লক্ষ্য ছিলো হিন্দুস্তানের দ্বীনি প্রতিষ্ঠানগুলি ঘুরে-ঘুরে দেখা .. পর্যবেক্ষণ করা। কিন্তু এই আপাত লক্ষ্য ছাপিয়ে তাঁর জীবনাকাশে উদিত হলো এক সাথে দুই সূর্য-পুরুষ! এক সূর্য-পুরুষ হলেন আধ্যাত্মিক রাহবার মাওলানা আবদুল কাদের রায়পুরী রহ. আর অপর সূর্য-পুরুষ হলেন আল্লাহ্র পথের মহান দাঈ মাওলানা ইলিয়াস রহ.! এই সফরে তিনি তাঁদের গভীর সান্নিধ্যে ধন্য হলেন। তাঁদের 'সুহবত-পরশে' 'সোনা' হলেন! একজন দিলেন তাঁকে আধ্যাত্মিক জগতের আলোকিত পথের দিশা। আরেকজন তাঁকে নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লেন দীনের দাওয়াতের ময়দানে, তাবলীগের মেহনতের আমলে। গ্রামে-গ্রামে, পল্লীতে-পল্লীতে, গৃহে-গৃহে। এ ভাবেই ফুল ফুটলো— এই বাগানেও, সেই বাগানেও। সৌরভে-সৌরভে আমোদিত হলো শায়খ নদভী'র হৃদয়-জগত!!

১৯৪৩ সালে তিনি প্রতিষ্ঠা করেন ইসলামী শিক্ষা কেন্দ্র। সপ্তাহে একদিন এখানে বসতো তাফসীরে কুরআনের হালকা, আরেকদিন বসতো দরসে হাদীসের হালকা। দরসে হাদীস পেশ করতেন শায়খ নদভী আর দরসে কুরআন পেশ করতেন শায়খ আবদুস সালাম কুদওয়ায়ী নদভী। দীন দার সুশীল শিক্ষিত সমাজ এবং উচ্চপদস্থ কর্মকর্তারা ব্যাপক উৎসাহে এই হালকায় প্রচুর সংখ্যায় শরিক হতেন।

১৯৪৮ সালে তিনি নদওয়াতুল উলামা'র নির্বাহী পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯৫১ সালে নদওয়াতুল উলামা'র তৎকালীন শিক্ষাসচিব আল্লামা সায়্যিদ সোলায়মান নদভী রহ. এর প্রস্তাবে তাঁকে সহকারি শিক্ষাসচিব নির্বাচন করা হয়। আর ১৯৫৪ সালে আল্লামা সায়্যিদ সোলায়মান নদভী রহ. এর ইন্তেকালের পর তিনি শিক্ষাসচিবের দায়িত্ব পালন করেন। তারপর ১৯৬১ সালে তাঁর বড় ভাই ডা. সায়্যিদ আবদুল আলী আল-হাসানী'র ওফাতের পর তাঁকেই গ্রহণ করতে হয় নদওয়াতুল উলামা'র শীর্ষ (রেক্টর) পদটি।

১৯৫১ সালে তিনি এক ব্যতিক্রমী ও মহান উদ্যোগ হাতে নেন। হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গা-কবলিত ভারতে হিন্দু-মুসলিমের গালাগালি ও হানাহানির সম্পর্ককে 'গলাগলি' ও কাছে-টানাটানির সম্পর্কে রূপদানের লক্ষ্যে এক ঐতিহাসিক পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। প্রতিষ্ঠা করেন: 'পয়ামে ইনসানিয়াত'—মানবতার বার্তা। এর লক্ষ্যটা যেমন সুন্দর নামটাও তেমনি দয়া, মায়া ও মানবীয় আবেগ-উদ্দীপক।

১৯৫৯ সালে তিনি প্রতিষ্ঠা করেন 'ইসলামী গবেষণা একাডেমি'—لمجمع الإسلامي العلمي।

১৯৬০ সালে 'উত্তর প্রদেশ দ্বীনি শিক্ষা কাউন্সিল' প্রতিষ্ঠায়, ১৯৬৪ সালে 'নিখিল ভারত ইসলামী পরামর্শ পরিষদ' প্রতিষ্ঠায় এবং ১৯৭২ সালে 'নিখিল ভারত মুসলিম পার্সোনাল ল' বোর্ড' প্রতিষ্ঠায় তিনি সক্রিয়ভাবে অংশ গ্রহণ করেন।

১৯৩২ সালে নদওয়াতুল উলামা থেকে প্রকাশিত 'আল-জিয়া' (الضياء) আরবী পত্রিকার সম্পাদনা পরিষদের সদস্য হন। ১৯৪০ 'আন্ নাদওয়া' নামে একটি উর্দূ পত্রিকার সম্পাদনার সাথে যুক্ত হন। ১৯৪৮ সালে উর্দূ 'তামীর' পত্রিকার সম্পাদনার সাথে যুক্ত হন। দামেস্ক থেকে প্রকাশিত 'আল-মুসলিমুন' (المسلمون) পত্রিকার সম্পাদকীয় লেখার দায়িত্ব পালন করেন ১৯৫৮ থেকে ১৯৫৯ সাল পর্যন্ত। এই সম্পাদকীয় কলামগুলি পরবর্তীতে "ردة ولا أبا بكر لها" নামে পুস্তিকাকারে প্রকাশিত হয়। অনুরূপভাবে প্রসিদ্ধ ম্যাগাজিন 'আল-ফাতহ' (الفتح)-তেও তাঁর বিভিন্ন লেখা প্রকাশিত হয়। এটি সম্পাদনা করতেন অধ্যাপক মুহিব্বুদ্দীন আল-খতিব।

১৯৬২ সালে উর্দূ 'নেদায়ে মিল্লাত' এর পৃষ্ঠপোষকতা করেন। ১৯৫৫ সালে নদওয়া থেকে প্রকাশিত প্রসিদ্ধ আরবী পত্রিকা 'আল-বা'স আল-ইসলামী' (البعث الإسلامي) এরও পৃষ্ঠপোষকতা করেন। অনুরূপভাবে পৃষ্ঠপোষকতা করেছেন নদওয়া থেকে প্রকাশিত উর্দূ মুখপত্র 'তা'মীরে হায়াত' এবং আরবী পাক্ষিক 'আর-রাইদ' (الرائد) পত্রিকাদ্বয়েরও। 'তা'মীরে হায়াত' এর যাত্রা শুরু হয় ১৯৬৩ সাল থেকে আর 'আর-রাইদ' (الرائد)- এর যাত্রা শুরু হয় ১৯৫৯ সাল থেকে।

শুরু হলো দেশে দেশে সফর

শায়খ নদভী'র সফর ও দেশভ্রমণ শুরু হয়ে গিয়েছিলো একেবারে যৌবনের সূচনাকালেই। ১৯২৯ সালে শায়খ লাহোর সফর করেন। এটিই ছিলো কোনো দূর দেশে তাঁর প্রথম সফর। এই সফরের প্রাপ্তি ছিলো অনেক। তিনি পরিচিত হয়েছেন অনেক উলামায়ে কেরামের সাথে। সর্বোপরি এই সফরে তিনি সাক্ষাত করতে পেরেছিলেন 'ইসলামের কবি' আল্লামা মুহাম্মদ ইকবালের সাথে। তিনি কবির কাছে শূন্য হাতে যান নি। তাঁর জন্যে নিয়ে গিয়েছিলেন অন্য রকম এক উপহার। অর্থাৎ কবির قصيدة القمر (কাসিদাতুল কামার বা চাঁদ-কবিতা) এর গদ্যানুবাদ। টগবগে এক তরুণ আলেমের কাছ থেকে এ-উপহার পেয়ে কবি বড়ো খুশি হয়েছিলেন।

১৯৩৫ সালে তিনি বোম্বাই সফর করেন ড. উম্বেদকারের কাছে ইসলামের দাওয়াত নিয়ে। ড. উম্বেদকার ছিলেন নিম্ন বর্ণের (Depresse Classes) এক সম্প্রদায়ের নেতা।

১৯৩৯ সালে তিনি হিন্দুস্তানের দ্বীনি প্রতিষ্ঠানগুলি ঘুরে ঘুরে দেখার জন্যে .. পর্যবেক্ষণ করার জন্যে এক অনুসন্ধানী সফরে বের হন।

১৯৪৭ সালে তিনি হজ্জব্রত পালনের উদ্দেশ্যে সৌদি আরব সফর করেন। এ-সফরে তিনি মক্কা-মদীনায় দীর্ঘ ছয় মাস অবস্থান করেন। এই সুযোগে মক্কা-মদীনার যে সকল শীর্ষস্থানীয় উলামায়ে কেরামের সাথে সাক্ষাত করেন এবং পরিচিত হন তাঁরা হলেন— শায়খ আবদুর রাযযাক হামযা, উমর ইবনে হাসান আলে শায়খ, সায়্যিদ আলাভী আল-মালেকী, আমিন আল-কাতবী, হাসান আল-মাশ্শাত, মুহাম্মদ আল-আরাবী আত্ তিবানী ও মাহমুদ শাভিল। শায়খের পুস্তিকা— إلى ممثلي البلاد الإسلامية

(মুসলিম জাহানের প্রতিনিধিদের সমীপে) ততোদিনে প্রকাশিত হয়ে হিজায-ভূমিতেও ছড়িয়ে পড়েছিলো এবং সেখানকার উলামায়ে কেরামের কাছে তাঁর পরিচয়টাও চমৎকারভাবে জানিয়ে দিয়েছিলো। একদিন শায়খ মুহাম্মদ আল-হারাকান মসজিদে নববীতে বসে তাঁর ছাত্রদেরকে এই পুস্তিকাটি পড়ে পড়ে শোনান। ততোদিনে ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين (মুসলমানদের অধঃপতনে বিশ্ব কী হারালো) এর পাণ্ডুলিপি তৈরী হয়ে গিয়েছিলো। মসজিদে হারামের সম্মানিত ইমাম এই পাণ্ডুলিপির কথা জানতে পেরে আনন্দ-বিমুগ্ধচিত্তে শায়খ নদভীকে তা দ্রুত প্রকাশের উৎসাহ প্রদান করেন।

শায়খ নদভী'র দ্বিতীয় হজ্ব-সফর হয়েছিলো ১৯৫১ সালে। তখন সেখানকার যে সকল লেখক-সাহিত্যিকদের সাথে তাঁর গভীর পরিচয় ঘটে তাঁদের মধ্যে অন্যতম হলেন— শায়খ মুহাম্মদ সুরুর আস্ সাব্বান। তাঁদের সাথে শায়খের একাধিকবার বৈঠক হয় এবং দীর্ঘ মতবিনিময় হয়। এই সব বৈঠকের মধ্যে সবচে' উল্লেখযোগ্য বৈঠকটি হয়েছিলো মক্কা মোকাররমা'র বুখারী উদ্যানে। সেখানে উপস্থিত হয়েছিলেন সাঈদ আল-আমুদি, আবদুল কুদ্দুস আল-আনসারী, আলী হাসান ফিদ'আক, মুহসিন আহমদ বারুম ও হোসাইন আরবের মতো শীর্ষস্থানীয় কবি-সাহিত্যিক, লেখক-সাংবাদিক ও উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মকর্তারা। শায়খ নদভী'র ভাষ্য অনুযায়ী এ-বৈঠকটি ছিলো কোনো ছাত্রকে পরখ করে দেখে নেয়ার এক শক্ত 'ইন্টারভিউ'-এর মতো। উপস্থিত সবাই তাঁকে প্রশ্ন করে যাচ্ছিলেন একের পর এক। যাচাই করে যেনো দেখে নিচ্ছিলেন আরবী ভাষা ও সাহিত্যে তাঁর যোগ্যতা কতোটুকু, তাঁর ইলমী যোগ্যতা ও সাধারণ জ্ঞানের পরিধিই বা কতোটুকু বিস্তৃত কিংবা ইংরেজি ভাষায় তাঁর জানাশোনা কী পরিমাণ। কখনো তিনি আরবী সাহিত্য ও তার বর্তমান দিকপাল ও খ্যাতিমান সাহিত্যিকদের সম্পর্কে ঝাঁকে ঝাঁকে প্রশ্নের মুখোমুখি হচ্ছিলেন কখনো আবার এ-প্রশ্নধারা গতিপথ পরিবর্তন করে ছুটে যাচ্ছিলো সমাজতন্ত্র ও ইংরেজি সাহিত্যের কিংবা পাশ্চাত্য সভ্যতা-সংস্কৃতির খর-প্রবাহের দিকে। শায়খ নদভী এ অভাবিত 'ইন্টাভিউ'তে সম্মানের সাথেই উতরে গেলেন। সবাইকে তৃপ্ত করলেন, মুগ্ধ করলেন। সাথে সাথে এলো যেনো 'প্রমোশন-সুসংবাদ'! কিংবা আরো বড় 'ইন্টারভিউ' এর ঘোষণা!! তাঁকে আমন্ত্রণ জানানো হলো 'জেদ্দা রেডিও'তে ধারাবাহিক আলোচনা উপস্থাপনের জন্যে!

অকল্পনীয় প্রস্তাব! শায়খ 'হ্যাঁ' বললেন। শত স্বতঃস্ফূর্ততায় সাড়া দিলেন। শুরু হয়ে গেলো بين العالم وجزيرة العرب (বিশ্ব ও আরব ব-দ্বীপ) শিরোনামে তাঁর সাড়া জাগানো কথিকামালা। কণ্ঠে নেই তাঁর কোনো জড়তা। নেই আজামিয়্যাতের (অনারবত্বের) আড়ষ্টতা। ইথার তরঙ্গের পথ-বেয়ে তাঁর আবেগমাখা বেদনা-জড়িত কথিকা-তরঙ্গ— আছড়ে পড়তে লাগলো আরব-শ্রোতা-হৃদয়ের তটে-তটে!!

এ-সফর ছাড়াও আরো অনেকবার তিনি হিজায সফর করেন।

১৯৫১ সালে তিনি প্রথম মিসর সফর করেন। অবশ্য এই সফরের আগেই তাঁর কালজয়ী গ্রন্থ ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين (মুসলমানদের অধঃপতনে বিশ্ব কী হারালো) এই মিসর থেকেই প্রকাশিত হয়ে ইলমী, দীনি, দাওয়াতি ও সাহিত্য মহলে বিপুলভাবে সমাদৃত হয়। তাঁর আগমনের আগেই এ-গ্রন্থ বিশ্বস্ত দূতের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে সবার কাছে তাঁর সঠিক পরিচয়টা তুলে ধরেছিলো। মিসরে তিনি প্রায় ছয় মাস অবস্থান করেন। এ সময়কালটা ছিলো ক্রমবর্ধমান বৈচিত্রময় প্রোগ্রামে ঠাসা। বিভিন্ন সেমিনারে অংশ নিয়ে দিয়েছেন— একের পর এক বক্তৃতা। বিভিন্ন সংস্থা ও প্রতিষ্ঠানের আমন্ত্রণে উপস্থিত হয়ে— পেশ করেছেন দিক্-দর্শনমূলক আলোচনা। তাঁর ভাষণ-বিবৃতি ও বক্তৃতা-আলোচনার প্রধান শ্রোতা হিসাবে একান্ত কাছে পেয়েছিলেন তিনি মিসরের যুব-সম্প্রদায়কে এবং নবীন-প্রবীন শ্রেণীকে। সবার কাছে তিনি মনের কথা তুলে ধরে দৃষ্টি আকর্ষণমূলক দরদপূর্ণ বক্তব্য রাখেন।

পাশাপাশি তিনি সেখানকার শীর্ষস্থানীয় উলামায়ে কেরাম ও আল-আযহার বিশ্ববিদ্যালয়ের উলামা-মাশায়েখের সাথেও সাক্ষাত করেন এবং মতবিনিময় করেন। যেমনঃ শায়খুল আযহার আবদুল মজিদ সালিম, মাহমুদ শালতূত, আহমদ মুহাম্মদ শাকের, হাসনাইন মুহাম্মদ মাখলুফ, হামেদ আল-ফাকী, মুহাম্মদ আবদুল লতিফ দাররাজ, মুহাম্মদ ফুয়াদ আবদুল বাকী, উসমানিয়া সালতানাতের সাবেক শায়খুল ইসলাম মোস্তফা সাবরী, মুহাম্মদ আশ শিরবিনী, মুহাম্মদ ইউসূফ মূসা ও শায়খ হাসানুল বান্না'র পিতা শায়খ আবদুর রহমান বান্না।

যে সকল নেতৃস্থানীয় ও উচ্চপদস্থ ব্যক্তিবর্গের সাথে তাঁর সাক্ষাত হয় তাঁরা হলেন— মুফতীয়ে আজম আমিন আল-হোসাইনী, আমির আবদুল করিম আল-খাত্তাবী ও মেজর জেনারেল সালেহ হরব পাশা।

যে সকল দাঈ, ইসলামী চিন্তাবিদ ও স্কলারদের সাথে তাঁর সাক্ষাত হয় তাঁরা হলেন— শহীদ সায়্যিদ কুতব, মুহিব্বুদ্দীন আল-খতিব, আহমদ আশ শিরবাসী, মুহাম্মদ আল-গাযালী, সাঈদ রামাদান, সালেহ আল-ইসমাভী ও আল-বাহী আল-খাওলী। আর যে সকল বিশিষ্ট লেখক-সাহিত্যিকদের সাথে তাঁর দেখা হয় তাঁরা হলেন— ড. আহমদ আমিন, মাহমুদ মুহাম্মদ শাকের, আব্বাস মাহমুদ আক্কাদ ও আহমদ হাসান আয যাইয়্যাত।

শায়খ নদভী'র বক্তব্যের বিষয়বস্তু ও তার স্থান ছিলো এইঃ

এক. 'মুসলিম যুবসংস্থা' (دار الشبان المسلمين) এর উদ্যোগে আয়োজিত অনুষ্ঠানে তিনি বক্তব্য দেন— 'المسلمون على مفرق الطرق' (সঙ্কটের ঘূর্ণাবর্তে মুসলামানরা)—এ বিষয়ের উপর।

দুই. 'মুসলিম যুবসংঘ' (جمعيات الشباب المسلمين) এর সভাপতি শায়খ নদভীকে দেয়া এক সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন। সে অনুষ্ঠানে শায়খ আলোচনা করেন– الدعوة الإسلامية وتطوراتها في الهند (ইসলামী দাওয়াত এবং হিন্দুস্তানে তার ক্রমবিকাশ) এর উপর।

তিন. 'দারুল উলুম' কলেজে শায়খ নদভী বক্তব্য দিয়েছেন— 'ইকবালের কবিতা ও তার পয়গাম' (شعر إقبال ورسالته) এ-বিষয়ের উপর।

চার. 'প্রথম ফুয়াদ বিশ্ববিদ্যালয়ে' (جامعة فؤاد الأول) তিনি বক্তব্য দিয়েছেন 'ড. ইকবালের চোখে ইনসানে কামেল' (الانسان الكامل في نظر الدكتور محمد إقبال) এ বিষয়ের উপর।

এ ছাড়া আরো উল্লেখযোগ্য যে সব সংস্থা ও সংগঠনের আমন্ত্রণ গ্রহণ করে তিনি বিভিন্ন বিষয়ে বক্তব্য দিয়েছেন সে গুলি হলো :

১. 'شباب محمد' (মুহাম্মদী যুবসংঘ),

২. 'جمعية أنصار السنة المحمدية' (সুন্নতে মুহাম্মদী বাস্তবায়ন সংস্থা),

৩. 'الجمعية الشرعية' (শরীয়া পরিষদ),

৪. 'جمعية العشيرة المحمدية' (মুহাম্মদী স্বজন সংঘ),

৫. 'جمعية مكارم الأخلاق' (সুকুমারবৃত্তি সংস্থা) ও

৬. 'الرابطة الإسلامية' (ইসলামী সংঘ)।

ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين কিতাবকে কেন্দ্র করে শহীদ সায়্যিদ কুতব তাঁর বাসভবনে চমৎকার এক আলোচনা বৈঠকেরও আয়োজন করেছিলেন। সেখানে বিশেষ অতিথি হিসাবে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিলো গ্রন্থের লেখককেও। (এ বৈঠক সম্পর্কে পাঠক আরো জানতে পারবেন একটু পরের দিকে।) এই সফরেই সূচনা হয় 'اسمعيات' (শোনো হে!) সিরিজের। প্রিয় মিসরকে নিবেদন করে শায়খ নদভী লিখেন— اسمعي يا مصر! (শোনো হে মিসর!) পুস্তিকাটি। এ-পুস্তিকাটি পড়ে শহীদ সায়্যিদ কুতব মুগ্ধতা-মেশানো বেদনা নিয়ে বলেছিলেন— 'قرأتُ (اسمعي يا مصر!) ويا ليت مصرُ قد سمعت!' ('শোনো হে মিসর!' আমি পড়েছি; হায়! মিসর যদি শুনতো!')।

ইখওয়ানুল মুসলিমীন-এর সদস্যরা মিসরের বিভিন্ন স্থানে শায়খের দাওয়াতি প্রোগ্রামের এক মহতি উদ্যোগ গ্রহণ করে। তখন শায়খ নদভী বিভিন্ন পল্লীগ্রাম ছাড়াও ক্রমান্বয়ে সফর করেন এ-সব শহর :

১. 'আল-কানাতির আল-খায়রিয়্যাহ' (القناطر الخيرية),
২. 'তানতা' (طنطا),
৩. 'বানহা' (بنها),
৪. 'হামূল' (حامول),
৫. 'হালওয়ান' (حلوان),
৬. 'সান্ত্রিস' (سنتريس),
৭. 'আল-মাহাল্লা আল-কুবরা' (المحلة الكبري),
৮. 'নাকলা' (نكله),
৯. 'আল-আযিযিয়া' (العزيزية),
১০. 'কোয়েসনা' (قويسنا) ও
১১. 'বানারূহ' (بنروه)।

শায়খ নদভী'র সফরসঙ্গী ছিলেন ইখওয়ানুল মুসলিমীন-এর মুখপাত্র— শায়খ মুহাম্মদ আল-গাযালী।

এ-দাওয়াতি প্রোগ্রাম ছাড়াও শায়খ আল-আযহারের বিভিন্ন ছাত্রাবাসে, হোটেলে এবং বিভিন্ন বাসায় বক্তৃতা পেশ করেছেন। 'আল-মাহাল্লা আল-কুবরা' ও 'বানারূহ' সফরের সময় শায়খ নদভী এ-বইয়ের লেখকের বাসায়ও পদার্পণ করে তাঁকে ধন্য করেছিলেন।

মধ্যপ্রাচ্যের এই সফরেই শায়খ সুদান, সিরিয়া, ফিলিস্তিন ও জর্দান সফর করেন। সুদানে গিয়ে তিনি যে সকল বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ ও উচ্চপদস্থ নেতৃবৃন্দের সাথে সাক্ষাত করেন তাঁরা হলেন— সায়্যিদ আলী মীর গনি পাশা, অধ্যাপক ইসমাঈল বেগ আল-আযহারী, যিনি পরবর্তীতে সুদানের প্রধানমন্ত্রী হয়েছিলেন, 'ইসলাম প্রচার সমিতি'র সদস্যসচিব শওকি আসাদ, জামে মসজিদের ইমাম মুহাম্মদ আউদ এবং শ্রমিক নেতা ও 'মুসলিম যুবসংঘ'-এর সভাপতি মুহাম্মদ মূসা সোলায়মান।

সিরিয়া অবস্থান করেন তিনি ৪৮ দিন। রাজধানী দামেস্কে ২৪ দিন আর হিমস, হুমাত, মাআররাতুন নু'মান, হালব এবং হারেম মিলিয়ে বাকি ২৪ দিন। এ-সুযোগে তিনি পরিদর্শন করেন বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান এবং সাহিত্য প্রতিষ্ঠান। বৈঠক হয় এ-সব প্রতিষ্ঠানের কর্ণধারদের সাথে, হয় গভীর মতবিনিময়। এর মধ্যে রয়েছে 'ইখওয়ানুল মুসলিমীন জামে দিকাক কেন্দ্র', 'দামেস্ক আরবী গবেষণা একাডেমি', 'জহিরিয়া গ্রন্থাগার', 'দারুল হাদীস মাদরাসা' এবং 'ইসলামী তামাদ্দুন সংস্থা'। একদিন সিরিয়া পার্লামেন্টের একটি গুরুত্বপূর্ণ ও প্রাণবন্ত অধিবেশনও তিনি উপভোগ করেন।

দামেস্ক মিলনায়তনে তিনি شهادة العمل والتاريخ في قضية فلسطين (ফিলিস্তিন ট্র্যাজেডি'র মূল কারণসমূহ) এ- বিষয়ে এক গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য উপস্থাপন করেন। এ ছাড়া অন্যান্য যে সব প্রতিষ্ঠানে তাঁকে যেতে হয়েছে, সেখানেই তিনি গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য দিয়েছেন। 'ইসলামী তামাদ্দুন সংস্থা' আয়োজিত অনুষ্ঠানে তিনি বক্তব্য দিয়েছেন। 'আল-জামইয়্যাতুল গাররা'য় তিনি বক্তব্য দিয়েছেন। হিমস ও হুমাত নগরীতে অবস্থিত ইখওয়ানুল মুসলিমীন-এর মারকাজে তিনি বক্তব্য দিয়েছেন। হালব নগরীর বিশাল এক গণজমায়েতেও তিনি বক্তব্য দিয়েছেন।

সিরিয়াতে যে সকল শীর্ষ সারির উলামায়ে কেরাম ও সাহিত্যিকদের সাথে মিলিত হয়ে মতবিনিময় করেছেন তাঁরা হলেন— আবদুল ওয়াহহাব আস সালাহী, মক্কী কিতানী, আহমদ দাকার, মুহাম্মদ বাহজা আল-বিতার, আবুল খায়র আল-মায়দানী, মোস্তফা আস সিবাঈ, মুহাম্মদ আল-মোবারক, মোস্তফা আয যারকা, মুহাম্মদ আহমদ দাহমান, আবুল ইয়ূস্‌র আবেদীন (আল্লামা শামী'র নাতি), প্রজাতন্ত্রের মুফতী, আহমদ কাফতারু, মুহাম্মদ

সাঈদ আল-বোরহানী, মুহাম্মদ আলী হাওমানী, তাইসির যাবইয়ান, মুহাম্মদ কামাল খতিব, মুহাম্মদ কারদ আলী, মুহাম্মদ ইজ্জত দারূজা, খলিল মারদুম বেগ এবং আবদুল কাদের আল-মাগরিবী। শায়খ নদভীকে তাঁদের সাথে সাক্ষাতের ব্যাপারে সহযোগিতা করেছেন 'দামেস্ক শিক্ষক প্রশিক্ষণ কলেজ' এর অধ্যাপক আবদুর রহমান আলবানী।

এরপর শায়খ সফর করেন ফিলিস্তিন। চোখভরে দেখেন জেরুজালেম নগরী। চক্ষু শীতল করেন মসজিদুল আকসা দেখে-দেখে আর হৃদয় প্রশান্ত করেন অতীত ইতিহাসের বর্ণিল দিনগুলোর কথা ভেবে-ভেবে। রমজানের শেষ দশদিন এখানেই ই'তেকাফ করেন এবং ঈদের নামাজ আদায় করেন। আল-খলিল ও বেথেলহাম (بيت اللحم) নগরীও ঘুরে ঘুরে দেখেন তিনি।

অবশেষে আসেন জর্দান। দেখা করেন বাদশা 'প্রথম' আবদুল্লাহর সাথে। তাঁর এ-দীর্ঘ সফরের কথা বিস্তৃত পরিসরে তিনি আলোচনা করেছেন তাঁর অমর সফরনামা— مذكرات سائح في الشرق العربي (মধ্যপ্রাচ্য ঘুরে-আসা এক পরিব্রাজকের ডায়রী)তে।

দ্বিতীয়বার সিরিয়া সফর করেন তিনি ১৯৫৬ সালে— দামেস্ক বিশ্ববিদ্যালয়ের শরীয়া অনুষদের অতিথি অধ্যাপক হিসাবে। এ সফরে তিনি দীর্ঘ তিন মাস অবস্থান করেন। তখন স্বর্নগর্ভা .. রত্নগর্ভা সিরিয়ার উলামা-মাশায়েখ, ইসলামী চিন্তাবিদ, লেখক ও কবি-সাহিত্যিকসহ বিভিন্ন সংস্থা ও সংগঠনের নেতৃবৃন্দের সাথে তাঁর গভীর মতবিনিময় হয়। তিনি হয়ে উঠেন তাঁদের একান্ত আপনজন। এ দিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিস্ময়-বিমুগ্ধ ছাত্রদের সামনে التجديد والمجددون في الفكر الإسلامي (ইসলামী চিন্তা-দর্শনে সংস্কার ও সংস্কারক) আলোচ্য বিষয়ের উপর উপস্থাপিত হতে থাকে তাঁর বক্তৃতামালা। ডাক পড়ে তাঁর— সিরিয়া রেডিও ষ্টেশন থেকেও। সেই 'ইথার জগতে' তরঙ্গায়িত হয় শিল্প সুষমায় উদ্ভাসিত তাঁর এই কথিকামালা— !اسمعي يا سورية (শোনো হে সিরিয়া!)।

তাঁকে যেতে হয় আরো অনেক জায়গায়। حاجتنا إلى إيمان جديد (প্রয়োজন— নতুন করে আমাদের ঈমানদীপ্ত হওয়া) এ-বিষয়ে তিনি বক্তব্য দেন হালব নগরীতে অবস্থিত ইখওয়ানুল মুসলিমীন এর মারকাজে। দামেস্ক ইসলামী সম্মেলনে তিনি আলোচনা করেন ফিলিস্তিন প্রসঙ্গে। শিরোনাম ছিলো— ارتباط قضية فلسطين بالوعي الإسلامي (ইসলামী চেতনার সাথে

জড়িয়ে আছে ফিলিস্তিনের বিষয়টি)। তা ছাড়া বিশ্ববিদ্যালয়ের শরীয়া অনুষদের শিক্ষকদের সামনেও তিনি গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য দেন।

১৯৬৪ সালে তিনি তৃতীয়বার সিরিয়া সফর করেন এবং ১৯৭৩ সালে চতুর্থবার। এ-সময় তিনি লেবাননও সফর করেন। তখন পরিদর্শন করেন বৈরুত, কালমুন ও ত্রিপলি। তখন তাঁর সাক্ষাত হয় উলামায়ে কেরাম ও ইসলামী আন্দোলনের নেতৃবৃন্দের সাথে। তাঁরা হলেন— 'ইবাদুর রহমান ফাউণ্ডেশন'-এর প্রতিষ্ঠাতা মুহাম্মদ উমর দাউক, প্রজাতন্ত্রের মুফতি মুহাম্মদ আলায়া, ইসলামী আদালতের প্রধান বিচারপতি শফিক ইয়ামুত, 'মক্কার পথ' গ্রন্থের লেখক মুহাম্মদ আসাদ, মোস্তফা আল-খালেদী এবং প্রখ্যাত আলজেরীয় মুজাহিদ আল-ফোযাইল আল-ওয়ারাতলানী। ইবাদুর রহমান ফাউণ্ডেশন অফিসও তিনি পরিদর্শন করেন। বাদশাহ্ সউদ কলেজে (এটি বৈরুতের একটি প্রসিদ্ধ ইসলামিক সেন্টার ও বিশাল মিলনায়তন) বক্তব্য উপস্থাপন করেন। শিরোনাম ছিলো— الشعوب لا تعيش على أساس المدنيات بل تعيش بالرسالة وتعضها روحها وخصائصها (উম্মতের জীবনের লক্ষ্য আধুনিক নগর-জীবন নয়— বরং ঐশী পয়গাম, যাকে শক্তিশালী করে তার রূহ এবং তার বৈশিষ্ট্য)। ত্রিপলিতে তিনি পরিদর্শন করেন ইসলামী কলেজ, মারকাজুল মাওলাভিয়্যাহ, মাদরাসাতুল গাযালী ও মাদরাসা ইবনে খালদুনসহ আরো অন্যান্য দীনি প্রতিষ্ঠান।

১৯৫৬ সালে তিনি তূর্কী সফর করেন। সেখানে অবস্থান করেন দু'সপ্তাহ। পরবর্তীতে তার সফরনামায় তা যুক্ত হয়েছে— أسبوعان في تركيه الحبيبة (প্রিয় তূর্কীতে দু' সপ্তাহ) এই শিরোনামে। পরে তিনি আরো চারবার তূর্কী সফর করেন ইসলামী সাহিত্য সংস্থা'র সেমিনার উপলক্ষে। একবার ১৯৬৪ সালে, আরেকবার ১৯৮৬ সালে, আরেকবার ১৯৯৩ সালে এবং আরেকবার ১৯৯৬ সালে। ১৯৯৬ সালে অনুষ্ঠিত সেমিনারে শায়খ নদভীকে বিপুলভাবে সংবর্ধনা দেয়া হয়— সংস্থার অসংখ্য কবি-সাহিত্যিক ও শীর্ষ ব্যক্তিবর্গের পক্ষ থেকে।

১৯৬২ সালে তিনি কুয়েত সফর করেন। আবেগাপ্লুত উপস্থাপনায় সেখানে দিয়েছেন মন-ছুঁয়ে যাওয়া এক ভাষণ—এই শিরোনামে : اسمعي يا زهرة الصحراء! (শোনো হে মরু-পুষ্প!)। পরবর্তীতে আরো বেশ ক'বার তিনি কুয়েত সফর করেন। ১৯৬৮ সালে একবার। ১৯৮৩ সালে একবার। ১৯৮৭ সালে আরেকবার। সংযুক্ত আরব আমিরাত সফর করেন তিনি

১৯৭৪ সালে। শারজা'র গভর্নর আমির শায়খ সুলতান বিন মুহাম্মদ আল-কাসেমী'র আমন্ত্রণে। পরবর্তীতে এ-দেশটিও তিনি আরো বেশ ক'বার সফর করেন। ১৯৭৬ সালে একবার। ১৯৮৩ সালে আরেকবার। ১৯৮৮ সালে আরেকবার এবং ১৯৯৩ সালে শেষবার।

শায়খ নদভী কাতারও সফর করেছেন কয়েকবার। প্রতিবারই আমি তাঁর সান্নিধ্য লাভ করেছি। প্রথমবার এসেছিলেন তিনি ১৯৬২ সালে। কিন্তু এটি কোনো পূর্ণাঙ্গ সফর ছিলো না। ছিলো স্বল্প সময়ের যাত্রা বিরতি। আমি অন্যত্র তা আলোচনা করেছি।

দ্বিতীয়বার তিনি কাতার আসেন সত্তর দশকের মাঝামাঝিতে। তখন কাতার বিশ্ববিদ্যালয়ে যে বক্তব্য পেশ করেছিলেন তার শিরোনাম ছিলো— دور الجامعة في تكوين الأجيال (প্রজন্ম গঠনে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূমিকা)। তৃতীয়বার তিনি কাতার এসেছিলেন 'সুন্নাহ ও সীরাত সম্মেলন'-এ আমন্ত্রিত হয়ে। সময়টা ছিলো ১৪০১ হিজরী.. মোতাবেক ১৯৮০ সাল। চতুর্থবার তিনি কাতার আগমন করেন ধর্ম মন্ত্রণালয়ের আমন্ত্রণে। তখন قيمة الأمة الإسلامية ورسالتها (মুসলিম উম্মাহর গুরুত্ব এবং তাদের পয়গাম) এ বিষয়ে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভাষণ দান করেন। সে বার তাঁর ভাষণ সম্পর্কে আলোকপাত করার সৌভাগ্য হয়েছিলো আমার। পরবর্তীতে মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে ভাষণটি প্রকাশ করা হয়। তাঁর এ-বক্তব্যসহ মধ্যপ্রাচ্যে প্রদত্ত সমস্ত বক্তব্যই— أحاديث صريحة مع إخواننا العرب المسلمين (আমার মুসলিম আরব ভাইদেরকে স্পষ্ট ভাষায় বলতে চাই) নামে পরবর্তীতে প্রকাশিত হয়।

১৯৭৩ সালে তিনি রাবেতায়ে আলমে ইসলামী'র এক প্রতিনিধি দল নিয়ে সফর করেন— আফগানিস্তান, ইরান, লেবানন, ইরাক (ইরাকের প্রথম সফর ছিলো ১৯৫৬ সালে), সিরিয়া ও জর্দান। সব দেশেই তিনি গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য প্রদান করেছেন এবং দিক-নির্দেশনা দিয়েছেন। তাঁর এই সফরের কথা বড়ো স্পষ্ট ভাষায় এবং খুলে খুলে বর্ণনা করেছেন তাঁর এই সফরনামায়: من نهر كابل إلي إلي نهر اليرموك (কাবুল নদ থেকে ইয়ারমুক নদ পর্যন্ত)।

রাজ পরিবার ফাউণ্ডেশন-এর আমন্ত্রণে তিনি ১৯৮৪ সালে জর্দান সফর করেন। তখন ইয়ারমুক বিশ্ববিদ্যালয় ও আরবী বিজ্ঞান কলেজে

গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য প্রদান করেন। এই সফরে তিনি ইয়েমেনও গমন করেন। সান'আ বিশ্ববিদ্যালয়, বিমান বাহিনী কলেজ, নৌবাহিনীর কেন্দ্রস্থলে এবং বিভিন্ন মসজিদে গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য প্রদান করেন। বিস্তারিত বিবরণ রয়েছে نفحات الإيمان بين صنعاء وعمان (সান'আ ও আম্মানে ঈমানের হাওয়া) নামে প্রকাশিত সফরনামায়।

'ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় ফেডারেশন' এর আমন্ত্রণে ১৯৭৬ সালে তিনি মরক্কো সফর করেন। এই সফরের কথা বলেছেন তিনি أسبوعان في المغـــرب الأقصى (মরক্কো'য় দু' সপ্তাহ) সফরনামায়।

'ইসালামী চিন্তা সম্মেলন' এর আমন্ত্রণে তিনি আলজেরিয়া সফর করেন দু'বার। ১৯৮২ সালে একবার আর ১৯৮৬ সালে আরেকবার।

১৯৬০ সালে তিনি বার্মা (মিয়ানমার) সফর করেন। ১৯৬৪ সালে পাকিস্তান সফর করেন। পাকিস্তানে পরবর্তীতে তিনি আরো বেশ ক'বার সফর করেন। একবার ১৯৭৮ সালে এশিয়ায় আন্তর্জাতিক ইসলামী সাহিত্য সংস্থা'র প্রথম সেমিনারে যোগ দিতে, একবার ১৯৮০ সালে, আরেকবার ১৯৮৬ সালে। পাকিস্তানে যে সব বক্তব্য পেশ করেছেন তা أحاديث باكستان নামে উর্দূতে প্রকাশিত হয়েছে।

১৯৭৮ সালে তিনি শ্রীলঙ্কা সফর করেন। ১৯৮৪ সালে বাংলাদেশ সফর করেন। তাঁর বাংলাদেশ সফরের অতি গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্যগুলি উর্দূ ভাষায় প্রকাশিত تحفة مشرق (প্রাচ্যের উপহার) সফরনামায় বিবৃত হয়েছে।

ইউরোপে তাঁর প্রথম সফর ছিলো ১৯৬৩ সালে। তখন পরিদর্শন করেন— জেনেভা, লন্ডন, লোজান (Lausanne), বার্ন, প্যারিস, কেমব্রিজ, অক্সফোর্ড, গ্লাসগো ও এডিনবরা। এ সময়েই তাঁর দেখা হয় পাশ্চাত্যের কতিপয় প্রাচ্যবিদ পণ্ডিতের সাথে।

লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে পেশ করেন ঐতিহাসিক এক বক্তব্য। শিরোনাম ছিলো: بـــين الشـــرق والغـــرب (প্রতীচ্য ও প্রাচ্যের মাঝে)। এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয়েও পেশ করেন গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য। বি.বি.সি.কে দেন দু'টি গুরুত্বপূর্ণ সাক্ষাতকার। একটির শিরোনাম: 'এক লণ্ডন পরিদর্শকের অনুভূতি'। আরেকটি ছিলো 'আরবী ভাষার ক্রমোন্নতি ও মুসলিম দুনিয়ার সাথে তার সম্পর্ক' বিষয়ে। এ ছাড়া মুসলমানদের বিভিন্ন সমাবেশেও বক্তব্য প্রদান করেন।

ইউরোপ সফরের সবচে' গুরুত্বপূর্ণ অংশ ছিলো আন্দালুস (বর্তমান স্পেন) সফর। শত শত বছরের মুসলিম সভ্যতার বেদনাঘেরা স্মৃতি জ্বলজ্বল করে উঠেছিলো তখন শায়খ নদভী'র হৃদয়-মনে। কোথায় হারিয়ে গেলো সোনালী সেই দিনগুলো? সেই আলো-ছড়ানো সভ্যতা? আটশ' বছরের গর্বিত সম্পদ? কেনো হারিয়ে গেলো মুসলমানদের গর্বিত সেই ইতিহাস? এমন বেদনাসঞ্জাত প্রশ্নবোধক চিহ্নগুলো বার বার উদয় হচ্ছিলো তাঁর মনে। এ-ব্যথিত অনুভবে ক্লিষ্ট হতে হতেই তিনি ঘুরে ঘুরে দেখেন— মাদ্রিদ, টলেডো, সিভিল, কর্ডোভা ও গ্রানাডা। আযান দিয়ে নামায পড়েন আল-হামরায়। স্পেনের সফরনামা শায়খ লিখে যেতে পারেন নি।

ইউরোপে তাঁর দ্বিতীয় সফর ছিলো ১৯৬৪ সালে। সে সময় তিনি পরিদর্শন করেন–লণ্ডন, বার্লিন, আখুন, মিউনিখ ও বন। ইউরোপে তাঁর তৃতীয় সফর হয়েছিলো ১৯৬৯ সালে 'জেনেভা আল-মারকাজুল ইসলামী'র আমন্ত্রণে। পরিদর্শন করেছেন জেনেভা, লন্ডন, বার্মিনগাদ, মেনচেষ্টার, ব্ল্যাকবর্ন, শেফিল্ড, ডিউজেবরি, লিডস ও গ্লাসগো। দিয়েছেন গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য। বার্মিনগাম বিশ্ববিদ্যালয় এবং লিডস বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রদত্ত বক্তব্য ছিলো এর মধ্যে অন্যতম। ইউরোপে প্রদত্ত সমস্ত বক্তব্যই প্রকাশিত হয়েছে حديث مع الغرب (পাশ্চাত্যের সাথে কিছু কথা) নামে।

ইউরোপে তাঁর চতুর্থ সফর ছিলো ১৯৮৩ সালে লন্ডনে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে 'ইসলামিক সেন্টার ফর ইসলামিক ষ্টাডিজ' প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে। সেখানে তিনি যে ঐতিহাসিক প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন তার শিরোনাম ছিলো— الإسلام والغرب (ইসলাম ও পাশ্চাত্য)। অবশ্য পরবর্তীতে তিনি ইংল্যান্ডে আরো সফর করেছেন।

১৯৮৫ সালে তিনি বেলজিয়াম সফর করেন।

১৯৭৭ সালে 'আমেরিকা-কানাডা মুসলিম ছাত্রসংঘ' (MUSLIM STUDENTS ASSOCITION OF AMERICA AND CANADA)-এর আমন্ত্রণে তিনি সফর করেন আমেরিকা ও কানাডা। তখন পরিদর্শন করেন নিউইয়র্ক, ইন্ডিয়ানপোলিশ, ব্লোম্যানগটান, ম্যানহাটন, শিকাগো, নিউজার্সি, ফ্লাডেলফিয়া, বালতিমূর, বোস্টন, ডেট্রোয়েট, সালটালেক, সানফ্রান্সিস্কো, সানজোযিয়া, লস-এঞ্জেলেস, মন্ট্রিল, টরেন্টো ও ওয়াশিংটন। গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য প্রদান করেছেন কলোম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে, হারভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে, ডেট্রোয়েট বিশ্ববিদ্যালয়ে, উত্তর ক্যালিফোর্নিয়া

বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং অটোয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে। এ ছাড়া জাতিসংঘের নামাজ মিলনায়তনে এবং মুসলমানদের বিভিন্ন সমাবেশে বক্তব্য প্রদান করেছেন। এই সফরে শায়খ নদভী উর্দূ-আরবী মিলিয়ে বিশটি বক্তব্য প্রদান করেছেন। আরবী বক্তব্যগুলি প্রকাশিত হয়েছে এই শিরোনামে: أحاديث صريحة في أمريكا (আমেরিকায় বসে বলে-যাওয়া কিছু স্পষ্ট কথা)।

১৯৯৩ সালে তিনি আরেকবার আমেরিকা সফর করেন।

১৯৮৭ সালে তিনি মালোয়েশিয়া সফর করেন— 'মুসলিম যুব আন্দোলন'-এর আমন্ত্রণে। পরিদর্শন করেন কুয়ালালামপুর ও কুয়ালাতেরেঙ্গানু। বক্তব্য উপস্থাপন করেছেন সেখানকার জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে, 'ইসলামী দল'-এর কেন্দ্রিয় দফতরে, 'ইসলামী শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ একাডেমি' ও মুসলমানদের সাধারণ সমাবেশে।

১৯৯৩ সালে তিনি সফর করেন তাসখন্দ, সমরকন্দ, খরতঙ্গ ও বুখারা। এ সফরের উদ্দেশ্য ছিলো ইমাম বুখারী রহ. এর অমর স্মৃতিকে নিবেদন করে একটি ইসলামী মারকায প্রতিষ্ঠা করা।

* * *

এই হলো শায়খ নদভী'র সফরের সংক্ষিপ্ত বিবরণ। এ-প্রসঙ্গ শেষ করছি আরেকটা অন্য রকম সফরের কথা বলে। তাঁর ছোট্ট বেলার একটা ছোট্ট সফর। লখনৌ থেকে লখনৌতে। অর্থাৎ জন্মস্থান রায়বেরেলী থেকে লখনৌ শহরে। 'কুঁড়ে ঘর' থেকে রাজকীয় প্রাসাদে। একটু খুলেই বলি— জীবনের সূচনালগ্নে তাঁর পিতার ওফাতের পর ভুপাল রাণী'র স্বামী সিদ্দীক হাসান খান সাহেবের পুত্র নূরুল হাসান খানের রাজপ্রসাদে তাঁকে থাকতে হয়েছিলো বেশ কিছুদিন। তখন চোখভরে দেখেছেন তিনি প্রাসাদি জীবনের জৌলুস .. তার আড়ম্বর .. তার বর্ণাঢ্যতা। কিন্তু সে শুধু চোখের দেখাই, মোটেই প্রভাবিত হন নি তিনি। যাঁর ভিতরে ঘুমিয়ে আছে আগামী দিনের 'আবুল হাসান আলী নদভী' তিনি কী করে দুনিয়ার চাকচিক্যে প্রভাবিত হতে পারেন?

রাজা-বাদশা ও প্রেসিডেন্টদের সাথে তাঁর সাক্ষাত

১৯৫১ সালে তিনি জর্দানের বাদশা আবদুল্লাহ বিন শরীফ হোসাইনের সাথে তিনবার বৈঠক করে মসজিদে আকসা ও ফিলিস্তিনের উদ্বাস্তুদের প্রতি বিশেষ দৃষ্টিদানের অনুরোধ জানান। ১৯৭৩ সালে তিনি রাবেতায়ে আলমে

ইসলামী'র একটি প্রতিনিধি দলসহ দেখা করেন বাদশা হোসাইনের সাথে (যখন তিনি জর্দানের যুবরাজ)।

১৯৪৭ সালে তিনি যুবরাজ সউদ বিন আবদুল আযিযের কাছে একটি গুরুত্বপূর্ণ চিঠি লিখেন, যা পরবর্তীতে بين الجباية والهداية শিরোনামে প্রকাশিত হয়। আর ১৯৬২ সালে তাঁর সাথে সরাসরি সাক্ষাত হয়, যখন তিনি বাদশা। এই সাক্ষাতপর্ব অনুষ্ঠিত হয় রাবেতায়ে আলমে ইসলামী'র প্রতিষ্ঠা-উপলক্ষে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে।

বাদশা ফয়সাল বিন আবদুল আযিযের সাথে তাঁর প্রথম সাক্ষাত হয় ১৯৬৩ সালে— যখন তিনি যুবরাজ। বাদশা হওয়ার পর কয়েকবারই তাঁদের সাক্ষাত হয়। অনুরূপভাবে বাদশা খালেদ বিন আবদুল আযিয ও বাদশা ফাহদ বিন আবদুল আযিযের সাথেও তাঁর একাধিকবার সাক্ষাত ও মতবিনিময় হয়। এ ছাড়া তাঁদের সাথে তাঁর গভীর পত্র যোগাযোগও ছিলো। এ-সব পত্রে তিনি তাঁদের কাছে হিজায নগরীর গুরুত্ব, পয়গাম ও অবস্থান তুলে ধরে তার প্রতি সবিশেষ দৃষ্টি রাখার তাগিদ দিয়েছেন।

মরক্কো'র বাদশা দ্বিতীয় হাসানের সাথেও তাঁর সাক্ষাত হয়। এক অন্তরঙ্গ আলোচনায় তিনি তাঁকে বলেছিলেন: 'মুসলিম উম্মাহ বর্তমানে এমন এক মহান নেতার অপেক্ষায় প্রহর গুনছে, যাঁর ঈমান-আকিদা হবে ইলমে ওহী'র উদ্ভাসে উদ্ভাসিত আর ইখলাস ও ইয়াকিন হবে সুদৃঢ় সংকল্প ও আল্লাহনির্ভরতার শ্রেষ্ঠ নমুনা'।

শারজা'র আমির শায়খ সুলতান বিন মুহাম্মদ আল-কাসেমী'র সাথে তাঁর কয়েকবার দেখা হয়। সুলতান নিজেও লখনৌ সফর করেছেন ১৯৮০ সালে।

ইয়েমেনের প্রেসিডেন্ট আলী আবদুল্লাহ সালেহ এর সাথে তাঁর সাক্ষাত হয় সান'আয় ১৯৮৪ সালে।

১৯৮৪ সালে তাঁর সাক্ষাত হয় প্রেসিডেন্ট জিয়াউল হক এর সাথে। শায়খ নদভী জেনারেল জিয়াকে তখন শ্বেত পাথরে নির্মিত মসজিদে কুব্বাতুস সাখরা'র একটি প্রতিকৃতি উপহার দেন, যা শায়খকে জর্দানের একটি কলেজের ছাত্ররা উপহার দিয়েছিলো। এই উপহারের ভিতর দিয়ে শায়খ নদভী জেনারেল জিয়াকে যে বার্তাটি দিতে চেয়েছেন তা হলো— মসজিদে আকসাসহ পুণ্যভূমি ফিলিস্তিনকে উদ্ধার করার মহান দায়িত্ব পাকিস্তানের মতো একটি ইসলামী রাষ্ট্রের গর্বিত প্রেসিডেন্ট হিসাবে তাঁর

উপরও বর্তায়। জেনারেল জিয়ার সাথে তাঁর সর্বশেষ সাক্ষাত হয়েছিলো ১৯৮৬ সালে।

* * *

শায়খ নদভী'র মহান ব্যক্তিত্বের মৌলিক উপাদান

আল্লামা শায়খ নদভী'র ব্যক্তিত্ব অনন্য এক ব্যক্তিত্ব। এমন ব্যক্তিত্বের দৃষ্টান্ত বড়ো একটা দেখা যায় না—বিরল। আল্লাহ্ তাঁকে দিয়েছেন উন্নত চরিত্র, শ্রেষ্ঠ গুণাবলী ও বিস্ময়কর প্রতিভা। একজন মানুষের ভিতরে একসঙ্গে এতো মহৎ গুণের সমাবেশ সচরাচর দেখা যায় না। নিঃসন্দেহে এ আল্লাহ্‌র দান। আল্লাহ্ সবাইকে দান করেন না। যাঁকে দিতে চান, শুধু তাঁকেই দেন। দিয়ে ধন্য করেন, প্লাবিত করেন।

তাঁর প্রতিভা
তাঁর আলোকিত আধ্যাত্মিকতা
তাঁর উন্নত চরিত্রের বর্ণময়তা

আল্লাহ তাঁকে দান করেছেন বুদ্ধিস্নাত প্রতিভা। সূর্যদীপ্ত যোগ্যতা। শৈশব থেকেই যার বিচ্ছুরণ ঘটতে শুরু করেছিলো। হ্যাঁ.. শৈশব থেকেই। বিস্ময়বোধের কিছুই নেই! সকালের সূর্যটাই-না বলে দেয়—দিবসের আকাশটা মেঘলা থাকবে না সুনীল-স্বচ্ছ!

وإذا رأيت مــن الهلال نموه + أيقنتَ أن ســـيصير بدرا كاملا

'নয়া চাঁদের ক্রমবৃদ্ধি দেখে বুঝতে পারো না–
এ-ই হতে যাচ্ছে সুনিশ্চিত ষোলটা তিথির সমষ্টি—পূর্ণিমা?!'

আল্লাহপ্রদত্ত এই প্রতিভা তাঁর সামনে খুলে দিয়েছে জ্ঞান লাভের অবারিত দিগন্ত, সভ্যতা-সংস্কৃতির জগতে প্রবেশের প্রশস্ত বাতায়ন এবং ইলমে নববী'র বিভিন্ন শাখা-প্রশাখায় সাবলীল বিচরণের বিস্তৃত পথ। আঁজলা ভরে ভরে নিয়েছেন তিনি পরম্পরাগত ও বুদ্ধিবৃত্তিক জ্ঞানের স্বচ্ছ ধারা, সালফে সালেহীন বা মহান পূর্বসুরীদের গৌরবময় ঐতিহ্য ও পরবর্তীদের জ্ঞান-গবেষণা এবং প্রাচ্যের ইলম ও প্রতীচ্যের বিজ্ঞানধারা আর পান করেছেন বড়ো তৃপ্তিভরে। এভাবেই গড়ে উঠেছে তাঁর ব্যক্তিত্ব। জ্ঞান-প্রজ্ঞা ও শিক্ষা-সংস্কৃতির ময়দানে পরিণত হয়েছেন তিনি বিশাল এক মহীরুহে— ছায়া ছড়িয়ে.. আলো বিলিয়ে! আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ ও

তাওফীক-যোগে এ-বহুমুখী প্রতিভার বদৌলতেই একাধিক ভাষায় সুদক্ষ হয়ে উঠেছিলেন তিনি—আরবী, উর্দু, ফারসী, হিন্দী ও ইংলিশ। আর এই বহুভাষা-সেঁতুর বন্ধনে ভারত-উপমহাদেশ ছাপিয়ে পরিচিত হতে পেরেছিলেন বিশ্ব সম্প্রদায়ের সুবিস্তৃত শিক্ষা ও সংস্কৃতির সাথে গভীরভাবে— আপন-আপন বলয়ে যার রয়েছে সুনির্দিষ্ট ওজন ও মূল্য।

কিন্তু শায়খ নদভী শুধু শিক্ষা ও জ্ঞান-গবেষণার ময়দানেই মহান ও অগ্রগামী ছিলেন না, তাঁর রক্তের কণায়-কণায় মিশে ছিলো সুকুমারবৃত্তি ও মহৎ গুণাবলী'র অসংখ্য উপাদান, যা তিনি উত্তরাধিকারসূত্রেই লাভ করেছিলেন তাঁর পূর্বপুরুষ রাসূলে আরাবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে, যিনি এসেছিলেন 'মহান চরিত্র'কে ষোলকলায় পূর্ণতা দিতে .. যাঁর সম্পর্কে আম্মাজান আয়েশা রা. এর উক্তি হলো— 'كان خلقه القرآن' 'তাঁর চরিত্র ছিলো— কুরআন।'[১]

আমি দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলতে চাই— শায়খ নদভীও ছিলেনঃ কুরআনী চরিত্রের, মুহাম্মদী আচরণের, হাসানী স্বভাবের এবং ইসলামী চিন্তা-চেতনার সূতীকাগার। মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যা নিয়ে এসেছেন তার চির অনুগত ছিলো শায়খ নদভী'র সকল চাওয়া-পাওয়া ও আবেগ-অনুভূতি। এ মোটেই নয়— আমার মনগড়া উক্তি কিংবা অতিশয়োক্তি কিংবা তাঁকে ছোট করার কোনো প্রয়াস। এ আমার হৃদয়ের গভীর থেকে উচ্চারিত বিশুদ্ধ ধ্বনি। চির-অনুভবীয় সত্যের স্বতঃস্ফূর্ত উচ্চারণ। আমি তাঁকে গভীরভাবে দেখেছি, চিনেছি ও বুঝেছি এবং এই দাবি নিয়েই বলছি— তিনি এমনই ছিলেন। এমনই ছিলো তাঁর স্বভাব-প্রকৃতি। আল-কুরআনের এই আয়াত যেনো ছিলো তাঁর জীবনের স্লোগান :

"قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لاشريك له"

'বলো, আমার নামাজ, আমার কোরবানী, আমার জীবন এবং আমার মৃত্যু— জগৎসমূহের প্রতিপালক লা-শরীক আল্লাহ্‌র জন্যে।'

-আন'আম:১৬২-১৬৩

তিনি একজন 'ইনসান' (মানুষ) ছিলেন—
'ইনসানিয়াত' শব্দের সর্বব্যাপী অর্থ ও তাৎপর্যে।

[১] মুসলিম

তিনি একজন রাব্বানী ছিলেন—
'রাব্বানিয়াত' শব্দের নিগূঢ়তম অর্থ ও তাৎপর্যে।
তিনি 'আখলাকী' (চরিত্রবান) ছিলেন—
'আখলাকিয়াত' শব্দের সকল মানদণ্ডে।
তিনি একজন মুসলমান ছিলেন—
'ইসলাম' শব্দের পরিপূর্ণ অবয়বে।

من المصابيح الذين همو + كأهم من نجوم حية صُنِعُوْا

أخلاقهم نورهم من أيِّ ناحية + أقبلت تنظر فـــي اخلاقهم سطعوا

'মানুষের ভিতরে আছে এমন সব আলোকবর্তিকা,
যাঁদেরকে দেখলে মনে হয় যেনো জীবন্ত নক্ষত্ররাজি থেকে
নির্মিত সত্ত্বা।
তাঁদের চরিত্রই তাঁদের সামনে আলো ছড়ায়— সবদিক থেকে,
কাছে এসেই দেখো না তাঁদের চরিত্র! দেখবে সে কী দেদীপ্যমান!!'

পানাহারে তাঁর কোনো আড়ম্বর ছিলো না। পোশাক-আশাকে তাঁর কোনো লৌকিকতা ছিলো না। চাল-চলন ও ওঠা-বসা অর্থাৎ তাঁর জীবন প্রবাহের কোনো বাঁকেই কোনো আড়ম্বরতা বা লৌকিকতা ছিলো না। তিনি ছিলেন নিজের মতো। আপন গতিপ্রবাহে প্রবহমান। আপন স্বভাবে গড়া, আপন মহিমায় ভাস্বর। তাঁর চোখের সামনে সর্বদা যেনো ভেসে বেড়াতো এই আয়াত

"قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِين

('হে নবী!) বলে দিন, আমি এ কাজের জন্যে তোমাদের কাছে কোনো পারিশ্রমিক দাবি করছি না। আমি তাদেরও কেউ নই–যারা লৌকিকতা করে।' -সুয়াদ:৮৬

তাঁর জবান ছিলো সংযত, কলমও ছিলো সংযত। কোনোদিন কাউকে আঘাত করে কোনো কথা বলেন নি তিনি। কারো দোষ খুঁজে বেড়ানো ছিলো তাঁর কাছে ভীষণ অপছন্দ। এই প্রজ্ঞাপূর্ণ কথার তিনি ছিলেন জীবন্ত নমুনা :

'طوبي لمن شغله عيبه عن عيوب الناس'

অর্থাৎ 'পরের দোষ না খুঁজে নিজের দোষ যে খুঁজে বেড়ায় .. তাকে যে সাধুবাদ জানাতেই হয়!'

কিন্তু তাই বলে সত্য-বিকৃতি তিনি মোটেই বরদাশত করতেন না। যে কোনো সত্য-বিকৃতির কঠোর সমালোচক ছিলেন তিনি। তাই আমরা দেখতে পাই; মাওলানা মওদূদী সাহেব যেমন তাঁর সমালোচনা থেকে রেহাই পান নি, তেমনি শহীদ সায়্যিদ কুতবও রেহাই পান নি এই সত্য-বিচ্যুতির কারণে—তাঁর কাছে তাঁদের মর্যাদা ও অবস্থান সত্ত্বেও। কিন্তু এই সমালোচনা এক ন্যায়নিষ্ঠ আলেমের সমালোচনা। হিংসা-বিদ্বেষ ও সীমালংঘনমুক্ত সু ভারসাম্যপূর্ণ সমালোচনা। এই দৃষ্টিকোণ থেকেই তিনি সমালোচনা করেছেন ব্যক্তির, দলের, দৃষ্টিভঙ্গির ও প্রশাসনের। কিন্তু এই সমালোচনা বিনয়-নম্রতায় প্লাবিত, বন্ধুসুলভ স্নেহ-ভালোবাসায় সিক্ত, বিশ্বস্ত কল্যাণকামী'র আন্তরিকতায় দীপ্ত। নেই কাউকে ছোট করার হীন মানসিকতা, নেই হিংসার বহ্নি.. বিদ্বেষের আঁধার উদগীরণ।

তিনি দুনিয়ার প্রতি ছিলেন ভীষণ অনাসক্ত। পরকালই ছিলো তাঁর চূড়ান্ত লক্ষ্য, সর্বশেষ চাওয়া-পাওয়া। আল্লাহ্‌র কাছে এক মর্দে মু'মিনের জন্যে অপেক্ষা করছে যে প্রাপ্তি ও পুরস্কার, তার জন্যেই তিনি ছিলেন সবচে' বেশি লালায়িত। তা ছাড়া দুনিয়ার এই মানুষের কাছে কী-ইবা চাওয়ার আছে? দুনিয়ার কোনো পাওয়া কি মানুষকে দিতে পারে স্বস্তি, শান্তি ও তৃপ্তি? মানুষের কাছে যা-কিছু আছে তার সবই তো কুয়াশার মতো অপসৃয়মান! বুদ্বুদের মতো বিলীয়মান!! আর আল্লাহ্‌র কাছে যা আছে, তার কোনো ক্ষয় নেই .. লয় নেই। স্বর্গীয় জ্যোতিস্নাত— এ-চিন্তামানসই তাঁকে আজীবন 'দুনিয়া-অনুরাগ'-এর মোহনীয় ইন্দ্রজাল থেকে দূরে .. বহুদূরে সরিয়ে রেখে 'আখেরাত-অনুরাগ'-এর চিরপ্রেমিক বাসিন্দা বানিয়েছিলো। এক মুহূর্তের জন্যে সম্পদের মায়ায় তিনি তাড়িত হন নি। যশ-খ্যাতিও তার কাছে কোনো সাড়া পায় নি! এ সব থেকে তিনি ছিলেন অনেক বড়— শুধু ঈমানের দৌলতের মহা অধিকার বলে, শুধু ইয়াকিনের অপার শক্তি বলে!

দুনিয়ার প্রতি অনাসক্তি

সত্যি কথা বলতে কি, আমি তাঁর মতো দুনিয়া-বিরাগ মানুষ এ-যুগে দেখি নি। বড়ো সাদাসিধে জীবন ছিলো তাঁর। দুনিয়ার জাঁকজমক ও চাকচিক্য তাঁর জীবনকে স্পর্শ করতে পারে নি, ন্যূনতম কোনো প্রভাব ফেলতে পারে নি। দুনিয়ার এ-জাঁকজমক ও চাকচিক্য তাঁর যতো কাছে

আসতে চেয়েছে, তিনি তা থেকে ততো দূরে সরে পড়েছেন। অথচ চাইলে শুধু সগোত্র নয়— বিশ্বের যে কোনো স্থানে তিনি 'প্রাসাদি জীবন' কাটাতে পারতেন। প্রসিদ্ধ ভূপাল রাজা সিদ্দীক হাসান খানের ছেলে নূরুল হাসান খানের প্রাসাদে জীবনের একটা বর্ণাঢ্য সময় তো তিনি কাটিয়েছেনও! সেখানে সবই ছিলো তার জন্যে। যা চাইতেন তাই পেতেন। চাওয়ার দেরী ছিলো কিন্তু পাওয়ার কোনো দেরী ছিলো না। ইচ্ছে করলে সারাটা জীবনই তিনি এভাবে কাটাতে পারতেন।

কিন্তু এমন জীবন যে তাঁর কাম্য ছিলো না!

তিনি চাইতেন অন্য রকম আরেক জীবন।

সে জীবন আল্লাহ্‌ওয়ালাদের জীবন।

আল্লাহ-প্রেমের সৌরভে সুরভিত হওয়ার জীবন।

যে জীবনে আল্লাহ্‌ওয়ালারা দুনিয়াতে বাস করেন বটে,

কিন্তু দুনিয়া তাঁদের মাঝে বাস করতে পারে না।

তাঁরা দুনিয়াকে চাইলেই পান, কিন্তু দুনিয়া তাঁদেরকে চাইলেও পায় না।

তিনি যেনো প্রথম যুগের এক আল্লাহ্‌ওয়ালা বুযুর্গ,

এই যুগে এসেছেন ইবরাহীম ইবনে আদহাম,

ফুযাইল ইবনে আয়ায কিংবা জুনাইদ ইবনে মুহাম্মদ রহ. এর প্রতিনিধি ও 'অবিকল ছায়াছবি' হয়ে!

যাঁরা দুনিয়াতে বাস করে গেছেন আখেরাতমুখী হৃদয় নিয়ে।

জমিনের বুকে যখন তাঁরা হাঁটতেন,

তখন তাঁদের দৃষ্টিসীমা ছাপিয়ে যেতো সুদূর আকাশের ঐ নীলিমাকেও।

তাঁর জীবনটাও ঠিক গড়ে উঠেছিলো এই পুণ্যাত্মাগণের জীবনাদর্শের আলোকেই। কিংবা বলা যায়—তিনি ছিলেন তাঁরই মহান পিতৃপুরুষ সায়্যিদুনা আলী রা. এর জীবনেরই একটি আলোকিত অংশ। দুনিয়া যাকে কাবু করতে এসে লাঞ্ছিত ও ধিকৃত হয়ে পালিয়ে গিয়েছিলো।

হযরত আলী রা. এর ভাষায়

إليك عني، غري غيري، قد باينتك ثلاثا لا رجعةَ فيها. آهِ من قلة الزاد، وبُعْدِ السفر، ووحشة الطريق!

'সাবধান, আমার কাছে এসো না যেনো! পারলে অন্য কাউকে গিয়ে প্রতারিত করো! আমি তোমাকে চিরতরে 'ত্যাগ' করেছি! হায়! পাথেয় কতো কম! সফর কতো দূরের! পথ কতো বন্ধুর!'

* * *

ন্যায্য পারিশ্রমিক নিতেও তিনি বরাবর অস্বীকার করতেন। অথচ অন্যান্য উলামায়ে কেরাম তা গ্রহণ করতেন। কিন্তু তাঁর জীবন-প্রতীজ্ঞা ছিলো— ইলমের খিদমত করে যাবো শুধু আল্লাহ্র সন্তুষ্টির জন্যে, দুনিয়ার' কোনো বিনিময় লাভের জন্যে নয়।

সিরিয়ার বন্ধুরা আমাকে বলেছেন যে, 'অতিথি অধ্যাপক' হিসাবে যখন ড. মোস্তফা আস সিবাঈ শায়খ নদভীকে দামেস্ক বিশ্ববিদ্যালয়ে ধর্ম বিজ্ঞান অনুষদে আমন্ত্রণ জানালেন তখন তিনি এলেন ঠিকই এবং সেখানে বসেই সীমাহীন শ্রম ও সাধনা ব্যয় করে একাধিক মূল্যবান বক্তব্য তৈরী করে তা পেশ করলেন। ছাত্র-শিক্ষক সবাই তাঁর এই বক্তব্যে উপকৃত হলো .. মুগ্ধ হলো। (এই বক্তৃতামালার শিরোনাম ছিলো: التجديد والمجددون في تاريخ الإسلام، (ইসলামী চিন্তা-দর্শনে সংস্কার ও সংস্কারক) যা পরবর্তীতে رجال الفكر والدعوة في الإسلام নামে প্রকাশিত হয়।) কিন্তু বিপত্তি দেখা দিলো পারিশ্রমিক প্রদানের সময়। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ প্রথা অনুযায়ী তাঁর জন্যে নির্দিষ্ট পরিমাণ সম্মানী বরাদ্দ করলেন। কিন্তু তাঁকে দিতে গিয়েই মুখোমুখি হলেন একেবারে নতুন অভিজ্ঞতার। শায়খ পরিস্কার ভাষায় জানিয়ে দিলেন যে, তিনি কোনো পারিশ্রমিক গ্রহণ করতে পারবেন না। এ দিকে তা ফিরিয়ে নেয়ারও কোনো অবকাশ ছিলো না। কেননা ইতোমধ্যেই তা খরচের খাতায় উঠানো হয়ে গেছে। ফলে দরিদ্র ছাত্রদের মাঝে তা বিলিয়ে দেয়া ছাড়া আর কোনো পথই খোলা রইলো না।

অধ্যাপক মুহাম্মদ আল-মাজযুব রহ. তাঁর علماء ومفكرون عرفتهم কিতাবে শায়খ নদভী'র আলোচনা করতে গিয়ে বলেছেন : 'রাবেতায়ে আলমে ইসলামী'র একজন প্রতিষ্ঠাতা সদস্য হিসাবে প্রতি বছর সংস্থাটির বার্ষিক সেমিনারে অংশগ্রহণের জন্যে শায়খ নদভীকে যে সম্মানী ভাতা দেয়া হতো, তা গ্রহণ করতেও তিনি অস্বীকৃতি জানিয়েছিলেন।'

হ্যাঁ .. শায়খ এমনই ছিলেন। এটা মোটেই তাঁর জীবনের কোনো রহস্য বা গোপন বিষয় নয়। যেমন, 'আন্তর্জাতিক বাদশা ফয়সল পুরস্কার'-

এর জন্যে তাঁকে মনোনীত করা হলে তার একটি পয়সাও তিনি নিজের জন্যে গ্রহণ করেন নি, বরং সবটাই দান করে দিয়েছেন হারামাইনের দরিদ্রদের ভিতরে এবং হিন্দুস্তানের বিভিন্ন মাদরাসায়। এ পুরস্কারের পরিমাণ ছিলো সে সময়কার তিন লক্ষ সৌদি রিয়াল।

অনুরূপ ইসলামের ইতিহাস রচনায় অবদান রাখার জন্যে ব্রুনাই সরকারের পুরস্কার এবং আন্তর্জাতিক শ্রেষ্ঠ ইসলামী ব্যক্তিত্ব হিসাবে দুবাই সরকারের পুরস্কার (১০ লাখ দিরহাম)সহ যতো পুরস্কার তিনি পেয়েছেন তার সবই আল্লাহ্‌র রাস্তায় বিলিয়ে দিয়েছেন, নিজের জন্যে কিছুই রাখেন নি—(সিদ্দিকে আকবরের মতো) আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের সন্তুষ্টি ছাড়া!

ঐক্যের জন্যে ব্যাকুলতা

মুসলিম উম্মাহর ভিতরে অনৈক্যের মূলোৎপাটন করে কীভাবে তাদেরকে ঐক্যের সুদৃঢ় বন্ধনে আবদ্ধ করা যায়— এই ছিলো তাঁর সার্বক্ষণিক চিন্তা-ভাবনা। নির্মাণেই ছিলো তাঁর আনন্দ আর ভাঙনে ভাঙন আনতো তাঁর হৃদয়ে। ঐক্য তাঁর মনে বইয়ে দিতো আনন্দ-হিল্লোল আর অনৈক্য ঘটাতো বেদনার রক্তক্ষরণ। মুসলমানদের ভিতরে বিভেদ ও অনৈক্য তাঁকে ভীষণ বিচলিত করতো। এ জন্যেই অনৈক্য সৃষ্টি করে— এমন স্পর্শকাতর বিষয়গুলিকে তিনি মুকাবিলা করতেন প্রজ্ঞাপূর্ণ কৌশল ও হৃদয়স্পর্শী উপস্থাপনার কোমল ও মায়াবী পরশ দিয়ে। এ জন্যেই যে কোনো কঠিন ও সঙ্গীন পরিস্থিতি সামাল দেয়ার জন্যে তাঁর ডাক পড়তো এবং তিনিও ছুটে যেতেন ঐক্য-স্বপ্নের ব্যাকুলতা নিয়ে। আমার মনে হয়; এ ক্ষেত্রে সত্যিই তিনি অনন্য ও বিরল। অসামান্য কৃতিত্বের অধিকারী।

আর এমন তো হবেই! তাঁর স্বভাব-প্রকৃতিই যে এমন!

নির্মাণ ও ঐক্যচিন্তা যে মিশে আছে তাঁর রক্তের কণায়-কণায়!!

তাঁর বুকে যে রয়েছে সমুদ্রের গভীরতা, আকাশের বিশালতা!

তাঁর চরিত্র-মাধুর্য যে সবার মাঝে বুলিয়ে দেয় ঐক্য-হাওয়ার মৃদুল পরশ!

যে কোনো কঠিন সমস্যার সহজ সমাধান পেশ করার..

যে কোনো সঙ্গীন পরিস্থিতির প্রজ্ঞাপূর্ণ মুকাবিলার— তাঁর ছিলো অসামান্য দক্ষতা!

লক্ষ্য করুন; 'সুফিবাদ' বা তাসাওউফ নিয়ে সৃষ্ট বিভিন্ন ব্যাখ্যা ও জটিলতার কী সুন্দর ও গ্রহণযোগ্য সমাধান পেশ করেছেন তিনি, তাঁর ربانية لا رهبانيـــة (বৈরাগ্য নয়— চাই রাব্বানিয়াত) গ্রন্থে। এ-গ্রন্থে তিনি তাসাওউফের পরিভাষাসমূহের অন্তর্নিহিত তাৎপর্য ও গূঢ়ার্থ তুলে ধরেছেন। শুধুমাত্র পরিভাষার নিগড়ে বন্দি মানুষকে লক্ষ্য করে তিনি বলেছেন

নাম নয়— চাই নামীয়! নামীয়-ই তো আসল!!
শিরোনামের ঝলকে চমকে কী-ইবা আসে যায়?
প্রতিপাদ্য বিষয়-ই মূল!
পরিভাষার এই যে ঝলক,
নাম আর উপনামের এই যে বাহার,
কী-ইবা তার মহিমা?
যদি না থাকে তাতে হৃদয় জগত বদলে দেয়ার রূপালী দীপ্তি,
সোনালী আভা?
অন্তর্জগত আলোকোদ্ভাসিত করার একনিষ্ঠ ব্রত ও সাধনা?

মজার ব্যাপার হলো; তাসাওউফ নিয়ে এই যে জটিলতা ও বিতর্ক— তার অবতারণাই হতো না, যদি 'তাসাওউফ' শব্দের পরিবর্তে অন্য কোনো নাম বা শিরোনাম স্থির করা হতো। যেমন কুরআনুল কারীমে উল্লেখিত 'تزكية ' বা আত্মশুদ্ধি কিংবা হাদীসে জিবরীলে উল্লেখিত 'إحسان' শব্দটি।

অনুরূপভাবে সাহাবায়ে কেরামের সমালোচনা ও গালমন্দ করাকে শিয়া সম্প্রদায় দোষনীয় মনে করে না। শায়খ নদভী তাদের এ ন্যাক্কারজনক আকিদার জবাব দিয়েছেন বিদগ্ধ গবেষকের গাম্ভীর্য এবং বিনয় ও কৌশলের মাধ্যমে صورتان متضادتان (দু'টি বিপরীতমুখী চিত্র) নামে তাঁর আরেকটি মূল্যবান গ্রন্থে। এ-গ্রন্থে তিনি দু'টি চিত্র তুলে ধরেছেন। প্রথম চিত্রে বলেছেন : সাহাবায়ে কেরাম সম্পর্কে শিয়া সম্প্রদায় যে আকিদা পোষণ করে তা অন্ধকারাচ্ছন্ন ও ভয়ঙ্কর এক আকিদা, যা বিশ্বাস করলে বলতে হবে যে, নববী বিদ্যাপীঠের তারবিয়ত ও দিক-নির্দেশনা এবং শিক্ষা ও আলো থেকে সাহাবায়ে কেরাম মোটেই উপকৃত হন নি। এমনকি হযরত আবু বকর, উমর, উসমান, তালহা, যোবাইর ও আয়েশা রা. মতো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সান্নিধ্য-ঘনিষ্ঠ সাহাবীরাও নন, অর্থাৎ কেউ-ই নন। (যা একেবারেই অসম্ভব)।

দ্বিতীয় চিত্রটি হলো— আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের আকিদা-বিশ্বাসপুষ্ট চিত্র। এ-চিত্রে পরিস্কারভাবে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে যে, সাহাবায়ে কেরাম হলেন মুহাম্মদী মাদ্‌রাসার ছাত্র। তাঁরা গড়ে উঠেছেন—

নবুওয়তের দুধ পান করে-করে।

নবুয়ত-উদ্যানের ফুলেল পরিবেশে ছোটে-ছোটে।

আসমানী ওহীর সযত্ন তত্ত্বাবধানে সকাল-সন্ধ্যা কাটিয়ে-কাটিয়ে।

একমাত্র তাঁর সান্নিধ্যকেই সবকিছুর কেন্দ্রবিন্দু বানিয়ে-বানিয়ে।

শুধু তাঁর চোখের ইশারাকে হাজার নির্দেশের সেরা নির্দেশ বলে—

বিশ্বাস করে-করে।

তাঁদের গুণের কথা .. তাঁদের শ্রেষ্ঠত্বের কথা,

বলে শেষ করা যাবে না—যতোই বলা হবে ততোই থেকে যাবে।

তাঁদের চরিত্র-হননের চেষ্টা—শুধুই অপচেষ্টা।

শিশির-শুভ্র সাদা গোলাপে ময়লা খোঁজা!

ঐ বিশাল আকাশের দিকে চোখ তোলে 'ত্রুটি' খোঁজা!

আল্লাহর সৃষ্টির মাঝে গরমিল খোঁজা!

দুনিয়াতে বসেই জাহান্নামের আগুনকে কাছে ডেকে আনা!

* * *

তাঁরা সরাসরি আল্লাহ্‌র রাসূলের কাছ থেকে কুরআন শিখেছেন। বুঝেছেন তার অর্থ ও মর্ম এবং রহস্য ও তাৎপর্য। তাঁরা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করেছেন আল্লাহ্‌র অসংখ্য কুদরত ও নিদর্শন। দেখেছেন বদরে-খন্দকে-হোনায়নে তাঁদের সাহায্যে আসমানী ফেরেশতাদের এসে লড়াই করতে।

এই শেষোক্ত চিত্রটিই নবুওয়তের শান ও মর্যাদার সাথে এবং তারবিয়ত ও শিক্ষার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ। মুহাম্মদী মাদ্‌রাসার ছাত্ররা তো স্বাভাবিকভাবে মুহাম্মদী আদর্শ ও শিক্ষার উপরই গড়ে উঠবেন এবং জীবন প্রবাহিত করবেন! এ কথার সপক্ষে অন্য কোনো সাক্ষী'র প্রয়োজন নেই— কুরআনই তো যথেষ্ট! সূরা ফাতহে, সূরা তাওবায় ও সূরা হাশরে সাহাবায়ে কেরামের প্রশংসা করা হয়েছে। নবীজীও তাঁদেরকে 'خير قرون الأمة' বা শ্রেষ্ঠ উম্মত বলে অভিহিত করেছেন। ইতিহাসের বাঁকে বাঁকে এ কথা বর্ণে বর্ণে সত্য হিসাবেও প্রমাণিত হয়েছে।

তাঁরাই তো আমাদের কাছে পৌঁছে দিয়েছেন কুরআন!

তাঁরাই তো পরবর্তীদের কাছে বর্ণনা করেছেন—
নবীজীর অসংখ্য অগণিত হাদীস!
তাঁরাই তো উম্মতের কাছে তুলে ধরেছেন নবী-জীবনের পরিপূর্ণ চিত্র!
তাঁরাই তো জীবনের মায়া ত্যাগ করে,
সতত স্বতঃস্ফূর্ততায় আল্লাহ্-রাসূলের ভালোবাসায় উদ্বুদ্ধ হয়ে,
হাতে হাতে তলোয়ার তুলে নিয়ে,
করেছেন জিহাদ, হয়েছেন শহীদ কিংবা গাজী!
বিজয় করেছেন দেশের পর দেশ!
বইয়ে দিয়েছেন আঁধার দুনিয়ায় আলোর ধারা!
ছড়িয়ে দিয়েছেন কুশিক্ষার স্থলে সুশিক্ষা!
উম্মত তখন খুঁজে পেয়েছে পথের দিশা। হয়েছে ধন্য, চির ধন্য।

সুতরাং উম্মতের এই পুণ্য কাফেলা কী করে হতে পারে সমালোচনা ও গালাগালির শিকার?!

رضـــــــــــــــــي الله عنـــــــــهم أجمـــــــعين

বিশ্বের মুসলমানদের চোখে শায়খ নদভী
বিশ্বের মুসলমানদের হৃদয়ে শায়খ নদভী

মহৎ সব গুণাবলী'র বিপুল সমাবেশ ঘটেছিলো শায়খ নদভী'র জীবনে। আমি তার কিই-বা বলতে পেরেছি! এ-সব গুণই, মানুষকে শায়খের কাছে আসতে বাধ্য করেছে। তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা ও ভালোবাসায় আপ্লুত হতে, বাধ্য করেছে। তাঁর প্রতি মানুষের এই আকর্ষণ ও ভালোবাসার স্রোত, বয়ে গেছে আরব-আজম প্রাচ্য-প্রতীচ্য সর্বত্র। মানুষ তাঁকে ভালোবেসেছে আল্লাহকে পাওয়ার জন্যে।

তাঁকে ভালোবাসা— আল্লাহকেই ভালোবাসা।
কেননা বিলীয়মান দুনিয়ার জন্যে কেউ তাঁকে ভালোবাসে নি।
মাল-সম্পদের জন্যে কেউ তাঁকে ভালোবাসে নি।
রক্তের টানেও কেউ তাঁকে ভালোবাসে নি।
দেশের ডাকেও কেউ তাঁকে ভালোবাসে নি।
তাঁর প্রতি মানুষের এই নিবেদন ও ভালোবাসা—
তাঁর দীনদারী ও তাকওয়ার জন্যে,
ইসলামের প্রতি তাঁর সীমাহীন 'গায়রত' ও মমতাবোধের জন্যে,

ইসলামকে সঠিকভাবে অনুধাবন ও উপলব্ধি করার জন্যে,
ইসলামের দিকে মানুষকে গভীর মমতায় ডাকার জন্যে,
ইসলামের জন্যে তাঁর সর্বস্ব বিলিয়ে দেওয়ার জন্যে,
মুসলিম উম্মাহর প্রতি তাঁর অপরিসীম দরদ ও জ্বলনের জন্যে,
মুসলিম উম্মাহর তাবৎ সমস্যা ও সঙ্কটাপন্ন পরিস্থিতি
তাঁকে সীমাহীন উদ্বেগাকুল করার জন্যে,
ইসলামের ভিতরে দুশমনের অনুপ্রবেশ ঠেকানোর লক্ষ্যে,
তাঁর সাহসী ও দূরদর্শী ভূমিকার জন্যে,
শুধু ইসলামকে সামনে রেখে
ইসলামকে কেন্দ্র করে .. তাঁর জীবন-মরণ শপথ গ্রহণের জন্যে,
আল্লাহ্র পথে জিহাদের তরে,
তাঁর জীবন-বিলানো দৃপ্ত শপথ ও অঙ্গীকারের জন্যে!
হ্যাঁ .. অবশ্যই মানুষ তাঁকে ভালোবাসে—
তাঁর ইখলাস ও নিষ্ঠার জন্যে,
তাঁর দুনিয়া বিরাগ ও আল্লাহমুখিতার জন্যে,
তাঁর মহত্ত্ব ও সততার জন্যে।

হ্যাঁ .. এ ভাবেই মানুষের ভালোবাসায়-ভালোবাসায় তিনি পরিপ্লুত ও প্লাবিত হয়েছেন। হৃদয়-মন উজাড় করে তাঁকে ভালোবেসে সবাই যেনো আল-কুরআনের এই আয়াতের ডাকেই সাড়া দিয়ে সমকণ্ঠে চীৎকার করে উঠেছিলো 'লাব্বাইক' বলে—

" يَا أَيُّهَا الَّذِين آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِين

'হে ঈমানদারগণ! আল্লাহকে ভয় করো এবং আল্লাহওয়ালাদের সাথে থাকো।'

এমনকি যারা তাঁকে দেখে নি—শুধু শুনেছে তাঁর কথা, পড়েছে তাঁর কিতাব, তারাও তাঁকে ভালোবেসেছে, এই আশায় বুক বেঁধে যে, যেদিন কোনো ছায়া থাকবে না, সেদিন যদি এই ওসীলায় আল্লাহ্র আরশের ছায়ায় একটু জায়গা মিলে যায়!

আল্লাহকে সাক্ষী রেখে বলছি— আমিও এই মহান আল্লাহওয়ালাকে ভালোবাসি। ভীষণ ভালোবাসি। তাঁর প্রতি আমার এই যে ভালোবাসা— সে শুধুই আল্লাহ্র জন্যে ভালোবাসা। আশা আমার একটাই— কেয়ামতের দিন আল্লাহ তাঁকে এবং আমাকে যেনো তাঁদের অন্তর্ভূক্ত করেন, যাঁরা শুধু

আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টিকে সামনে রেখে একে অপরকে ভালোবেসেছে! রক্তের বাঁধন যেখানে কোনো স্থান পায় নি। পার্থিবতার মোহময়তা যেখানে কোনো টান সৃষ্টি করতে পারে নি। সার্থ-চিন্তাকে যেখানে ব্যঙ্গ করা হয় লাল চোখে! যাঁদের এই ভালোবাসা প্রশংসিত হয়েছে দরবারে রিসালাত থেকে এভাবে—

إن الله يقول يوم القيامة: أين المتحابون بجلالي؟ اليوم أظلهم في ظلي، يومَ لاظلَّ إلا ظلّي، — رواه مسلم

'কেয়ামতের দিন আল্লাহ্ বলবেন : কোথায় তারা, যারা আমার মহিমা গেয়ে-গেয়ে একে অপরকে ভালোবেসেছিলো? আজ আমি তাদেরকে আমার ছায়ায় ছায়া দিয়ে কাছে টেনে নেবো, আমার ছায়া ছাড়া সেদিন আর কোনো ছায়া থাকবে না!'[১]

আমি আমার বিবেকের কণ্ঠধ্বনি শুনে শুনে বলছি— 'আম-খাস' (বিশেষ ব্যক্তিত্ব ও সাধারণ জনতা) সবাই তাঁকে ভালোবাসে। তবে তাদের কথা আলাদা, হৃদয় যাদের অসুখে ঘেরা—ব্যাধিতে ঠাসা। এমন মানুষকে ভালোবাসতে যারা কুণ্ঠাবোধ করে—নির্দ্বিধ হতে পারে না, তারা অসুস্থ বৈ কী? এমন মানুষের কাছ থেকে আল্লাহ্‌র আশ্রয় চাই।

পাঠক! বিশ্বাস করুন, আমি একাই শুধু তাঁকে ভালোবাসিনি, আমি শুধু এই সারির একজন নগন্য সদস্য মাত্র। কিন্তু তাঁদের সবার কথা এখানে বলার অবকাশ নেই। শুধু দু'জনের কথা বলছি, উদাহরণ হিসাবে—

একজন হলেন আল্লাহ্‌র পথের মহান দাঈ ও বিশিষ্ট হাদিসবিদ আল্লামা আবদুল ফাত্তাহ আবু গুদ্দাহ রহ.। শায়খকে-পাঠানো এক চিঠিতে তিনি ইয়াহইয়া ইবনে সাঈদ আল-আনসারী সম্পর্কে তাঁর ছাত্রের উক্তি উদ্ধৃত করে বলেন

كَان يَحْي بْنُ سَعِيْدٍ يُحَدِّثُنَا فَيَسِحُّ عَلَيْنَا اللُّؤْلُؤُ.

অর্থাৎ, ইয়াহইয়া ইবনে সাঈদ আমাদের মাঝে বসে কথা বলতেন, তখন মনে হতো যেনো মণি-মুক্তো ঝরে ঝরে পড়ছে!'

এরপর আল্লামা আবদুল ফাত্তাহ আবু গুদ্দাহ্ বলেন : 'আল্লাহর কসম! আপনি কথা বললেও আমার কাছে তেমনি মনে হয়! সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌র, যিনি আপনাকে (ইলম) দান করেছেন, আমাদের মাঝে দিয়েছেন

---

[১] মুসলিম

সুদৃঢ় অবস্থান ও মর্যাদা, আপনার (প্রতিভার) ভিতরে আমাদেরকে প্রত্যক্ষ করিয়েছেন মহান সালফে সালেহীন ও পূর্বসুরীদের ইলমী ইতিহাস ও কীর্তিগাথার অসংখ্য বর্ণিল পৃষ্ঠা। আপনাকে দেখলেই চোখের সামনে ভেসে উঠে সালফে সালেহীনের উন্নত চরিত্র-মাধুরির ছবি। হৃদয়-মন উজাড় করে যাঁরা আল্লাহ্‌কে ভালোবেসেছেন এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের ভালোবাসার দাবি নিয়ে মানুষও যাঁদেরকে ভালোবেসেছে। আপনিও সেই মহান আকাবির কাফেলারই সদস্য—এতে বিস্মিত হবার কিছুই নেই। বিস্তৃত ডালপালাবিশিষ্ট বৃক্ষ সব সময় ধারণ করে থাকে তরুতাজা শাখা-প্রশাখা! চোখ জুড়িয়ে যাওয়া বর্ণ! হৃদয় ছুঁয়ে যাওয়া সুরভি! সর্বযুগে, সর্ব জায়গায়! আল-হামদু লিল্লাহ!!'

আরেকজন হলেন প্রখ্যাত ইসলামী চিন্তাবিদ মুহাম্মদ আল-মুবারক। শায়খকে লেখা এক চিঠিতে আবেগ-উদ্বেলিত ভাষায় তিনি বলেন : 'এতোক্ষণ যা আমি বললাম, তা আমার হৃদয় ও বিশ্বাসবোধ থেকে উৎসারিত পংক্তিমালা। তা মোটেই নয় পোশাকী সৌজন্য বা লৌকিকতা। আপনি আমাকে কখনো যদি ভুলে যান বা দূরে ঠেলে দেন—শুধু সেই আশঙ্কায় আজ অসংকোচে প্রকাশ করলাম আপনার প্রতি আমার সীমাহীন শ্রদ্ধার কথা.. ভালোবাসার কথা। এই আশায় বুক বেঁধে যে, আপনি এতে আমার প্রতি সহৃদয় হবেন। বিশ্বাস করুন! এ চিঠি কোনো তিরস্কারবার্তা নয়— এ হলো আপনার মমতা লাভের চেষ্টা—কৌশল! আমার হৃদয়-নিভৃতে মর্যাদার ঐ যে আসনটা, সেখানে আপনাকে ছাড়া আর কাউকেই আমি বসাই নি!! প্রায়ই আমি কল্পনা করি— রোজ কেয়ামতে আপনাকে আমি চোখের সামনে দেখতে পাবো। তখন চীৎকার করে করে আপনাকে ডাকতে থাকবো, ডাকতেই থাকবো! নাজাত লাভের আশায় আপনার আস্তিন আঁকড়ে থাকবো!! কতোবার আমি এ-সব মনে মনে কল্পনা করেছি! আমি আপনাকে এখন চিঠিতে যা কিছু লিখলাম, এও আমার মাথায় হঠাৎ করে আসা কোনো বিষয় নয়, আমি বারবার তা কল্পনা করেছি এবং এখন অসংকোচে আপনাকে বলেছি!'

শায়খ নদভী'র প্রতি মানুষের এই যে ব্যাপক ভালোবাসা— যা সূচিতও হয়েছে আল্লাহ্‌র জন্যে, আর যা অব্যাহতভাবে হৃদয়ে লালনও করা হচ্ছে শুধু আল্লাহ্‌র জন্যে এবং যার পরিধি দিনে দিনে বিস্তৃত থেকে বিস্তৃততরও হচ্ছে শুধুই আল্লাহ্‌র জন্যে— তা আসলে কী প্রমাণ করে? তা

প্রমাণ করে যে, আল্লাহ্র কাছে রয়েছে তাঁর বিশেষ মর্যাদা। তিনি আল্লাহ্র নৈকট্যপ্রাপ্ত বান্দা। নইলে মানুষের ভালোবাসা তো এমনি এমনি হতে পারে না! নিশ্চয়ই এর অন্তরালে লুকিয়ে থাকে সুনির্দিষ্ট কার্যকারণ। সৃষ্টির ভাষা— সে যে সত্যের কলম! এই ভাষায় তো প্রকাশ পাবেই সত্যের মহিমা ও জয়গান! রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাই বলেছেন

أنتم شهداء لله في الأرض

'তোমরা পৃথিবীতে আল্লাহ্র সাক্ষী বা প্রতিনিধিত্বকারী।'[১]

বুখারী ও মুসলিম শরীফে হযরত আবু হোরায়রা রা. থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, আল্লাহ্র রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

إن الله تبارك وتعالي إذا أحبَّ عبدا، نادي جبريل: إن الله قد أحبَّ فُلانا، فأحِبَّه، فيحبه جبريلُ، ثم ينادي جبريلُ في السماء: إن الله قد أحبَّ فُلانا، فأحِبُّوْه، فيحبه أهل السماء، ويُوْضَعُ له القَبول في أهل الأرضِ.

'আল্লাহ যখন কোনো বান্দাকে ভালোবাসেন, জিবরীল আ.কে ডেকে বলেন : নিশ্চয়ই আল্লাহ অমুক বান্দাকে ভালোবেসেছেন, তুমিও তাঁকে ভালোবাসো। তখন জিবরীল আ. তাকে ভালোবাসেন। অত:পর আকাশে এই ঘোষণা ছড়িয়ে দেন : নিশ্চয়ই আল্লাহ অমুক বান্দাকে ভালোবেসেছেন। তোমরাও তাকে ভালোবাসো। তখন আকাশের সবাই তাকে ভালোবাসে। আর তখন পৃথিবীর মানুষের কাছেও তার গ্রহণযোগ্যতা প্রতিষ্ঠিত হয়।'[২]

শায়খ নদভী ছিলেন পৃথিবীব্যাপী গ্রহণযোগ্য ব্যক্তিত্ব। তাঁকে যেমন ভালোবেসেছেন সর্বস্তরের উলামায়ে কেরাম তেমনি ভালোবেসেছেন আল্লাহ্র পথের দাঈ ও পুণ্যবান্দারা। তবে হৃদয় যাদের কপটতার অন্ধকারে আচ্ছন্ন, তাদের কথা আলাদা। তারা তাঁকে অপছন্দ করলে.. দুশমন ভাবলে অবাক হওয়ার কিছু নেই। প্রকৃত সত্য এদের কাছে কখনোই ধরা পড়ে না, আড়াল হয়েই থেকে যায়। হিংসা-বিদ্বেষ ও অজ্ঞতার অন্ধকারেই ওদের নিত্য বসবাস।

বরং সত্য ও বাস্তবতা হলো— মানুষ শায়খ নদভীকে ভালোবেসেছে এবং সম্মানও করেছে। কতো মানুষই তো আছে, যারা শুধু সম্মানই পায় কিন্তু ভালোবাসা পায় না। অনেকে আবার ভালোবাসা পায় কিন্তু সম্মান পায়

---

১. বুখারী, মুসলিম- আল-লু'লু' ওয়াল মারজান

২. বুখারী ও মুসলিম, আল-লু'লু' ওয়াল মারজান

না। কিন্তু এমন মানুষ আপনি ক'জন পাবেন, যাঁদেরকে আপনি যুগপৎ ভালোও বাসেন আবার হৃদয়ের উষ্ণতা ঢেলে সম্মানও করেন!

শায়খ নদভী ছিলেন আরব বিশ্বে .. ইসলামী বিশ্বে ভালোবাসানন্দিত ও সম্মানবিধৌত তেমনই এক ব্যক্তিত্ব। মুসলিম উম্মাহ্‌র হৃদয়-নিভৃতে তাঁর জন্যে সংরক্ষিত ছিলো ভালোবাসা ও সম্মানের ঈর্ষণীয় আসনটি। যদি একজন মাত্র ব্যক্তিত্বের ব্যাপারে মুসলিম উম্মাহ্‌র ঐকমত্যের প্রশ্ন আসতো তাহলে আমার তো মনে হয় সেই গর্বিত ব্যক্তিটি শায়খ নদভীই হতেন! কিন্তু এটা সম্ভব না। মতবিরোধে লিপ্ত হওয়া মানুষের স্বভাবজাত বিষয়। এ থেকে সহজে বেরিয়ে আসা সম্ভব না।

যাই হোক; শায়খ নদভী'র এই ব্যতিক্রমী আন্তর্জাতিক ব্যক্তিত্বের কারণেই আরব-আজম সর্বত্র তিনি নন্দিত ও প্রশংসিত হয়েছেন। মাননীয় ও বরণীয় হয়েছেন। বিশ্বের বিভিন্ন সংস্থা, সংগঠন ও পরিষদের তিনি ছিলেন সদস্য। সবাই তাঁকে সদস্য পদ দেয়ার জন্যে ছিলো লালায়িত। শুধু সদস্যপদ বলছি কেনো? অনেক সংস্থার তিনি সভাপতিও ছিলেন। এ-সব আল্লাহ্‌র দান ও অনুগ্রহ। সবাই তা পায় না। সবাইকে তা দেয়াও হয় না। ইরশাদ হচ্ছে :

يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ.

'যাকে চান কেবল তাকেই আল্লাহ তাঁর রহমত দ্বারা আচ্ছাদিত করেন। তিনি মহা অনুগ্রহশীল।' -আলে ইমরান:৭৪

ভারতবর্ষে শায়খ নদভী'র অবস্থান ও মর্যাদা

হ্যাঁ .. সারা বিশ্বের মুসলমানদের হৃদয়েই উচ্চ মর্যাদায় অধিষ্ঠিত ছিলেন শায়খ নদভী। তাঁর দুর্লভ গুণের কারণে। যে সব গুণ সচরাচর দেখাই যায় না পরিপূর্ণরূপে কারো মাঝেই— আল্লাহ্‌র মনোনীত বিশেষ বান্দাগণ ছাড়া।

পাঠক! এতোক্ষণ যা বললাম, তা ভারতবর্ষের বাইরে তাঁর অবস্থান ও মর্যাদার কথা। এবার বলবো ভারতবর্ষের কথা। শায়খ নদভীর প্রিয় দেশের কথা। জন্মভূমির কথা। ভারতের কোটি কোটি মুসলমানের চোখে তিনি কেমন ছিলেন— সে কথা। ভারতের কোটি কোটি মুসলমানের হৃদয়ে-অনুভবে-চিন্তায়-চেতনায় কতোটা জায়গা করে নিতে পেরেছিলেন তিনি? সংখ্যায় ইন্দোনেশিয়ার পরই যাদের অবস্থান? এক কথায় বলা যায়,

সীমাহীন। অনেক, অ-নে-ক। তিনি ছিলেন তাদের চোখের তারার মতো। হৃৎপিণ্ডের মতো। তাঁর হৃদয় সদা স্পন্দিত হতো সেই তাদের ভালোবাসায়। এই ভালোবাসায় সিক্ত হতে-হতে তাঁকে গ্রহণ করতে হয়েছে ভারতের মুসলমানদের বিভিন্ন সংস্থা-সংগঠন-পরিষদের সভাপতিত্ব।

ভারতের মুসলমানদের অধিকার ও ধর্মীয় মূল্যবোধ-এর তিনি ছিলেন অতন্দ্র প্রহরী। ভারতের বুকে মুসলমানরা তাদের ধর্মীয় পরিচয় নিয়ে সগৌরবে .. সমহিমায় বেঁচে থাকবে— এ ব্যাপারে তিনি ছিলেন সদা তৎপর। মুসলমানদের সার্থবিরোধী যে কোনো পদক্ষেপ— তাঁকে যেমন বিচলিত করতো তেমনি প্রতিবাদী করে তুলতো।

একবারের ঘটনা। ভারত সরকার 'মুসলিম পার্সোনাল ল' তে হস্তক্ষেপ করলো। 'তালাক' সংক্রান্ত মাসআলায় ইসলামী আইন ও বিধানের সাথে সাংঘর্ষিক আইন প্রণয়ন করে তা মুসলমানদের উপর চাপিয়ে দেয়ার চেষ্টা করলো। তখন শায়খ নদভী আর চুপ থাকতে পারলেন না। পাহাড়ের অবিচলতা ও দৃঢ়তা নিয়ে সামনে এসে দাঁড়িয়ে গেলেন। প্রশাসনকে লক্ষ্য করে বললেন : 'না! এটা মেনে নেয়া যায় না! এটা কিছুতেই হতে পারে না!!'

সরকারের এই অন্যায় নীতির বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে তিনি মুসলমানদেরকে ডাক দিলেন। নিজে ছুটে গেলেন আরব বিশ্বে। বক্তৃতায় বক্তৃতায় গর্জে উঠলেন সিংহের ন্যায়। সহজ-সরল স্বভাবের আর নম্র-বিনীত ও কান্না-বিগলিত হৃদয়ের মানুষটি হঠাৎ পরিণত হলেন মহা লড়াকু শাহ সওয়ারে এবং তীক্ষ্ণ ধারালো তলোয়ারে। সুতরাং এই 'না!' প্রশাসনের সর্বোচ্চ মহলে— হৃৎপিণ্ডে তোলপাড় সৃষ্টি করলো, কাঁপন ধরিয়ে দিলো।

শায়খ নদভী'র তখনকার এই অবস্থানের কথা ভাবতে ভাবতেই আমার মনে পড়ে গেলো মুরতাদ ও যাকাত অস্বীকারকারীদের বিরুদ্ধে হযরত আবু বকর রা. এর দৃঢ় ও অবিচল অবস্থানের কথা। তিনিও তো ছিলেন নরম স্বভাবের, দয়ালু হৃদয়ের ও অশ্রুময় চোখের—কান্না-প্রবণ মানুষ! কিন্তু প্রয়োজনের মুহূর্তে ঠিকই তিনি ঝলসে উঠেছিলেন। ইতিহাস বলে— সেদিন মুরতাদ ও যাকাত অস্বীকারকারীদের বিরুদ্ধে তাঁর অমর-অক্ষয়-অব্যয় ঘোষণা ইতিহাসের মোড়ই পাল্টে দিয়েছিলো—

أَيُنْقَصُ الدِّيْن وأنا حيٌّ؟

'আমি বেঁচে থাকতে দীনের ক্ষতি হবে!!'

যাই হোক; শায়খ নদভীও তাঁর এই লড়াইয়ে হযরত সিদ্দীকে আকবরের মতো বিজয়ী হলেন। প্রশাসন বাধ্য হলো এই অন্যায় সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করে নিতে।

শুধু মুসলমানদের কথা বলছি কেনো? পৌত্তলিক হিন্দুরাও তাঁকে পছন্দ করতো। শ্রদ্ধা করতো। তাদের চোখে তিনি ছিলেন এক মহা সাধক পুরুষ। আর নেতৃস্থানীয় হিন্দুরা এবং প্রশাসনের কর্মকর্তারা তাঁকে শ্রদ্ধা করতো তাঁর মহত্ত্বে আকৃষ্ট হয়ে এবং দেশের জন্যে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে অনেক সুনাম ও সুখ্যাতি বয়ে আনার জন্যে। আমি নিজেই এর সাক্ষী। নদওয়াতুল উলামা'র ৮৫ সালা আন্তর্জাতিক মহা সমাবেশে হাজার হাজার হিন্দু উপস্থিত হয়েছিলো। একটি শীর্ষস্থানীয় ইসলামী বিদ্যাপীঠের অনুষ্ঠানে এতো বিশাল সংখ্যায় অংশ নিতে কোন্ জিনিস তাদেরকে উদ্বুদ্ধ করেছিলো? নিঃসন্দেহে শায়খের মহত্ত্ব, শায়খের প্রতি তাদের শ্রদ্ধাবোধ!

ভারতের বুকে শায়খের অবস্থান ও মর্যাদা সম্পর্কে নূর আলম আল-আমিনী বলছেন

'হযরত মাওলানা'র ইন্তেকালের পর সারা হিন্দুস্তানে এমন একজন আলেম ও ইসলামী নেতা খুঁজে পাওয়াও মুশকিল ছিলো, যাঁকে প্রশাসন মুসলমানদের সাথে সংশ্লিষ্ট কোনো বিল পাস বা আইন প্রণয়নের আগে হিসাব করবে একবার নয়— শতবার। একবারের ঘটনা। উত্তর প্রদেশের সরকারী স্কুলগুলিতে ছাত্রদের জন্যে— যাদের ভিতরে অনেক মুসলমান ছাত্রও ছিলো— 'বন্দে মাতরম' (ভারতের জাতীয় সঙ্গীত) দিয়ে প্রাত্যহিক পাঠসূচনা বাধ্যতামূলক করে এক আইন জারি করা হলো। অথচ এই 'বন্দে মাতরম' ছিলো ইসলামী আকিদা-বিশ্বাসের সাথে মারাত্মক সাংঘর্ষিক একটি সঙ্গীত। ঠিক তখনই শায়খ আবুল হাসান আলী নদভী রহ. জ্বলে উঠলেন। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীকে পরিস্কার ভাষায় জানিয়ে দিলেন: 'ভারতের মুসলমানরা তাদের সন্তানদের উপর ইসলামী আকিদা বিরোধী এই সঙ্গীত চাপিয়ে দেয়া হলে জীবনের বদলে মৃত্যুকেই বেছে নেবে!'

প্রশাসনের টনক নড়লো। অবিলম্বে তারা এই আইন প্রত্যাহার করে নিয়ে দুঃখ প্রকাশ করে বললো : ভারতের কোনো নাগরিকের উপর তাদের ধর্মীয় আকিদা পরিপন্থী কোনো আইন আমরা কখনোই চাপিয়ে দেবো না।'

* * *

আমি যতোটুকু দেখেছি, সম্পূর্ণ ভারতবর্ষ নিয়েই ছিলো শায়খের ভাবনা বা উদ্বেগ-উৎকন্ঠা। বিশেষত অনাগত ভবিষ্যতে ভারত কোন্ পথে যাবে, তা শায়খকে বড়ো ভাবাতো। কেননা, তাঁর দৃষ্টিতে এখন ভারত নেতৃত্বশূন্য। এখন নেই মহাত্মা গান্ধী, নেই মাওলানা আবুল কালাম আজাদ, নেই নেহেরু, নেই ইন্দিরাজীও। নেতৃত্বের আসনে এখন চেপে বসেছে কট্টরপন্থী হিন্দুত্ববাদী শাসক গোষ্ঠী। যারা জানে না— ভারত কখন কী চায়। ভারতের কখন কী প্রয়োজন। ভারতে যে পারস্পরিক সম্প্রীতি ও সহমর্মিতা সবচে' বেশি প্রয়োজন, এটা তারা বোঝে না। অথচ বহু-ধর্ম ও বহু-সংস্কৃতির ভারতে নিরাপদ ও নির্বিঘ্ন নগর ও সমাজ জীবনের জন্যে এ ছাড়া আর কোনো বিকল্প নেই। এ জন্যেই শায়খ নদভী অনুদার, ইসলাম বিদ্বেষী ও কট্টর হিন্দুত্ববাদী এই শাসক চক্রের হাতে ভারতকে নিরাপদ মনে করতে পারতেন না এবং সব সময় উৎকণ্ঠায় থাকতেন।

সত্যি, শায়খ আন্তর্জাতিক পর্যায়ে শীর্ষ ইসলামী ব্যক্তিত্ব হওয়া সত্ত্বেও নিজের দেশের কথা মুহূর্তের জন্যেও ভুলে থাকতে পারেন নি। ভুলে থাকতে পারেন নি ধর্ম-বর্ণ-গোত্র নির্বিশেষে ভারতের কোনো মানুষের কথাই। সবার কল্যাণের কথাই ভাবতেন তিনি। সবার সুখের কথাই ভাবতেন তিনি। অথচ মুসলমানরা এখানে সংখ্যালঘু আর হিন্দুরা সংখ্যাগরিষ্ঠ।

শায়খ নদভী'র ইলমী ও দীনি খিদমতের বর্ণিল স্বীকৃতি ঃ
বিভিন্ন সংস্থা ও সংগঠনের সদস্য ও সভাপতির দায়িত্ব পালন
দেশ-বিদেশের বিভিন্ন পুরস্কার

> নদওয়াতুল উলামা'র মহাসচিব ও নদওয়াতুল উলামা পরিচালিত দারুল উলুমের সভাপতি।

> রাবেতায়ে আলমে ইসলামী'র প্রতিষ্ঠাতা সদস্য।

> মক্কাভিত্তিক মসজিদ সংক্রান্ত সর্বোচ্চ পরিষদের সদস্য।

> মিসরভিত্তিক দাওয়াত ও ত্রাণ বিষয়ক সর্বোচ্চ পরিষদের সদস্য।

> নদওয়াতুল উলামা'র ইসলামী গবেষণা একাডেমি ও প্রকাশনা পরিষদের সভাপতি।

> ভারতের দীনি শিক্ষা বিষয়ক সর্বোচ্চ পরিষদের সভাপতি।

> ভারতের মুসলিম পার্সোনাল ল' বোর্ড-এর সভাপতি।

> আজমগড় দারুল মুসান্নিফীন-এর সভাপতি।

> অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ সেন্টারের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি।

> আন্তর্জাতিক ইসলামী সাহিত্য সংস্থার স্বপ্নদ্রষ্টা, প্রতিষ্ঠাতা ও সভাপতি।

> দারুল উলুম দেওবন্দের মজলিসে শূরার সদস্য।

> পাকিস্তান আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের মজলিসে শূরার সদস্য।

> মদিনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের মজলিসে শূরার সদস্য।

> দামেস্ক আরবী ভাষা ফাউণ্ডেশনের সদস্য।

> কায়রো আরবী ভাষা ফাউণ্ডেশনের সদস্য।

> জর্দান আরবী ভাষা ফাউণ্ডেশনের সদস্য।

> জর্দান রাজকীয় ইসলামী গবেষণা পরিষদের সদস্য।

> ইসলামের খিদমতের জন্যে ১৯৮০ সালে বাদশা ফয়সাল আন্তর্জাতিক পুরস্কার লাভ।

> ১৯৮১ সালে কাশ্মির বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সাহিত্যে সম্মানজনক পিএইচডি ডিগ্রী লাভ।

> ১৪১৯ হিজরীর শ্রেষ্ঠ ইসলামী ব্যক্তিত্ব হিসাবে দুবাই সরকারের পুরস্কার লাভ।

> ১৪২০ হিজরীতে ইসলামী গবেষণা ও অধ্যয়নের জন্যে ব্রুনাই সুলতানের পুরস্কার লাভ।

দ্বিতীয় অধ্যায়

সায়্যিদ আবুল হাসান আলী নদভী যখন দাঈ ও দিক-দিশারী

> শায়খ নদভীর দৃষ্টিতে দাঈ'র প্রতিভা ও গুণাবলী

> আল্লামা সায়্যিদ আবুল হাসান আলী নদভীর দৃষ্টিতে দাওয়াতের তত্ত্বকথা ও তার স্তম্ভ

> আকল-বুদ্ধি নয়— শরীয়তে ওহী-ই হলো প্রধান ও মূল

দ্বিতীয় অধ্যায়

আল্লামা আবুল হাসান আলী নদভী'র দৃষ্টিতে দাওয়াতের তত্ত্বকথা

সন্দেহাতীতভাবে এবং অবিসংবাদিতভাবে শায়খ আবুল হাসান আলী নদভী রহ. ইসলামের এক মহান দাঈ (আহ্বানকারী)। ইসলামের দিকে মানুষকে ডেকেছেন তিনি লেখায়-বক্তৃতায়। লিখেছেন শত শত কিতাব। দিয়েছেন অগণিত বক্তব্য। তাঁর বক্তব্যের শ্রোতা ছিলো কখনো প্রাচ্য, কখনো প্রতীচ্য, কখনো আরব, কখনো আজম। অনুরূপভাবে তাঁর গ্রন্থসম্ভারও ছিলো সবার জন্যে। পড়েছে তা প্রাচ্য ও প্রতীচ্য এবং আরব ও আজম। তা থেকে উপকৃত হয়েছে বিশেষ শ্রেণী যেমন সাধারণ শ্রেণীও তেমন। ইসলামের দাওয়াত নিয়ে এক জায়গায় বসে থাকেন নি তিনি। ছুটে গিয়েছেন কতো দেশের কতো মানুষের কাছে। কতো প্রতিষ্ঠানের কতো সেমিনার-সেম্পোজিয়ামে।

তাঁর কিছু কিছু কিতাব বিশ্বময় এতো সাড়া জাগিয়েছে যে, তা দ্বিতীয়বার, তৃতীয়বার, চতুর্থবার বরং অসংখ্যবার পুন:মুদ্রিত হয়েছে। অনূদিত হয়েছে বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন ভাষায়। এটা শুধুই আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ। যাকে চান তাকেই তিনি প্লাবিত করেন অনুগ্রহের এই শীতলধারায়।

প্রিয় পাঠক! এই অধ্যায়ে আমরা তাঁর দাওয়াতী জীবন ও দাওয়াতী দর্শন নিয়ে সংক্ষিপ্ত আলোকপাত করার প্রয়াস পাবো।

* * *

দাঈ'র প্রতিভা ও গুণাবলী

আল্লাহ তাঁকে দান করেছেন বহুমুখী প্রতিভা ও নৈপুণ্য এবং প্রকাশ-যোগ্যতা ও উপস্থাপন-পারদর্শিতা। যা তাঁকে অধিষ্ঠিত করেছে দাওয়াতের ময়দানে এবং দাঈদের ভিতরে শীর্ষ অবস্থান ও শ্রেষ্ঠ মর্যাদা। নমুনা লক্ষ্য করুন একে একে

১. বুদ্ধি ও প্রজ্ঞা

আল্লাহ তাঁকে দান করেছেন বুদ্ধি ও প্রজ্ঞা।

وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْراً كَثِيراً

'যাঁকে আল্লাহ দান করেন হিকমত ও প্রজ্ঞা তাঁকে দেয়া হয় অফুরন্ত মঙ্গল ও কল্যাণ।' -বাকারা: ২৬৯

আল্লাহর পথের দাঈদের জন্যে হিকমত ও প্রজ্ঞা হলো এক কার্যকর ও শক্তিশালী এবং শ্রেষ্ঠ ও সর্বোত্তম মাধ্যম। আল-কুরআনের ভাষায়—

ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ

'তোমার রব-এর দিকে ডাকো হিকমত ও উত্তম উপদেশের মাধ্যমে।
-নাহল: ১২৫

এ জন্যেই আমরা এই প্রাজ্ঞ মানুষটিকে তাঁর প্রজ্ঞার ব্যবহার করতে দেখেছি স্থান-কাল-পাত্র ভেদে। যে সময় যে জায়গায় যে কথাটি বলা দরকার সে সময় সে জায়গায় ঠিক সে কথাটিই তিনি বলেছেন। কঠোরতার জায়গায় হয়েছেন কঠোর— অপ্রতিরোধ্য স্রোতের মতো। নম্রতার জায়গায় দেখিয়েছেন নম্রতার চরম পরাকাষ্ঠা—বরফগলা শীতল পানির মতো। এ-ই ছিলো তাঁর চিরাচরিত অবস্থান— যৌবন থেকে মৃত্যু পর্যন্ত।

২. ব্যাপকভিত্তিক সংস্কৃতি

আল্লাহ তাঁকে দান করেছেন ব্যাপকভিত্তিক সংস্কৃতি। যা একজন দাঈকে তাঁর পয়গাম পৌঁছনোর ক্ষেত্রে পদে-পদে সহযোগিতা করে এবং পথে-পথে পাথেয় যোগায়। প্রতিপক্ষের মুখোমুখি হতে সাহস যোগায় .. ভরসা যোগায়। আমার লেখা একটা কিতাব আছে ثقافـــة الداعيـــة (দাঈ'র সংস্কৃতি) নামে। সেখানে আমি দাঈ'র জন্যে ছয় ধরনের সংস্কৃতিতে গুণবান হওয়ার কথা উল্লেখ করেছি। সে গুলো হলো—

১. الثقافات الدينية (দীনি সংস্কৃতি),

২. الثقافات اللغوية (ভাষাতাত্ত্বিক সংস্কৃতি),

৩. الثقافات التاريخية (ঐতিহাসিক সংস্কৃতি),

৪. الثقافات الانسانية (মানবীয় সংস্কৃতি),

৫. الثقافات العلمية (তত্ত্বজ্ঞান সংস্কৃতি) ও

৬. الثقافات الواقعية বাস্তবভিত্তিক সংস্কৃতি)।

শায়খ নদভী'র মধ্যে আমি এই ছয় রকম সংস্কৃতিরই সম্মিলন লক্ষ্য করেছি। এর মধ্যে ঐতিহাসিক সংস্কৃতিতে তাঁর যে ব্যুৎপত্তি ও সাবলীল পদচারণা, তা তাঁর অন্য সব সংস্কৃতিজ্ঞানকে ছাপিয়ে গিয়েছিলো। যেমনটা

পরিস্কার ফুটে উঠেছে তাঁর প্রথম গ্রন্থের মধ্যে। যে গ্রন্থ তাঁর আগমনের আগেই 'বিশ্বস্ত দূত'-এর ভুমিকায় অবতীর্ণ হয়ে সবার কাছে তাঁর সঠিক পরিচয় তুলে ধরেছিলো। আমি ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين (মুসলমানদের অধঃপতনে বিশ্ব কী হারালো)-এর কথা বলছি। সত্যি কথা বলতে কি, এ-গ্রন্থ ছোট-বড় সবার মাঝে ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি করেছিলো। সবাই এ গ্রন্থের কাছে ঋণী। কেননা এ-গ্রন্থ থেকে উপকৃত হয় নি— এমন দাঈ সম্ভবত খুঁজে পাওয়া মুশকিলই হবে। অনুরূপভাবে তাঁর এই ইতিহাস-সচেতন-সংস্কৃতি আরো ফুটে উঠেছে رجال الفكر والدعوة في الإسلام (ইসলামের চিন্তানায়ক ও দাঈগণ) সিরিজ গ্রন্থে এবং ইসলামের চতুর্থ খলিফা হযরত আলী রা. এর সীরাত-গ্রন্থ المرتضى (আল-মুরতাযা) ও الصراع بين الفكرة الإسلامية والفكرة الغربية في الأقطار الإسلامية (মুসলিম বিশ্বে ইসলামী সভ্যতা ও পাশ্চাত্য সভ্যতার সংঘাত) গ্রন্থেও তা বড়ো চমৎকারভাবে ফুটে উঠেছে।

ঐতিহাসিক সংস্কৃতির গভীরে পৌঁছতে তাকে সহযোগিতা করেছে মূলত চারটি জিনিস:

◆ প্রথমত তাঁর শিক্ষাগত যোগ্যতা ও জ্ঞান-গভীরতা এবং জ্ঞান আহরণের বিস্তৃত পরিধি। যেখানে সু-সমন্বয় ঘটেছে ঐতিহ্যিক (ধর্মীয়) শিক্ষাধারা ও আধুনিক শিক্ষাধারার ভিতরে।

◆ দ্বিতীয়ত আরবী ও উর্দূ সাহিত্যের পাশাপাশি ইংরেজিতে তাঁর সাবলীল পদচারণা।

◆ এ ছাড়া এমন এক ইলমী খান্দানে তাঁর জন্ম ও বেড়ে-ওঠা, যা তাঁকে ইতিহাসের এক একনিষ্ঠ পাঠক ও বিশ্বস্ত বিশ্লেষকে পরিণত করতে সবচে' বেশি সহযোগিতা করেছে। পিতা ছিলেন বিশিষ্ট ইতিহাসবিদ আল্লামা আবদুল হাই আল-হাসানী। তাঁর ঐতিহ্যপ্রেমী কলম থেকে বেরিয়ে এসেছিলো نزهة الخواطر (নুযহাতুল খাওয়াতির)-এর মতো অমর-অক্ষয় ঐতিহাসিক গ্রন্থ! ভারত উপমহাদেশের সারে চার হাজার কীর্তিমান পুরুষকে চিরস্মরণীয় করে রাখার শ্রেষ্ঠ প্রয়াস!! যা লিখতে তাঁর সময় লেগেছিলো সুদীর্ঘ ৩০ বছর!! আর মা খায়রুন নেসা ছিলেন এক মহিয়সী নারী। কুরআনের হাফেজা। বিশিষ্ট কবি ও লেখিকা। দু'টি কবিতা সংকলনসহ তাঁর রয়েছে একগুচ্ছ ঈমান-জাগানিয়া কিতাব।

◆ সর্বোপরি দারুল উলুম নদওয়াতুল উলামা'র ইলমী আঙিনায় সচেতন অভিভাবক ও সুযোগ্য আসাতিযায়ে কেরামের সার্বিক তত্ত্বাবধানে কেটেছে তাঁর শৈশব, কৈশোর ও যৌবন। যা ছিলো ঐতিহ্যিক শিক্ষা-সাংস্কৃতিক ধারা ও আধুনিক শিক্ষা-সাংস্কৃতিক ধারার মিলন-মোহনা। যা পুরনো ঐতিহ্য থেকে তাই গ্রহণ করেছে যা উপকারী এবং আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান থেকে তা-ই স্বাগত জানিয়েছে যা উপযোগী। বলা বাহুল্য; নদওয়াতুল উলামা সমন্বয় সাধন করেছে বুদ্ধিবৃত্তিক ও বর্ণনা পরম্পরাভিত্তিক জ্ঞানের মধ্যে, দীন ও দুনিয়ার মধ্যে, ইলম ও ঈমানের মধ্যে, ঐতিহ্যিক দৃঢ়তা ও আধুনিকমুখিতার মধ্যে এবং মৌলিকত্ব ও সমকালের মধ্যে। লক্ষ্য করুন আল্লামা আলী তানতাভীর ভাষায়—

'এই হলো নদওয়া, যা'র অন্যতম স্লোগান হলো— উপকারী যে কোনো প্রাচীন থেকে উপকৃত হওয়া। ভালো ও উপযোগী হলে যে কোনো নতুনকেও স্বাগত জানানো। হৃদয়ের গভীরে প্রোথিত ঈমান এবং ব্যাপক-বিস্তৃত জ্ঞানের মাঝে সুসমন্বয় করা। লক্ষ ও উদ্দেশ্যের উপর এবং নীতি ও আদর্শের উপর অটল-অবিচল থাকা। স্বকীয়তা ধরে রেখে আধুনিক পদ্ধতি ও পন্থায় বিকাশমানতার দ্বার উন্মোচিত করা। সর্বোপরি যা কিছু ভালো ও কল্যাণকর তা সাদরে গ্রহণ করা এবং যা কিছু মন্দ ও ক্ষতিকর তা বর্জন করা।'

৩. সাহিত্য প্রতিভা

আল্লাহ তাঁকে দান করেছিলেন সাবলীল বর্ণনাধারা ও উন্নত সাহিত্য প্রতিভা। এর পক্ষে সাক্ষ্য দেবেন অকপটে তারাই, যারা পড়েছেন তাঁর লেখা ও রচনা এবং শুনেছেন তাঁর কথা ও বক্তৃতা। সাহিত্যে ছিলো তাঁর তীক্ষ্ণ রুচিবোধ ও সূক্ষ্ম অনুভূতি। তিনি সরাসরি স্বনামধন্য আরব শিক্ষকদের কাছে আরবী ভাষা ও সাহিত্য পড়ার এবং তাঁদের তত্ত্বাবধানে বেড়ে-ওঠার সুযোগ লাভে ধন্য হয়েছিলেন। আর এ-ব্যবস্থার সম্পূর্ণ কৃতিত্ব তাঁর বড় ভাই ডা. আবদুল আলী হাসানী রহ. এর। তিনি বুঝি তাঁর দূরদৃষ্টি দিয়ে দেখতে পেরেছিলেন আগামী দিনের 'আবুল হাসান আলী নদভী'কে! নইলে কেনো তাঁর মনে অমন শিকড় গেড়ে বসেছিলো এ-চিন্তা যে, যে-কোনো মূল্যে আমার ছোট্ট এতিম ভাইটাকে আমি আরব-উস্তাযের কাছে পড়াবো! অথচ অন্য কেউ তখন এটা কল্পনাও করতে পারতো না! এর

পেছনে কী রহস্য লুকিয়েছিলো? কেউ বলতে পারবে না— আল্লাহ ছাড়া। তবে এতোটুকু তো স্পষ্ট যে, আদরের ছোট্ট ভাইটির জন্যে তাঁর এই বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ সীমাহীন সুফল বয়ে এনেছিলো! (হযরত মাওলানার হে গর্বিত বড়ভাই! আপনি আসলেই অনেক বড়! বাপমরা দশ বছরের ছোট্ট ভাইটিকে আপনিই তো ছায়া দিয়ে.. মায়া দিয়ে তিলে তিলে গড়ে তুলেছিলেন আরব-আজমের রাহবার হওয়ার জন্যে! আপনিই তো সেই ছোট্ট বয়সে তাঁকে আরবদের হাতে তুলে দিয়ে তাঁকেও আরবী ভাষা ও সাহিত্যে 'আরব' করে গড়ে তুলেছিলেন!! কী বদলা চাইবো আপনার জন্যে আল্লাহ্র কাছে— শুধু জান্নাত ছাড়া! জান্নাতের নায-নেয়ামত ছাড়া?!

-অনুবাদক)

আরবী ভাষা ও সাহিত্যে তাঁর এই সুপদচারণা ও সুগভীরতার বদৌলতেই তিনি হতে পেরেছিলেন ভারত উমহাদেশ এবং আরবদের মাঝে মিলন-দূত—সেঁতুবন্ধন। আরবদেরকে সম্বোধন করতে সক্ষম হয়েছেন আরবদের ভাষায়। তাদের মতোই প্রাঞ্জল ও সাবলীল উপস্থাপনায়। তাদের মতোই দেখিয়েছেন তিনি এ ভাষায় নৈপুণ্য ও পাণ্ডিত্য। বরং আরব বিশ্বের অনেককেই তিনি এ-ক্ষেত্রে পেছনে ফেলে সামনে চলে গেছেন।

১৯৫১ সালে শায়খের মিসর সফরকালে আমরা প্রথম তাঁর কিছু পুস্তিকার সাথে পরিচিত হই। যা তিনি তখন সাথে করে নিয়ে এসেছিলেন। লক্ষ্য করুন, শিরোনামের ভিতরেই বিষয়বস্তুর আবেদন কেমন জীবন্ত হয়ে উঠেছে!

১. من العالم إلى جزيـرة العـرب—বিশ্বের পক্ষ থেকে আরব-বদ্বীপের কাছে বার্তা,
২. من جزيرة العرب إلى العالم—আরব-বদ্বীপের পক্ষ থেকে বিশ্বের কাছে বার্তা,
৩. دعوتان متنافستان—দু'টি প্রতিযোগিতাকারী দাওয়াত,
৪. بين الحقيقة والصورة—আসল ও নকল,
৫. بين الهداية والجباية—হিদায়াত ও জিবায়াত,
৬. معقل الانسانية—মানবতার দূর্গ।

এ-সব পুস্তিকা পড়ে মুগ্ধ না হয়ে পারি নি। প্রতিটি পুস্তিকার কথা ও মর্ম সাহিত্যের সুরভিতে কী প্রাণময় বাঙ্ময়! শায়খ মুহাম্মদ আল-গাযালী কি এ জন্যেই বলতে বাধ্য হয়েছিলেন এই স্তুতিবাক্য—

"هذا الإسلام لايخدمه إلا نفس شاعرة محلقة، أما النفوس البليدة المطموسة فلا حظ له فيها، ولا حظ لها فيه!"

'যার আছে আকাশের নীলিমায় ছুটে চলা একটা কবি মন, সে-ই তো পারে কেবল এই ইসলামের সেবা করতে! আর মনটা যার হাহাকার করছে বোকা বোকা চিন্তার দৈন্যতায়, ইসলাম তাকে কী দেবে আর সে-ই বা ইসলামকে কী দেবে!'

যদিও এ-সব পুস্তিকা গদ্যের ভাষায় রচিত কিন্তু তাতে সাঁতার কাটছে পদ্যের প্রাণময়তা ও উচ্ছলতা এবং ছন্দের সুরভিধারা ও সাংগীতকতা।

এর কিছুদিন পর আমার পড়ার সুযোগ হয়েছে তাঁর إسماعيات (শোনো হে!)-এর প্রাণস্পর্শী সিরিজ—

إسمعي يا مصرُ! (শোনো হে মিশর!),

إسمعي يا سورية! (শোনো হে সিরিয়া!),

إسمعي يا زهرة الصحراء! (শোনো হে মরুফুল!),

إسمعي يا إيران! (শোনো হে ইরান!)।

সবই স্বচ্ছ ও উচ্ছল সাহিত্যের মুক্তোময় ফোঁটা-ফোঁটা বিন্দুর ক্ষুদে-ক্ষুদে সিন্ধু!!

মিসর থেকে প্রকাশিত এবং প্রখ্যাত লেখক ও দাঈ ড. সাঈদ রামাদান সম্পাদিত মাসিক 'আল-মুসলিমুন' পত্রিকায় বীর মুজাহিদ আহমদ ইবনে ইরফান শহীদ (সায়্যিদ আহমদ শহীদ রহ.) সম্পর্কে তাঁর বর্ণিল চিত্রাঙ্কনও আমি পড়েছি। আরো পড়েছি তাঁর হৃদয়-ছোঁয়া বিভিন্ন প্রবন্ধ, যা পরবর্তীতে তাঁর অনন্য গ্রন্থ الطريق إلي المدينة (মদিনার পথে)-য় সংকলিত হয়েছে এবং যে গ্রন্থের ভূমিকা লিখতে বসে আরব জগতের সাহিত্য তারকা শায়খ আলী তানতাভী লিখেছেন মুগ্ধতা ও আনন্দের রাশি রাশি বিন্দু ছড়িয়ে

'يا أخي الأستاذ أبا الحسن! لقد كدتُ أفْقِدُ ثِقَتِي بالأدب، حين لم أعُدْ أجدُ عند الأدباء هذه النغمة العلْوِيَّةَ ، التي غني بها الشعراءُ، من لدن الشريف الرضي إلي البُرعي، فلما قرأتُ كتابك وجدتُها، وجدتها في نثرٍ هو الشعرُ، إلا أنه بغير نظامٍ.'

(الطريق إلي المدينة، ص12، طبع دار القلم بدمشق)

'প্রিয় ভাই আবুল হাসান!

গদ্য-সাহিত্য নিয়ে আমি বেশ হতাশ হয়ে পড়েছিলাম। গদ্য সাহিত্যের আর কখনো উন্নতি হবে— এ-ভরসাটাই আমি প্রায় হারাতে বসেছিলাম। কেননা আমি খুঁজে পাচ্ছিলাম না গদ্য-সাহিত্যিকদের লেখায় 'এই উন্নত সুরছন্দ'— যা'র মহিমা গেয়ে গেছেন শরিফ রেজা থেকে শুরু করে বুরাঈ পর্যন্ত অনেকেই ..। কিন্তু বিশ্বাস করুন, আপনার এই গ্রন্থটি পড়ে আজ আবার আমি আশায় বুক বাঁধলাম! আপনার এ-গ্রন্থে আমি খুঁজে পেয়েছি গদ্য-সাহিত্যের সেই 'খুঁজে-ফেরা' উন্নত সুরছন্দ। আমি খুঁজে পেয়েছি গদ্যের ভিতরে পদ্যের মহিমা ও বিভূতি! অন্ত্যমিল ছাড়াই যা ছন্দিত, স্পন্দিত, দ্যোতিত ও ঝংকৃত!'
(ভূমিকাঃ মদিনার পথে, পৃষ্ঠাঃ১২, প্রকাশঃ দারুল কলম দামেস্ক)

৪. জীবন্ত হৃদয়

আল্লাহ তাঁকে দান করেছিলেন এমন জীবন্ত হৃদয় ও আবেগ, যা উচ্ছলিত হয়েছিলো আল্লাহ-রাসূলের প্রেম ও ভালোবাসায় এবং দীনের দরদ ও মায়ায়। তাঁর হৃদয়ে ছলছল প্রবাহে প্রবহমান ছিলো— এমন এক ঝরনাধারা যা কখনো শুকিয়ে যায় নি, এমন এক অনলশিখা যা কখনো নিভে যায় নি, এমন এক জ্বলন্ত অঙ্গার যা কখনো ছাইয়ে বদলে যায় নি। এক দাঈ'র জন্যে অবশ্যই প্রয়োজন এমন জীবন্ত হৃদয়ের। ভালোবাসা ও মায়াময় এবং উত্তাপ ও উষ্ণতাময় এমন উচ্ছল আবেগের। উষ্ণতা ছড়ানো যে ভালোবাসায় সবাই ধন্য হবে। আবেগ-মেশানো যে মায়াময়তায় সবাই আপ্লুত হবে। যে থেমে ছিলো, সে হয়ে উঠবে সচল ও গতিময়, যে ঘুমিয়ে ছিলো, সে জেগে উঠবে প্রাণচঞ্চল মুখরতায়, আর হৃদয়টা যাদের পরিণত হয়েছিলো স্পন্দনহীন মৃতপুরীতে, তারা আবার হয়ে উঠবে প্রাণময়-কর্মময়-ছন্দময় নব-গতিতে!

জীবন্ত হৃদয়ের মানুষরা যখন কথা বলেন বা লিখেন, তখন মানব-হৃদয় জেগে উঠে সজীবতায়। সে লেখা ও কথা তখন সরাসরি দোল ওঠায় পাঠক ও শ্রোতা মনের নিস্তরঙ্গ সমুদ্রে।

জীবন্ত হৃদয় থেকে উৎসারিত বাণী প্রবেশ করবে একেবারে হৃদয়ের গভীরে গিয়ে নব-জীবনের বার্তা নিয়ে— এটাই তো স্বাভাবিক! আর যে কথা উচ্চারিত হয় মুখ গহ্বর থেকে তা কখনো হৃদয়ের দুয়ারে কাড়া নাড়তে পারে না, পথেই তা হোঁচট খায়। ফিরে আসে ব্যর্থ হয়ে। এ জন্যে

শায়খ নদভী'র মজলিস ছিলো জীবন্ত ও প্রাণবন্ত। সেখানে বসলে হৃদয়ের পালে হাওয়া লাগতো। তরতর করে এগিয়ে যেতো হৃদয়-নৌকা কাঙ্ক্ষিত মঞ্জিলের দিকে। আরব প্রবাদে তাই বলা হয়—

'ليست النائحة المستأجرة كالثكلي'

'ভাড়া করে-আনা মহিলার বিলাপগাথা আর সন্তানহারা মায়ের শোকতাপ— এক জিনিস নয়।'

এ-জীবন্ত হৃদয়ের অধিকারী যাঁরা, আল্লাহ্‌র স্মরণে সারাক্ষণ থাকেন তাঁরা বিভোর—

প্রচণ্ড ভালোবাসায় .. সীমাহীন আকুলতায়।
কখনো আশার তারায় ছেয়ে যায় তাঁদের হৃদয়াকাশ,
আবার কখনো ভয়ে-ভয়ে কাঁপতে থাকে তাঁদের অন্তরাত্মা।
তাঁরা দুনিয়াকে পেছনে ফেলে .. দূরে ঠেলে দিয়ে—
স্বপ্ন দেখেন শুধু আখেরাতের।
আল্লাহ্‌র করুণাধারায় সিক্ত হওয়ার প্রবল বাসনা—
সাঁতার কাটে আশার দরিয়ায়।
অপরদিকে তাঁরা মুহূর্তের জন্যেও ভুলে থাকতে পারেন না,
বেদনাঘেরা .. দুঃসময়ঘেরা উম্মতকে।
ওদের কল্যাণ-চিন্তায় কাটে তাঁদের দিবস-রজনী—
যেখানেই হোক ওদের আবাস।
যে দেশেই হোক ওদের ঠিকানা।
যে পরিচয়েই হোক ওরা পরিচিত।

এই আবেগই শায়খ নদভীকে বাধ্য করেছিলো ইসলামের মহান কবি আল্লামা ইকবালের কবিতার একনিষ্ঠ পাঠক ও ভক্ত হতে। প্রায়ই তিনি আবেগভরে .. গর্বভরে গেয়ে উঠতেন তাঁর কবিতা পঙক্তি। মনে হতো এ যেনো তাঁরই কবিতা, তাঁরই সৃষ্টি, তাঁরই কথা। এ-তালিকায় আরো ছিলো শায়খ জালালুদ্দীন রুমী'র কবিতা। বিশেষত তাঁর আল্লাহ-প্রেমের কবিতাগুলি উচ্চারিত হতো তাঁর মুখে— সবচে' বেশি। ইসলামের সোনালী অতীতের কীর্তিপুরুষ যাঁরা, হৃদয় ছিলো যাঁদের জীবন্ত ও আল্লাহ্‌র ভালোবাসা-জাগ্রত, সেই পুণ্যাত্মাগণের কথা ও বাণীও ছিলো শায়খ নদভী'র জীবন্ত হৃদয়ের পাথেয়। তাঁদের কয়েকজন হলেন— ইমাম হাসান বসরী রহ., ইমাম গাযালী রহ. ও আবদুল কাদের জিলানী রহ.। আর এই

পুণ্য-কাফেলার নিকট-অতীতের ও একেবারে কাছের মানুষ ছিলেন মুজাদ্দিদে আলফে সানী রহ.।

৫. উন্নত চরিত্র

উন্নত চরিত্র ও সুমার্জিত আচার-আচরণ ছিলো তাঁর ভূষণ। উন্নত চরিত্রের মহিমা গেয়ে আকাবির কাফেলার কেউ হয়ত তাই বলেছিলেন:

'التصوف هو الخلق، فمن زاد عليك في الخلق، فقد زاد عليك في التصوف'

'তাসাওউফই হলো চরিত্র। সুতরাং চরিত্র সুষমায় যে তোমাকে ছাড়িয়ে গেলো, তাসাওউফেও সে তোমাকে ছাড়িয়ে গেলো।'

এর ব্যাখ্যায় ইমাম ইবনুল কায়্যিম 'মাদারিজুস সালিকীন' গ্রন্থে বলেছেন

'بل الدين كله هو الخلق، فمن زاد عليك في الخلق، فقد زاد عليك في الدين.

'বরং পরিপূর্ণ দীনই হলো— চরিত্র। সুতরাং চরিত্র সুষমায় যে তোমাকে ছাড়িয়ে গেলো, সে দীনের ক্ষেত্রেই তোমাকে ছাড়িয়ে গেলো।'

সুতরাং এ-উন্নত চরিত্রে অধিষ্ঠার কারণে আল্লাহ যদি তাঁর বন্ধুর স্তুতি গেয়ে বলে উঠেন—

'وَإِنَّكَ لَعَلي خُلُقٍ عَظِيْمٍ'

'হে নবী! আপনি তো মহান চরিত্রের উপর অধিষ্ঠিত!'

—আল-কলম: ৪

তাহলে অবাক হওয়ার কী আছে?! অপরদিকে খোদ রাসূলও যদি আল্লাহ্র সাথে কণ্ঠ মিলিয়ে বলেন

'إنّما بُعِثْتُ لأُتَمِّمَ صالِحَ الأخْلاقِ أو مَكارِمَ الأخْلاقِ'

'আমি এসেছি উন্নত ও মহান চরিত্রকে পূর্ণতা দিতে।' (ইবনে সা'দ ও বুখারী: আল-আদাবুল মুফরাদ)।

তাহলেও কি অবাক হওয়ার কিছু আছে?!

যারাই মুহূর্তের জন্যে হলেও এসেছেন শায়খ নদভী'র সান্নিধ্যে তারাই অনুভব করেছেন— তাঁর মাঝে এ-উন্নত চরিত্রের মোহন পরশ। তাঁর বাহ্যিক আচার-আচরণ, তাঁর দাওয়াতের আয়না ও স্বচ্ছ প্রতিচ্ছবি। তাঁর বাহির যেমন ভিতরও তেমন। তাঁর প্রকাশ্য আর অপ্রকাশ্য জীবনাচার

একদম একাকার। আমরা তো তাই বিশ্বাস করি! বান্দা সম্পর্কে আল্লাহই ভালো জানেন। আল্লাহ্‌র কাছে যে ভালো সে-ই আসলে ভালো।

মোটকথা; নদভী-চরিত্রের চুম্বকীয় বৈশিষ্ট্য হলো— নম্রতা, উদারতা, দানশীলতা, বীরত্ব, সহৃদয়তা, স্থৈর্য, ধৈর্য, মধ্যপন্থা, বিনয়, দুনিয়াবিমুখতা, ঐকান্তিকতা, সর্ব সততা (আল্লাহর সাথে ও বান্দার সাথে সততার পরিচয় দেয়া), একনিষ্ঠতা, নিরহংকারিতা, আশা, ভরসা, তাওয়াক্কুল, ইয়াকিন, আল্লাহভীতি, আত্মপর্যবেক্ষণ এবং আরো অনেক অনেক আল্লাহমুখী ও মানবীয় গুণাবলী। আসলে এ হলো হাশেমী খান্দানের জান্নাতি পরিবেশে যথার্থ লালন-প্রতিপালনের বরকত।

ذُرِّيَّةً بَعْضُها من بَعْضٍ

'তারা পরস্পর পরস্পরের বংশধর।' –আলে ইমরান: ৩৪

সত্যিকারের দাঈ তিনিই, যিনি মুখের ভাষায় নয়— অবস্থার (অর্থাৎ আচার-আচরণের) ভাষায় প্রভাব ফেলেন মানুষের হৃদয়-মন ও অনুভব-অনুভূতিতে। অবস্থার ভাষায় মানুষ প্রভাবিত হয়— মুগ্ধ-বিস্ময়ে, নিজের অজান্তে। এ-প্রভাব মিশে যায় তার রক্ত-কণিকায়। তার মন ও মননে ছড়িয়ে দেয় সামনে চলার অদম্য স্পৃহা। জানি না, এ-কথাটা কার মুখে উচ্চারিত হয়েছিলো—আমি জানি না, কিন্তু কথাটা বড়ো মূল্যবান। লক্ষ্য করুন :

'حالُ رجلٍ فِي ألفِ رجلٍ أبْلَغُ من مقال ألف رجلٍ فِي رجلٍ'

'একহাজার লোকের মনে একজনমাত্র মানুষের 'অবস্থা' যে প্রভাব বিস্তার করে, একহাজার লোকের 'কথা' একজনমাত্র লোকের মনেও সে প্রভাব ফেলতে পারে না।'

অনেক দাঈ'র সমস্যাটা হয়— এখানেই। কথায়-কাজে তাদের কোনো মিল খুঁজে পাওয়া যায় না। এক মেরুতে অবস্থান তাদের ব্যক্তিগত আচার-আচরণের আর অন্য মেরুতে অবস্থান তাদের দাওয়াতী পয়গামের। তাদের আচরণের দ্বৈততা ফুটে উঠেছে এ আয়াতে

يَا أَيُّهَا الَّذِين آمَنوا لِمَ تَقُولُون مَا لا تَفْعَلُون. كَبُرَ مَقْتاً عِنْدَ اللّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لا تَفْعَلُون.

'হে ঈমানদারগণ! তোমরা যা করো না, তা কেনো বলো? তোমরা যা করো না তা বলা আল্লাহ্‌র কাছে বড়ো ভয়ঙ্কর।' -সাফ: ২-৩

৬. বিশুদ্ধ আকিদা

সর্বোপরি আল্লাহ তাঁকে দান করেছিলেন বিশুদ্ধ আকিদা। আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের আকিদা। শিরকমুক্ত আকিদা। কবরপূজামুক্ত আকিদা। ধর্মের নামে ভিত্তিহীন কুসংস্কারমুক্ত আকিদা। ভারতে যা'র ব্যাপক ছড়াছড়ি। বাজারও যা'র ভীষণ রমরমা। যা ছড়ানোর জন্যে রয়েছে বিভিন্ন বাতিল ফেরকা ও দল। সকাল-সন্ধ্যা যাদের এ-কাজেই ব্যয় হয়। আসলে এদের আকিদা-বিশ্বাসে অনেক হিন্দুয়ানী প্রভাবও শিকড় গেড়ে বসেছে। ব্রেলভীদের কথাই ধরুন; এরা তাসাওউফের কথা বলে— শুধু মুখে মুখে। সত্যিকারের তাসাওউফের সাথে এদের কোনো সম্পর্ক নেই। এদের আকিদা-বিশ্বাস কুসংস্কারে আচ্ছন্ন। এদের ইবাদত-বন্দেগী বিদ'আতে পরিপূর্ণ। এদের চিন্তা-চেতনায় বিরাজ করে অসংলগ্নতা ও অসারতা। আর এদের চরিত্র ও আচার-আচরণে রয়েছে গুচ্ছ গুচ্ছ বৈপরিত্য। যোজন যোজন ফারাক।

কিন্তু শায়খ নদভী ছিলেন দেওবন্দ মাদরাসার আকিদার ধারক বাহক। যা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন আল্লাহওয়ালা বুযুর্গানে দীনের এক মুবারক জামাত। যাঁরা শিরকের অন্ধকার বিদূরিত করেছিলেন তাওহিদের আলো দিয়ে। বাতিলকে প্রতিরোধ করেছিলেন হকের লাঠি দিয়ে। বিদ'আত দূর করেছিলেন সুন্নতের সুষমা ছড়িয়ে আর তাবৎ বৈপরিত্যকে দূর করেছিলেন সুসঙ্গতি ও সুসামঞ্জস্যের ঝলকানি দিয়ে।

দারুল উলুম নদওয়াতুল উলামাও এই দেওবন্দী আকিদার একনিষ্ঠ সমর্থক ও বিশ্বাসী। দেওবন্দ ও নদওয়ার সমন্বয়ে এই আকিদায় সঞ্চারিত হয়েছে নতুন প্রাণ এবং প্রকৃত আকাবেরী চেতনা। সকল পোশাকী অবয়ব ও বিতর্কের উর্দ্ধে যা'র অবস্থান। যেমনটা লক্ষ্য করা যায় দুঃখজনকভাবে কারো কারো মধ্যে।

শায়খ নদভী রহ. এর দৃষ্টিতে প্রকৃত সালফে সালেহীনের আকিদা'র মূল কথা হলো—

নির্ভেজাল তাওহীদ বা একত্ববাদে বিশ্বাস করা,
যাতে থাকবে না শিরকের লেশ ও ছায়া।
আখেরাতের প্রতি গভীর বিশ্বাস,
যাতে চিড় ধরাবে না কোনো দ্বিধা ও সংশয়।
খতমে নবুওয়তের ব্যাপারে দৃঢ় বিশ্বাস পোষণ,

যাতে থাকবে না সংশয়-সন্দেহের কোনো দোলাচল।

কুরআন-সুন্নাহর প্রতি গভীর আস্থা ও বিশ্বাস, এই দৃষ্টিকোণ থেকে যে, আকিদা-বিশ্বাস, জীবন বিধান, আমল-আখলাক ও নীতি-নৈতিকতার ব্যাপারে কুরআন-সুন্নাহ-ই একমাত্র মানদণ্ড।

আল্লামা সায়্যিদ আবুল হাসান আলী নদভী রহ. এর দৃষ্টিতে দাওয়াতের তত্ত্বকথা ও তার স্তম্ভ

আল্লামা সায়্যিদ আবুল হাসান আলী নদভী রহ. এর দৃষ্টিতে দাওয়াতের তত্ত্বকথা ও মর্মবাণী প্রতিষ্ঠিত হয়েছে মোট ২০টি স্তম্ভের উপর। এখান থেকেই তাঁর দাওয়াত উৎসারিত হয়েছে এবং এখানেই আবার ফিরে এসেছে। অর্থাৎ এ গুলিই তাঁর দাওয়াতের মূল উৎস ও ভিত্তি। খুব সংক্ষেপে আমরা তা এখানে উল্লেখ করছি। অবশ্য ভবিষ্যতে আরো বিস্তৃত পরিসরে এগুলো আলোচনার ইচ্ছে আছে, ইনশাআল্লাহ।

১- বস্তুবাদের চ্যালেঞ্জ মুকাবিলায় গভীর ঈমান

শায়খ নদভী রহ. এর দাওয়াতের তত্ত্বকথার এই বিশটি স্তম্ভের প্রথম স্তম্ভটি হলো—

আল্লাহর প্রতি গভীর ঈমান ও বিশ্বাস রাখা এবং তাঁর তাওহিদের অকপট স্বীকৃতি প্রদান করা এভাবে—

তিনিই একমাত্র রব,

তিনিই একমাত্র স্রষ্টা,

তিনিই একমাত্র ইলাহ ও উপাস্য। তিনি একক, অদ্বিতীয়। তাঁর কোনো শরীক নেই।

পরকালের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস ও ইয়াকিন রাখা— প্রতিদানস্থল হিসাবে। অর্থাৎ সেখানে সৎ কাজের জন্যে মানুষকে পুরস্কৃত করা হবে আর বদ আমলের জন্যে সবাইকে শাস্তি পেতে হবে।

হ্যাঁ এই দীপ্ত বিশ্বাস বুকে লালন করে দাঁড়াতে হবে দুনিয়ার অশুভ বস্তুবাদের মুখোমুখি, প্রত্যাখ্যান করতে হবে এর আগা-গোড়া সবটাকেই। কারণ এর অসার ও ঠুনকো দর্শন হলো— 'এ বিশ্বজগতের কোনো স্রষ্টা নেই, কোনো পরিকল্পক ও নিয়ন্তা নেই। মানুষের আত্মা বা রূহ মোটেই আল্লাহ্র সৃষ্টি নয়। পরকাল বলতেও কিছু নেই। স্বাভাবিক নিয়মেই মানুষ

মায়ের পেটে জন্ম নিয়ে মাটির পেটে হারিয়ে যায়। ব্যাস! এখানেই সব শেষ। এরপর আর কোনো পর নেই।'

আল্লাহ তাদের এই অসার ও ঠুনকো দর্শনের কথা আল-কুরআনে এভাবে তুলে ধরেছেন—

وَقَالُوا إِنْ هِيَ إِلاَّ حَيَاتُنَا الدُّنْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ.

'তারা বলে, আমাদের এই পার্থিব জীবনই আসল জীবন (একমাত্র জীবন)। এরপরে আমরা মোটেই পুনরুত্থিত হবো না।'

-আনআম: ২৯

বুনিয়াদি বিশ্বাসগত এ-স্তম্ভটির কথা শায়খ নদভী বিধৃত করেছেন তাঁর অনেক গ্রন্থেই। বিশেষত الصراع بين الإيمان والمادية (ঈমান ও বস্তুবাদের সংঘাত), ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين (মুসলমানদের পতনে বিশ্ব কী হারালো) এবং الصراع بين الفكرة الإسلامية والفكرة الغربية في الأقطار الإسلامية (মুসলিম বিশ্বে ইসলামী সভ্যতা ও পাশ্চাত্য সভ্যতার সংঘাত) গ্রন্থত্রয়ীতে।

২- আকল-বুদ্ধি নয়— শরীয়তে ওহী-ই হলো প্রধান ও মূল

দ্বিতীয় স্তম্ভ হলো— 'ওহী'কে এমন নিরাপদ ও নিষ্কলুষ উৎস হিসাবে গন্য করা, যার মাধ্যমে নির্ধারিত হবে দীন ও শরীয়ত এবং আকিদা-বিশ্বাস ও নীতি-নৈতিকতার মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি। এখানে নবুয়তের নূর পথ দেখাবে আকলের নূরকে। আকল যদি নবুয়তের নূরকে অগ্রাহ্য করে একাকী পথ চলা শুরু করে দেয়, তাহলে আকলের স্খলন ও পতন অনিবার্য। মানুষের বুদ্ধি হলো মুক্ত স্বাধীন ও বল্গাহারা, তার মুখে নবুয়তের নূরের লাগাম না-পরালে তা কখন যে 'কোন্ বনে' ছুটে গিয়ে আত্মহননের পথ বেছে নেবে, তার কোনো ঠিক-ঠিকানা নেই। সাধারণ দর্শন বলুন আর ধর্মীয় দর্শন বলুন কিংবা যুক্তিবিদ্যার কথাই বলুন, নবুয়তের নূর পথ না-দেখালে সবই নিরর্থক প্রমাণিত হবে এবং ব্যর্থ হবে— ইলাহ, বিশ্বজগত, মানব-জীবন সম্পর্কে সঠিক ধারণায় উপনীত হতে। বুদ্ধির ত্রুটি ও অপূর্ণতার সাক্ষ্য দিয়েছেন খোদ ইমাম রাযি ও আমূদীসহ আরো অনেক ইতিহাসখ্যাত দার্শনিকেরাও।

মোটকথা; নবুয়তের নূর ছাড়া কোনো দর্শন ও জ্ঞানই মানুষকে দিতে পারবে না— মুক্তির পথের ঠিকানা। এ-বিষয়টিই শায়খ নদভী স্পষ্ট করে

তুলে ধরেছেন তাঁর একাধিক কিতাবে। বিশেষ করে النُّبُوَّةُ وَالْأَنْبِيَاءُ فِي القرآن (আল-কুরআনে নবুয়ত ও নবী) এবং الــدين والمدنيــة (দীন ও সভ্যতা) গ্রন্থদ্বয়ে। الدين والمدنيــة মূলত যৌবনের প্রারম্ভে প্রদত্ত— তাঁর একটি ভাষণ, যখন তাঁর বয়স ছিলো ত্রিশ।

৩- মহাগ্রন্থ কুরআনের সাথে গভীর সম্পর্ক

তৃতীয় স্তম্ভ হলো— কুরআনের সাথে গভীর ও প্রগাঢ় সম্পর্ক গড়ে তোলা। যে-সম্পর্কের উপর দাঁড়িয়ে নির্দ্বিধ ও ভরাট কণ্ঠে ঘোষণা দেয়া যায় যে—

কুরআনই চিরন্তন ঐশী গ্রন্থ,
কুরআনই ইসলামের শাশ্বত সংবিধান,
কুরআনই মুসলিম উম্মাহর শক্তি ও ক্ষমতার স্তম্ভ,
কুরআনই আকিদা-বিশ্বাসের উৎস,
কুরআনই দীন ও শরীয়তের শিকড়।

এই কুরআনের কিছু দাবি আছে। তিলাওয়াত করতে হবে বিশুদ্ধভাবে। এর অর্থ ও মর্ম অনুধাবনের জন্যে সাধনাও করতে হবে। অনুসরণ করা অবশ্যই জরুরী এর প্রতিটি বিধি-বিধান ও মূলনীতির। এর কোনো আয়াতকেই অবজ্ঞা করা যাবে না, অমান্য করা যাবে না। কুরআন ব্যাখ্যার স্বীকৃত মূলনীতি এড়িয়ে— দেয়া যাবে না এর মনগড়া বিকৃত ব্যাখ্যা। কুরআনের বিকৃত ব্যাখ্যাদানকারীরা পথভ্রষ্ট, বিভ্রান্ত। এ জন্যে শায়খ নদভী রহ. কাদিয়ানীদের বিরুদ্ধে কলম ধরেছিলেন, তাদের কুরআন বিকৃতির অপচেষ্টার জবাবে।

শায়খ নদভী'র কিতাব পড়লেই অনুভব করা যায়— কুরআনের সাথে তাঁর সম্পর্ক কতো নিবিড় ও অচ্ছেদ্য ছিলো। তাঁর কথায়-লেখায়—প্রতিটি ক্ষেত্রেই তিনি কুরআনের আয়াত দিয়ে দলিল পেশ করতেন। স্থান-কাল-পাত্রের সাথে যা দারুণভাবে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতো। কুরআন বোঝার ও অনুধাবন করার এক বিশেষ রুচিবোধ ও সূক্ষ্মানুভূতি ছিলো তাঁর। কুরআন নিয়ে দীর্ঘ সাধনা ও গবেষণাও করেছেন তিনি। তাঁর এই সাধনা ও গবেষণার পথে বর্ণময় চ্ছটা ছড়িয়েছে বিশিষ্ট মুফাস্সির আল্লামা আহমদ আলী লাহুরী রহ. এর বিশেষ ধাচের দরস ও পাঠগুলি। এ জন্যেই তাঁর কলম থেকে বেরিয়ে এসেছে تأملات في ســــــــــــورة الكهــف

(সূরা কাহফ ঃ ভাবনার গভীরে) এবং النُّبُــوَّةُ والأَنْبِيــاءُ فِي القــرآن এর মতো কিতাব, যাতে ফুটে উঠেছে বস্তুবাদ আর ঈমানের চিরন্তন লড়াইয়ের এক দুর্বিনীত চিত্র। এ ছাড়া আরো অনেক কিতাব ও পুস্তিকা রচিত হয়েছে এ বিষয়ে তাঁর কলমে। আর শিক্ষকতা জীবনের একটা উল্লেখযোগ্য অংশই তো তিনি ব্যয় করেছেন কুরআনের একনিষ্ঠ সাধনা ও গবেষণায়— যখন তিনি উস্তাযুত তাফসির ছিলেন!

৪- হাদীস ও সীরাতে নববী'র সাথে গভীর সম্পর্ক

চতুর্থ স্তম্ভ হলো— হাদীসে নববী ও সীরাতে নববী'র সাথে গভীর সম্পর্ক স্থাপন করা। এই দৃষ্টিকোণ থেকে যে, হাদীস হলো কুরআনের সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ এবং সীরাতে নববী হলো কুরআনের বাস্তব ও প্রায়োগিক ব্যাখ্যা। কেননা সীরাতে নববীতে কুরআন উদ্ভাসিত হয়ে ফুটে উঠেছে এমন এক মানুষের মধ্য দিয়ে, যাঁর চরিত্রই হলো কুরআন। হযরত আয়েশা বর্ণিত হাদীসের ভাষায়— كان خلقه القــرآن (তাঁর চরিত্রই ছিলো-কুরআন)। সীরাতে নববীতে ফুটে উঠেছে মহান অনুপম আদর্শ, সাধারণভাবে পৃথিবীর সকল মানুষের জন্যে আর বিশেষভাবে উম্মতে মুহাম্মদী'র জন্যে। সুতরাং কুরআনের আলোকে আলোকোদ্ভাসিত হতে হলে এবং নবীজীর অনুপম আদর্শে আদর্শবান হতে হলে— অবশ্যই সদা বাস করতে হবে সীরাতে নববী'র সবুজ আঙিনায়। এতেই সত্যিকার অর্থে প্রমাণিত হবে কুরআনের প্রতি এবং সীরাতের প্রতি প্রকৃত ভালোবাসা। নইলে শুধু কথায় ও লেখায় কুরআন ও সীরাতকে আবদ্ধ রাখলে কোনোই সার্থকতা নেই। কোনোই মঙ্গল নেই।

ইসলামী জীবনধারায় হাদীসের প্রভাব কী— শায়খ নদভী তাঁর বিভিন্ন লেখায় খুলে-খুলে তা বর্ণনা করেছেন। পাশাপাশি পৃথকভাবে রাসূলের সীরাত নিয়ে লিখেছেন অনবদ্য সীরাত গ্রন্থ—যেমন বড়দের জন্যে তেমনি ছোটদের জন্যে। তাঁর সীরাত গ্রন্থের ভাষায় সাধিত হয়েছে তত্ত্ব ও গবেষণা এবং রাসূলের প্রতি প্রেম-ভালোবাসা ও হৃদয়-নিংড়ানো আবেগ-অনুভূতির এক অপূর্ব সমন্বয়। অর্থাৎ তাঁর সীরাত গ্রন্থে বিদগ্ধ এক গবেষক যেমন খুঁজে পাবে তত্ত্ব-উপাত্ত তেমনি রাসূল-প্রেমে হৃদয় যাদের আকুল ও আবেগ-মথিত, তারাও এখান থেকে পেয়ে যাবে নিজেদের খোরাক।

আসলে গবেষণা ও প্রেমাবেগের ভাষার ভিতরে এই যে সার্থক সমন্বয়, এটা লক্ষ্য করা যায় তাঁর প্রায় সব কিতাবেই। বিশেষত এই সীরাত গ্রন্থে।

৫- আধ্যাত্মিকতার জ্বলন্ত অঙ্গারকে উত্তাপময় করা

পঞ্চম স্তম্ভ হলো— মু'মিনের হৃদয়ে জ্বলজ্বল করে জ্বলে চলেছে আধ্যাত্মিকতার যে অঙ্গার, তাকে আরো উত্তাপময় করা। আরো উষ্ণ করা। নিষ্প্রাণ মাটিতে জীবনের বার্তা পৌঁছে দেয়া। ইসলামী জীবনধারায় আধ্যাত্মিকতার এই গুরুত্বপূর্ণ দিকটিকে গভীরভাবে মিশিয়ে দিয়ে আলোকময়-তাৎপর্যময় করে তোলা। শায়খ নদভী'র ভাষায় যাকে বলা হয়েছে— ربانية لا رهبانية (বৈরাগ্য নয়—চাই রাব্বানিয়াত)। এটি আলোচ্য বিষয়ে তাঁর একটি প্রসিদ্ধ গ্রন্থ। এর নামকরণের পেছনে দু'টি কারণ তিনি উল্লেখ করেছেন

এক. 'তাসাওউফ' শব্দটিকে পাশ কাটিয়ে যাওয়া, কেননা সময়ের অতিক্রমণে এই শব্দটির গায়ে অনেক ময়লা-আবর্জনা লেগে গেছে এবং এর সাথে জুড়ে বসেছে অনেক বাড়তি জিনিস। এমন হয়ই। এটি হয় মূলত বিশুদ্ধ নির্ভেজাল সত্যকে-ঘিরে পরিভাষার তাণ্ডবের কারণে। তা না হলে 'তাসাওউফ' আসলে কী? কী এর মর্ম ও তাৎপর্য? শুধু তাযকিয়া বা আত্মশুদ্ধিই কি নয়? যেটি মুহাম্মদী পয়গামের একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক অংশ? অথবা 'তাসাওউফ' কি নয় সেই 'ইহসান', যা হাদীসে জিবরীলে বিবৃত হয়েছে?

দুই. এ-শিরোনাম নির্বাচনের দ্বিতীয় উদ্দেশ্য হলো— এ-শব্দটিকে ঘিরে বিভিন্ন মত ও পথের সকল বিতর্ক ও অসঙ্গতিকে এড়িয়ে গিয়ে আধ্যাত্মিকতার ইতিবাচক ও আসল উদ্দেশ্যটিকে সামনে নিয়ে আসা। যাতে সকল মতবিরোধ ও বিতর্কের অবসান হয়। কারণ, কেউ বলতে পারবেন না যে তার 'রাব্বানিয়াত'-এর প্রয়োজন নেই। বা 'ইহসান'-এর প্রয়োজন নেই। সুতরাং আধ্যাত্মিকতা হবে সমাজকেন্দ্রিক, মোটেই শুধু ব্যক্তি বা 'নির্দিষ্ট' খানকাকেন্দ্রিক নয়। এ-বিষয়টিই বড়ো সুন্দর করে ফুটিয়ে তুলেছেন বিশিষ্ট আধ্যাত্মিক ব্যক্তিত্ব বাহী আল-খাওলী তাঁর تذكرة الدعاة (দাঈ'র নির্দেশনামা) নামের অমূল্য গ্রন্থে। অর্থাৎ ইতিবাচক রাব্বানিয়াত বা আধ্যাত্মিকতা হলো শুধুমাত্র ইহ-পরকালীন জীবনের তাবৎ

কল্যাণকে কেন্দ্র করে। আরো স্পষ্ট করে বলা যায়— আধ্যাত্মিকতা হলো মু'মিনের জীবনের নিবিড় ও অচ্ছেদ্য অংশ। মু'মিনের জীবন থেকে কখনো আধ্যাত্মিকতা বিচ্ছিন্ন হবে না এবং আধ্যাত্মিকতা থেকেও মু'মিনের জীবন পৃথক হবে না। কেননা আধ্যাত্মিকতার সাঁকো পার হয়েই লাভ করতে হবে জান্নাতের চিরকালীন সাফল্য ও নেয়ামত। আল্লাহর প্রেম-ভালোবাসার অপার্থিব স্বাদ ও মজা।

শায়খ নদভী রহ. এর অমর গ্রন্থ الأركــان الأربعــة (আরকানে আরবা'আ)তেও মুসলিম জীবনধারায় ইসলামের পরিচয়বাহী আল্লাহ-নির্ধারিত ইবাদতের দিকটিকে সীমাহীন গুরুত্ব সহকারে এবং চিত্তাকর্ষক ভাষা ও উপস্থাপনায় তুলে ধরা হয়েছে। নামাজ, রোযা, হজ্ব ও যাকাত সম্পর্কে এবং মানবাত্মায় ও জীবনধারায় সেগুলির প্রভাব সম্পর্কে এ গ্রন্থটিতে এক নতুন দৃষ্টিকোণ তুলে ধরা হয়েছে।

৬- বিনাশ নয়— নির্মাণ, বিভক্তি নয়—ঐক্য

ষষ্ঠ স্তম্ভ হলো— বিনাশের পরিবর্তে নির্মাণ এবং বিভেদের বদলে ঐক্য। শায়খ নদভী সারাটা জীবনই ব্যয় করেছেন এ-পথে। তাঁর আজীবন সাধনা ছিলো ঐক্যের জন্যে নির্মাণের জন্যে। এ ক্ষেত্রে শায়খ হাসানুল বান্না'র সাথে তাঁর বড়ো মিল রয়েছে। তিনিও আজীবন লালায়িত ছিলেন ঐক্য ও নির্মাণের জন্যে। শায়খ হাসানুল বান্না'র ভাষায়—

'نَبْنِي وَلَا نَهْدِمُ، نجْمَعُ وَلَا نَفرِّقُ، نُقرِّبُ وَلَا نُبَاعِدُ.'

'নির্মাণই আমাদের কাজ—ভাঙা নয়। ঐক্যস্থাপনই আমাদের লক্ষ্য— বিভেদ নয়। মানুষকে কাছে টেনে নেয়াই আমাদের আদর্শ— দূরে ঠেলে দেয়া নয়।'

সোনার হরফে লিখে রাখতে ইচ্ছে করে তাঁর এই উক্তিটিও

'نَتَعَاوَن فِيْمَا اتَّفَقْنَا عَلَيْهَا وَيَعْذِرُ بَعْضُنَا بَعْضًا فِيْمَا اخْتَلَفْنَا فِيْه'

'আমরা পরস্পরে ঐকমত্যে পৌঁছতে পেরেছি যে-সব বিষয়ে, তাতে একে অপরকে সহযোগিতা করবো আর মতবিরোধপূর্ণ বিষয় আমরা এড়িয়ে যাবো।'

আগেই বলেছি, শায়খ নদভীও পোষণ করতেন এ-দৃষ্টিভঙ্গি। কারো হৃদয়ে আঘাত করে, কিংবা রক্তক্ষরণ ঘটায়— এমন ধারালো কথা অথবা

বিভেদ ও ফেতনা উস্কে-দেয়া কোনো স্পর্শকাতর বিষয় সব সময় তিনি এড়িয়ে চলতেন। প্রান্তিক বিষয় নিয়ে .. বিরোধপূর্ণ মাসআলা নিয়ে এমন ভূমিকায় অবতীর্ণ হতেন না, যাতে বিভেদ ও বিতর্ক সৃষ্টি হতে পারে।

এর অর্থ মোটেই এ নয় যে, তিনি দীনের কোনো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে শিথিলতা দেখাতেন। কিংবা অন্যায় হতে দেখেও চুপ করে থাকতেন। অথবা ভুল-ত্রুটিকে নীরবে ফুলে-ফেঁপে ওঠার সুযোগ দিতেন। হাশেমী খান্দানের এক সম্মানিত সদস্যের কাছ থেকে এটা কি কল্পনা করা যায়? বরং সত্য উচ্চারণে তিনি ছিলেন নির্ভীক ও নিঃশঙ্ক। অন্যায়-অনাচারের সমালোচনা ও প্রতিবাদও করতেন তিনি দ্ব্যর্থহীন ভাষায়, কিন্তু উত্তম পন্থায়, আদর্শ দাঈ'র প্রজ্ঞায়, উপযুক্ত পরিভাষায়। বিপক্ষকে সত্যের কাছে ফিরিয়ে আনার তীব্র বাসনায়। হৃদয় ছুঁয়ে-যাওয়া উপস্থাপনায়। নমুনা লক্ষ্য করুন

সাহাবীদের শানে শিয়াদের বেয়াদবি ও ধৃষ্টতাপূর্ণ আকিদা-বিশ্বাস ও উক্তির বিরুদ্ধে তিনি صورتان متضا د تان (দু'টি বিপরীতমুখী চিত্র) নামে যে সমালোচনা গ্রন্থটি লিখেছেন, ভাষা তার সংযত, যুক্তি তার আলোকিত, উপস্থাপনা তার হৃদয়গ্রাহী, উদ্দেশ্য তার মহিমান্বিত। ঠিক এই একই পন্থায় তিনি সমালোচনা করেছেন সায়্যিদ কুতব ও মাওলানা আবুল আলা মওদূদী সাহেবেরও— তাঁর التفسـير السـياسـي للإسـلام (ইসলামের রাজনৈতিক ব্যাখ্যা) নামক গ্রন্থটিতে। অবশ্য এ-গ্রন্থের নামের ব্যাপারে আমার একটু আপত্তি ছিলো। কেননা এ নামটিকে কেন্দ্র করে ধর্মনিরপেক্ষতাবাদিরা ইসলামের সামগ্রিকতার বিরুদ্ধে ফায়দা হাসিলের অপচেষ্টা করতে পারে। সে-কথা আমি শায়খকে বলেও ছিলাম। তিনি আমাকে সমর্থনও করেছিলেন।

৭- আল্লাহ্‌র পথের জিহাদে প্রাণ সঞ্চার

সপ্তম স্তম্ভ হলো— আল্লাহ্‌র পথের জিহাদে প্রাণ সঞ্চার করা, নব চেতনা সৃষ্টি করা। মুসলিম উম্মাহর সত্ত্বা ও অস্তিত্বকে রক্ষার জন্যে তাদের মানসিক শক্তিকে দৃঢ় ও সংহত করা। তাদের হৃদয়-মনে দীনি চেতনার নিভু-নিভু অঙ্গারকে নতুন করে জ্বালিয়ে দেয়া। কেননা ইসলাম-বিরোধী-চক্র লিপ্ত রয়েছে জিহাদের জ্বলজ্বলে আলোকে নিভিয়ে দেয়ার চক্রান্তে। সুতরাং উম্মতের সত্ত্বা জুড়ে যে ভীরুতা ও কাপুরুষতা এবং যে হীনমন্যতা ও মানসিক দৈন্যতা বিরাজ করছে অর্থাৎ দুনিয়ার প্রতি ভালোবাসা ও

মৃত্যুভয় বাসা বেঁধেছে, তা বদলে দিতে হবে জিহাদী চেতনা ও বীরত্বের আগুন জ্বালিয়ে জ্বালিয়ে।

জিহাদের এ-চেতনালোক সবচে' বেশি উদ্ভাসিত হয়েছে শায়খ নদভী'র কালজয়ী গ্রন্থ ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين (মুসলমানদের পতনে বিশ্ব কী হারালো) এর পাতায় পাতায় এবং إذا هبت ريح الإيمان (বইলো যখন ঈমানের হাওয়া)-এর ছত্রে-ছত্রে। এ ছাড়া শায়খ নদভী সায়্যিদ আহমদ শহীদ, সালাহুদ্দীন আইয়ূবী ও ইসলামের অন্যান্য বীর সেনাপতি ও সৈনিকদের কথা যখন যেখানেই লিখেছেন বা বলেছেন তখন সেখানেই তাঁর লেখায় ও কথায় টপকে-টপকে পড়েছে জিহাদী চেতনার লাল শোণিতধারা। লেখক-জীবনের একেবারে সূচনাকাল থেকেই তিনি মুসলিম উম্মাহকে দীন ও ঈমানের হিফাজতের জন্যে এবং আল্লাহ্‌র বাণীকে বুলন্দ করার জন্যে জিহাদী চেতনা সৃষ্টিতে ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করে গেছেন। এটা হবেই, কারণ তিনি বালাকুট-সন্তান-এর গর্বিত বংশধর।

৮- ইসলামী ইতিহাস ও তার বীরত্বগাথার পুনর্জাগরণ

অষ্টম স্তম্ভ হলো— ইতিহাসের বিশেষত ইসলামের ইতিহাস ও তার বীরত্বগাথার পুনর্জাগরণ— উম্মতকে গাফলত থেকে জাগিয়ে তোলার জন্যে এবং বৈকল্য-দশা থেকে সচল করে তোলার জন্যে। কেননা ইতিহাস হলো— উম্মতের স্মৃতিভাণ্ডার, শিক্ষা-গ্রহণ-কেন্দ্র ও বীরত্ব-সংরক্ষণ-স্থল। তাই ইতিহাসের সাথে শায়খ নদভী'র সম্পর্ক ছিলো সুগভীর। ইতিহাস নিয়ে ভাবতে বসলে .. লিখতে বসলে জেগে উঠতো তাঁর দুর্লভ সূক্ষ্মানুভূতি। জেগে উঠতো অতীত-গর্ভে সন্তরণমান মহা-ঘটনাবলী বিশ্লেষণের বিরল প্রতিভা। ইতিহাসের মহা সমুদ্রে খুব সচ্ছন্দে তিনি সাঁতরে বেড়াতেন। দক্ষ ডুবুরী হয়ে কুড়িয়ে আনতেন গভীর তলদেশ থেকে ইতিহাসের মণি-মুক্তো-ঝিনুক। এ-সব দিয়েই তিনি মালা গেঁথেছেন কখনো এই المد والجزر في تاريخ الإسلام (ইসলামের ইতিহাসে জোয়ার-ভাটা) গ্রন্থে আবার কখনো এই ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين (মুসলমানদের পতনে বিশ্ব কী হারালো) গ্রন্থে।

তাঁর দৃষ্টিতে ইতিহাস হলো বহু-দিগন্ত-প্রসারিত এবং ব্যাপক বিস্তৃত। সুতরাং ইতিহাস মানে শুধু রাজা-বাদশাদের উত্থান-পতনের কাহিনী নয়

কিংবা শুধু রাজনৈতিক ঘটনা-প্রবাহও নয়, বরং দেশ-জাতি-রাষ্ট্র-উলামা-মুজাদ্দিদ-সংস্কারক ও বুযুর্গানে দীনের জীবনধারা ও কীর্তিগাথাও এই ইতিহাসের অন্তর্ভুক্ত। রাজনৈতিক-সামাজিক-সাংস্কৃতিক-ধার্মিক-ঐতিহ্যিক ও জিহাদিক ইতিহাসও শামিল— ইতিহাসের এই ব্যাপকতায়। তাই ইতিহাসকে তিনি বিশ্লেষণ ও পর্যালোচনা করেছেন এই ব্যাপক অর্থে ও বিস্তৃত পরিসরে। এ-দৃষ্টিকোণ থেকেই তিনি শুধু ইতিহাসের প্রসিদ্ধ বরাতগ্রন্থকেই ইতিহাসের একমাত্র উৎসস্থল মনে করতেন না, বরং পাশাপাশি ধর্ম, দর্শন, সাহিত্য ও অন্যান্য বিষয়ের সমৃদ্ধ গ্রন্থসম্ভারকেও ইতিহাসের উৎস-ভাণ্ডার মনে করতেন।

এ জন্যেই ইতিহাসের সেরা মানুষ যাঁরা, তাঁদের গৌরব ও কীর্তি থেকে তিনি আলো গ্রহণ করতেন প্রেরণা লাভ করতেন। তাঁর এই দৃষ্টিকোণটিই প্রতিফলিত হয়েছে তাঁর এই رجال الفكر والدعوة في الإسلام (ইসলামের চিন্তানায়ক ও দাঈগণ) গ্রন্থ সিরিজে। এ-সিরিজে তিনি বর্ণনা করেছেন যে, মুসলিম উম্মাহর বিগত দিনের ইতিহাস ও ঘটনা পরম্পরা থেকে পরিস্কার ফুটে উঠে যে, সংশোধন ও সংস্কার আন্দোলন হলো— একটি অবিচ্ছিন্ন ও বিরতিহীন ধারা। ফলে এক যুগের অস্তয়নে আরেক যুগের উদয়ন ঘটবেই। এক তারকার তিরোধানে আরেক তারকার আবির্ভাব ঘটবেই। এ-ধারা সব সময় চলমান। এটি ইতিহাসের একটি অমোঘ নিয়ম। তাই বলা যায়; ইতিহাস চলে তার নিজস্ব নিয়মে ও গতিতে। এ-নিয়ম ও গতিতে কোনো ত্রুটি বা অসম্পূর্ণতা নেই, তা থাকলে আছে— ইতিহাস সংকলনের ধারা-পদ্ধতিতে ও বিন্যাস-গাঁথুনিতে।

৯- পাশ্চাত্য মতবাদ ও বস্তুবাদী সভ্যতার সমালোচনা

নবম স্তম্ভ হলো— নব্য জাহেলিয়াতের কঠোর সমালোচনা এবং তার বিরুদ্ধে কঠোর অবস্থান গ্রহণ, যে জাহিলিয়াত পৈশাচিক নগ্নতায় প্রকটিত হয়ে ছড়িয়ে পড়েছে, পাশ্চাত্যের চিন্তা-চেতনার ভাঁজে-ভাঁজে এবং তার বস্তুবাদী সভ্যতার রন্ধ্রে-রন্ধ্রে। পাশ্চাত্য সভ্যতার গতি-প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য এবং রোমান ও গ্রীক সভ্যতাদ্বয় থেকে পাশ্চাত্যের 'বেনিফিশিয়ারী' হওয়ার ইতিহাস— শায়খ নদভী ভালো করেই জানতেন। বিশ্ব ইতিহাসের একজন সচেতন ও সূক্ষ্মদর্শী পাঠক হিসাবে তিনি এও জানতেন যে, রোমান-গ্রীক-

সভ্যতার ভিতর লুকিয়ে আছে পৌত্তলিকতার কী ভয়াবহ প্রভাব এবং বস্তুবাদী প্রবণতা ও জাতীয়তাবাদী উগ্রতা। পাশাপাশি শিক্ষা-দীক্ষা, সমাজ-সংস্কৃতি, ধর্মীয় ও ঐতিহ্যিক মূল্যবোধের ক্ষেত্রে পাশ্চাত্য সভ্যতা ও ইসলামী সভ্যতার মধ্যকার দ্বন্দ্ব-সংঘাত সম্পর্কে শায়খ নদভী'র ছিলো সম্যক অবগতি। এ-সব কিছুর ভিত্তিতেই তিনি পাশ্চাত্য সভ্যতা সম্পর্কে তাঁর মতামত এবং এর নেতিবাচকতার বিপক্ষে তাঁর দৃঢ় ও কঠোর অবস্থান ব্যক্ত করেছেন।

পাশ্চাত্য সভ্যতার কাছে পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণ এবং তার ভালো-মন্দ সবকিছুর উপর আছড়ে পড়ার প্রচণ্ড বিরোধী ছিলেন তিনি। অনুরূপভাবে পাশ্চাত্যকে একেবারে প্রত্যাখ্যান তার সকল উপায়-উপকরণ থেকে ঘৃণাভরে হাত গুটিয়ে নেয়ারও তিনি ছিলেন বিরোধী। এ-ব্যাপারে তাঁর অবস্থান মাঝামাঝি, যা খুবই ভারসাম্যপূর্ণ ও যুক্তিগ্রাহ্য। তিনি মনে করতেন যে, পাশ্চাত্যের সবকিছুই ভালোও নয় আবার মন্দও নয়। সুতরাং পাশ্চাত্য নির্মিত ও আবিস্কৃত অক্ষতিকর আধুনিক জীবনোপকরণ নেয়া গেলেও অবশ্যই বর্জন করতে হবে তার ধর্ম বিদ্বেষী চেতনা-বিশ্বাস ও বল্গাহারা অরুচিকর—গা ঘেন্না-করা জীবন-দর্শন। শায়খ নদভী আরো পরিস্কার ভাষায় বলেছেন : আমাদের ঈমান-আকিদা ও ধর্মীয় আবেগ-অনুভূতির সাথে পাশ্চাত্য সভ্যতার যে অংশটুকু সঙ্গতিপূর্ণ তাই আমরা গ্রহণ করবো আর যে অংশটুকু অসঙ্গতিপূর্ণ তা বর্জন করবো।

বস্তুবাদী সভ্যতার একজন স্পষ্টবাদী কঠোর সমালোচক হিসাবেও আল্লামা ইকবাল ছিলেন শায়খ নদভী'র আদর্শ। এ-সভ্যতার কঠোর সমালোচনা ও তার মুখোশ উন্মোচনে ইকবাল-কবিতার দীপ্তিময় অভিব্যক্তি বড়ো লক্ষণীয়। আমরা আগেও বলে এসেছি, শায়খ নদভী ছিলেন ইকবাল কাব্যের একনিষ্ঠ ভক্ত ও এক অনুরাগী পাঠক।

পাশ্চাত্য সভ্যতা সম্পর্কে শায়খ নদভী বিশেষভাবে আলোকপাত করেছেন الصراع بين الإيمان والمادية (ঈমান ও বস্তুবাদের সংঘাত), ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين (মুসলমানদের পতনে বিশ্ব কী হারালো) এবং الصراع بين الفكرة الإسلامية والفكرة الغربية في الأقطار الإسلامية (মুসলিম বিশ্বে ইসলামী সভ্যতা ও পাশ্চাত্য সভ্যতার সংঘাত) গ্রন্থত্রয়ীতে। এ ছাড়া أحاديث صريحة في أمريكا (আমেরিকায় বসে বলে-যাওয়া কিছু স্পষ্ট কথা) এবং অক্সফোর্ডে

প্রদত্ত তাঁর প্রসিদ্ধ বক্তৃতা الإسلام والغرب (ইসলাম ও পাশ্চাত্য) বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

১০- জাতীয়তাবাদী মতবাদ ও জাহিলী সাম্প্রদায়িকতার সমালোচনা

দশম স্তম্ভ হলো— সমগ্র আরব জাহান ও মুসলিম বিশ্বে জাহেলী যুগের অন্ধ স্বজনপ্রীতি, গোত্রপ্রীতি ও সাম্প্রদায়িকতাকে নতুন করে চাপিয়ে দেয়ার অপচেষ্টায় লিপ্ত জাতীয়তাবাদী মতবাদ ও চিন্তাধারার ধ্বজাধারীদের কঠোর সমালোচনা। কারণ, এই উম্মতকে আল্লাহ ধন্য করেছেন ইসলামী ভ্রাতৃত্বের অপার দৌলত দিয়ে, বিশ্বময় ইসলামের পয়গাম পৌঁছে দেয়ার মহান দায়িত্ব দিয়ে। সর্বোপরি তিনি তাদেরকে মুক্ত ঘোষণা করেছেন সেই সব মানুষ থেকে, যারা মানুষকে ডাকে এ অন্ধ স্বজনপ্রীতি, গোত্রপ্রীতি ও সম্প্রদায়িকতার দিকে, এমন কি তা বাস্তবায়নের জন্যে লড়াই করে করে শেষতক এ-পথে নিজেদের জীবনটাই 'ধ্বংস' করে দেয়।

তাঁকে সবচে' বেশি পীড়া দিতো আরবদের ভিতরও এই জাতীয়তাবাদের জেঁকে বসাটা। অথচ তাঁরাই ইসলামের কল্যাণ-কাফেলা। তাঁরাই ইসলামের পয়গামের ধারক বাহক। তাঁরাই কুরআন-সুন্নাহর মুহাফিজ। তাদের হাত ধরেই ইসলাম 'জাযিরাতুল আরব' থেকে ছড়িয়ে পড়েছিলো বিশ্বময়! শায়খ নদভী রহ. নিজেও এক আরব সন্তান— রক্তে-বংশে-চিন্তায়-চেতনায়-আবেগ-অনুভূতিতে।

এ জন্যেই ইসলামী আকিদা-বিশ্বাস ও চিন্তা-চেতনা বিরোধী এবং মুসলমামানদের ভিতরে বিবাদ ও বিভেদের জীবাণু বিস্তারকারী এ-আরব জাতীয়তাবাদের বিরুদ্ধে তিনি শক্ত অবস্থান নিয়েছিলেন। কট্টরপন্থী এ-আরবরা 'আরব জাতীয়তাবাদ' এর চেতনায় এতোটাই বুঁদ হয়ে গিয়েছিলো যে, তা তাদের লেখায়-বক্তৃতায়-বৈঠকে বড়ো নগ্নভাবে প্রকাশ পেতে শুরু করেছিলো। এমনকি, এরা 'জাতীয়বাদ'-কে এক নয়া 'নবুওয়ত' বা 'দীন'-ই ভেবে বসলো। অথচ এর লক্ষ্য-উদ্দেশ্য থেকে শুরু করে আগা-গোড়া সব কথা ও মূলনীতিই— ইসলামের সাথে ব্যাপক সাংঘর্ষিক। ইসলামের নবীর কালজয়ী আদর্শের সাথে সাংঘর্ষিক।

বড়ো লজ্জার কথা! কী করে এই আরবদের ভিতরে এমন মানসিক বিকৃতি ঘটলো? ইসলামকে পাশ কাটিয়ে .. মুহাম্মদী আদর্শকে অবজ্ঞা করে

কোথায় কী খুঁজছে তারা? অথচ এই মুহাম্মদী আদর্শের বদৌলতেই আল্লাহ আরব জাতিকে সম্মান ও মর্যাদার শীর্ষ চূড়ায় উন্নীত করেছিলেন। দিয়েছিলেন তাদেরকে সঠিক পথের দিশা। আরো দিয়েছিলেন–তাদের বিভেদ ও অনৈক্যকে ভালোবাসা ও ঐক্যে বদলে দিয়ে এবং জাহেলী যুগের ঘুঁটঘুটে অন্ধকার থেকে মুক্ত করে–ইসলামের আলোর দুনিয়ার সন্ধান। এ সব কী করে ভুলে গেলো তারা? এ কেমন অকৃতজ্ঞতা?

এ বিষয়ে শায়খ নদভীর প্রসিদ্ধ কিতাব হলো الإسلام فوق العصبيات والقوميات (ইসলাম— সাম্প্রদায়িকতা ও জাতীয়তাবাদের উর্ধে)।

কিন্তু আরব জাতীয়তাবাদের তিনি কট্টর সমালোচক হলেও আরব বন্ধুদের বড়ো ভালোবাসতেন তিনি। তাদের মর্যাদা, ভূমিকা ও দিক দিশারী–যোগ্যতাকে বড়ো সম্মানের চোখে দেখতেন তিনি। আজীবন তিনি তাদেরকে আহ্বান জানিয়ে গেছেন লেখায়-বক্তৃতায়— ইসলামী জাহানের নেতৃত্ব হাতে তুলে নেয়ার জন্যে। আবার অবতীর্ণ হতে সেই ভূমিকায়, যে ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন মহান বদরী সাহাবী রবইয়্যুবনু আমের রা. মহা প্রতাপধর পরাশক্তি পারস্য সেনাপতি রুস্তমের সামনে। আরবদের শানে তিনি তাঁর কালজয়ী গ্রন্থ ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين (মুসলমানদের পতনে বিশ্ব কী হারালো) এর এক জায়গায় লিখেছেন : 'محمد رسول الله صلي الله عليه وسلم روح العالم العربي' 'মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরব বিশ্বের প্রাণ'।

এ-আরবদের স্তুতি গেয়ে-গেয়ে এবং তাদের কাঁধে অর্পিত দায়িত্বের কথা তাদেরকে মনে করিয়ে দিয়ে-দিয়ে তিনি লিখেছেন দয়া-দরদের কালি দিয়ে এবং নিষ্ঠা-আন্তরিকতার সুরভি ঢেলে ছোট-বড় একগুচ্ছ কিতাব

১. اسمعوها مني صريخة أيها العرب (হে আরব জাতি! কান পেতে শুনো আমার কথা!),

২. العرب والإسلام (আরব জাতি ও ইসলাম),

৩. الفتح للعرب المسلمين (মুসলিম আরবদের বিজয়গাথা),

৪. اسمعي يا مصر (শোনো হে মিশর!),

৫. اسمعي يا سورية (শোনো হে সিরিয়া!),

৬. اسمعي يا زهرة الصحراء (শোনো হে মরু-পুষ্প!),

৭. كيف ينظر المسلمون إلى الحجاز وجزيرة العرب (হিজাযভূমি ও আরব-বদ্বীপের কাছে মুসলমানদের প্রত্যাশা)

৮. كيف دخل العرب التاريخ (আরব জাতি যখন ইতিহাসের স্রষ্টা)

৯. العرب يكتشفون أنفسهم (আরবদের আত্মোদ্ভাবন)

১০. تضحية شـــــــــــــــباب العرب (আরব তারুণ্যের ত্যাগ-দীপ্তি)।

১১- খতমে নবুওয়ত আকিদার পক্ষে দৃঢ় অবস্থান ও কাদিয়ানী ফেতনার মুকাবিলা

এগারতম স্তম্ভ হলো— খতমে নবুওতের আকিদার পক্ষে দৃঢ় অবস্থান গ্রহণ। খতমে নবুওতের আকিদা— শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে চলে-আসা সর্বকালের মুসলমানদের অতি গুরুত্বপূর্ণ ও (জরুরতে দীনের অন্তর্ভূক্ত) বাধ্যতামূলক একটি আকিদা। যাতে সংশয়-সন্দেহের বিন্দুমাত্র অবকাশ নেই। কিন্তু খতমে নবুওতের এ-আকিদা ইসলামের একটি বুনিয়াদি আকিদা হওয়া সত্ত্বেও এটিকে দৃঢ়ভাবে সমর্থন করা এবং জনসমক্ষে তুলে ধরার প্রশ্নটি তখনই দেখা দেয়, যখন এর বিরুদ্ধে কাদিয়ানী সম্প্রদায় তাদের বিধ্বংসী আকিদা নিয়ে মাঠে নামে। যে আকিদাকে শায়খ নদভী নবুওতে মুহাম্মদীর বিরুদ্ধে সুস্পষ্ট বিদ্রোহ হিসাবে গন্য করেন।

এ বিষয়ে বিভিন্ন প্রবন্ধ-নিবন্ধ এবং ছোট বড় অনেক গ্রন্থই লেখা হয়েছে, কিন্তু সম্প্রদায়টির এ-বিধ্বংসী আকিদার বিরুদ্ধে নিজে কিছু লেখার তীব্র একটা তাগিদ ও দায়িত্ব অনুভব করছিলেন তিনি। এ-দায়িত্ববোধ থেকেই প্রথমে লিখলেন খতমে নবুওতের গুরুত্ব ও তাৎপর্য সম্পর্কে النبـــوة والأنبياء (নবুওত ও নবী) নামক গ্রন্থের النبي الخاتم والدين الكامــل (শেষ নবী ও পরিপূর্ণ দীন) অধ্যায়টি। এখানে তিনি খতমে নবুওতকে বিশ্ব মানবতার সম্মান হিসাবে অভিহিত করেন। কেননা খতমে নবুওত মানবতাকে পূর্ণতায় পৌঁছে দিয়েছে এ-ঘোষণার মাধ্যমে যে, ইসলামই একমাত্র পরিপূর্ণ জীবন ব্যবস্থা। ইসলামকে পূর্ণতা দানের জন্যে আর কোনো নতুন নবীর আগমনের প্রয়োজন নেই। বরং ইসলামের শাশ্বত বিধি-বিধান ও নীতিমালার আলোকে উম্মতের প্রাজ্ঞ উলামায়ে কেরাম ও বিদগ্ধ গবেষকেরাই ক্রমবিকাশমান সমাজ-সভ্যতার অব্যাহত চাহিদা ও দাবি

পূরণের জন্যে দীনের পুঙ্খানুপুঙ্খ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ দিয়ে যাবেন। সুতরাং 'খতমে নবুওত' নবুওতের দরোজা চিরতরে বন্ধ করে দিয়েছে এবং নবুওতের মিথ্যা দাবিদার এই ভন্ডদের প্রকৃত চেহারা প্রকাশ করে দিয়েছে।

এ-বিষয়ে একটি শিশুতোষ সীরাতগ্রন্থও লিখেন তিনি سيرة خاتم النبيين (শেষ নবীর জীবন-কাহিনী) নাম দিয়ে। কিন্তু এতেও শায়খ নদভী অতৃপ্তিতে ভুগছিলেন। ফলে বিষয়টির গুরুত্ব বিবেচনা করে আরো বিস্তৃত পরিসরে লিখলেন: القادياني والقاديانية (কাদিয়ানী সম্প্রদায় ও কাদিয়ানী মতবাদ)। এই গ্রন্থে তুলে ধরা হয়েছে গোলাম আহমদ কাদিয়ানী ও তার মতবাদের কথা, ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদের ছত্রছায়ায় তার বেড়ে-ওঠার বৃত্তান্ত এবং তার সগর্ব আত্মস্বীকৃতির কথা। আরো তুলে ধরা হয়েছে ইসলামী জিহাদের শানে তার ধৃষ্টতাপূর্ণ মন্তব্যের কথা এবং মুসলমানদেরকে ইংরেজ আনুগত্যের প্রতি তার আহ্বান জানানোর কথা।

শায়খ নদভী স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন : কাদিয়ানীদের সাথে আমাদের যে দ্বন্দ্ব— তা দীনের বিরুদ্ধে দীনের দ্বন্দ্ব, উম্মতের বিরুদ্ধে উম্মতের দ্বন্দ্ব। (অর্থাৎ আমাদের দীন হিসাবে ইসলামের সাথে এবং উম্মত হিসাবে মুসলমানদের সাথে তাদের কোনো সম্পর্ক নেই।) এরা কুরআন বিকৃত করেছে। আরবী ভাষাকে অপমান করেছে।

আলোচ্য বিষয়ে শায়খের এই গ্রন্থটি একটি উৎসগ্রন্থ, যা সাজানো হয়েছে খোদ কাদিয়ানীদের উৎসগ্রন্থের বরাত টেনে-টেনে।

১২- বুদ্ধিবৃত্তিক ধস প্রতিরোধ

দ্বাদশ স্তম্ভ হলো— বুদ্ধিবৃত্তিক ধস প্রতিরোধ করা, যার ভয়াবহতা ব্যাপক আকারে এবং বিপজ্জনকভাবে উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে আরব ও ইসলামী দুনিয়ায়, বিশেষ করে আধুনিক শিক্ষিত তবকায়। শায়খ নদভী এই সর্বনাশা ধস ঠেকানোর জন্যে ঠিক সে ভাবেই কলম ধরলেন যেভাবে ধর্মীয় ধস—কাদিয়ানী ফেতনা প্রতিরোধের জন্যে কলম ধরেছিলেন। (উল্লেখ্য যে, কাদিয়ানীদেরকে ভারত উপমহাদেশের উলামায়ে কেরাম সর্ব সম্মতিক্রমে অমুসলিম সংখ্যালঘু হিসাবে ঘোষণা দিয়েছেন।)

এ-বুদ্ধিবৃত্তিক ও সাংস্কৃতিক ধস প্রতিরোধের জন্যে 'কথা ও লেখা'র অস্ত্র নিয়ে শায়খ নদভী ময়দানে অবতীর্ণ হলেন। না-হয়ে উপায়ও ছিলো না। কারণ—

এ ধস— বড়ো বিপজ্জনক ও ধ্বংসাত্মক ধস।

এ ধস— মুসলিম উম্মাহর দেহ থেকে
খাবলে-খাবলে চামড়া উঠিয়ে নেয়ার ধস।

এ ধস— মুসলিম উম্মাহকে বে-দীন করার ধস।

এ ধস— মুসলিম উম্মাহকে ঐতিহ্য-বিমুখ করার ধস।

এ ধস— মুসলিম উম্মাহর আবেগ-অনুভূতি
ও চিন্তা-চেতনার সবুজ পৃথিবীর মুখে..
সন্দেহের কালো পর্দা টেনে দেয়ার ধস।

এ ধস— মুসলিম উম্মাহকে বিজাতীয় সভ্যতা-সাংস্কৃতিক আগ্রাসনের
মোহনীয় ইন্দ্রজালে..
শেকল-ছাড়া বন্দি করে-ফেলার ধস।

এ ধস— মুসলিম উম্মাহকে নিয়ে যেতে চায় সে পথে..
যে পথ আঁধারে ঢাকা .. কাঁটায় ছাওয়া.. পাপে ভরা..
অমানবিকতায় ঠাসা।

এ ধস— মুসলিম উম্মাহকে নিয়ে যেতে চায় সে-উৎসধারার দিকে..
যে ধারা পাপপঙ্কময় কূটিলতায় ঢাকা,
সুকুমারবৃত্তিনাশক আবিলতায় আচ্ছন্ন।

এ ধস— ইঙ্গ-মার্কিন অক্ষশক্তির গভীরমূল নিরবচ্ছিন্ন সুপরিকল্পিত মুসলিম-চেতনা-বিনাশী এক ভয়ঙ্কর ধস।

এ-ধসেই হারিয়ে গিয়েছিলো— শত বছরের তিল-তিল করে গড়ে-তোলা অনেক মুসলিম সভ্যতা। যেমন আন্দালুস ও তুর্কী।

অথচ এ-ধসে আক্রান্ত হওয়ার কোনো যুক্তি নেই। মুসলিম উম্মাহর নিজস্ব ভুবনেই রয়েছে আলোকিত দিগন্ত, এমন পূত পবিত্র উৎসধারা, যা সদা উৎসারণ করে যাচ্ছে হিদায়াত ও আলোর পুণ্যধারা। রহমত ও বরকতের ফল্গুধারা। নাজাত ও মুক্তির অমিয়ধারা। হ্যাঁ.. এ-ধারাই— কুরআন সুন্নাহর ধারা। সকল ধারার সেরা ধারা। শ্রেষ্ঠ ধারা। তাহলে এমন ধারা ছেড়ে কেনো মুসলমানরা দুশমনের-দেখানো ধারার দিকে ছুটে যাবে?

তারপর ভেসে যাচ্ছে? কেনো তারা ঐ-ঔন্দ্রজালিক জালে আটকা পড়বে? কেনো তারা ঐ-মরীচিকার পেছনে ছুটে বেড়াবে?

কিন্তু কে তাদেরকে ঠেকাবে?

কে তাদেরকে বুঝাবে?

কে সামনে এসে বলবে :

এটাই আসলে আলো আর ওটা মূলত অন্ধকার?!

তিনি শায়খ নদভী!

তিনি ছাড়া আর কে আছে মুসলিম উম্মাহর?!

রুখে দাঁড়ালেন তিনি।

পাহাড়ের দৃঢ়তা নিয়ে।

ফেনিলোত্তাল সমুদ্রের গর্জন নিয়ে।

পূর্ব পুরুষ হযরত আলী হায়দারের সেই 'হায়দারী হাঁক' নিয়ে।

কখনো কলমকে শান দিলেন।

কখনো যবানকে শান দিলেন।

কখনো হিকমত ও প্রজ্ঞার হাতিয়ার তুলে নিলেন।

এ-ভাবে লড়তে-লড়তে এই হঠাৎ-আগত আগ্রাসী ধসের বিরুদ্ধে— তিনি বিজয় লাভ করলেন। উন্মোচিত হলো রহস্য। ফাঁস করে দিলেন তিনি এই বুদ্ধিবৃত্তিক ও সাংস্কৃতিক আগ্রাসনের আসল চেহারা। কুৎসিত কদাকার উৎকট ও বীভৎস চেহারা। তাঁর এই লড়াইয়ের কাহিনী ও উত্তাপ তিনি বর্ণনা করেছেন এই সংগ্রামী ও বর্ণময় পুস্তিকায়—

ردة   ولا أبا بكرٍ لها!!

'বুদ্ধিবৃত্তিক ধস নেমেছে ঐ
কে ঠেকাবে .. আবু বকর কই!'

১৩- ইতিহাসের ধারাবাহিকতায় মুসলিম উম্মাহর ভূমিকা ও অবদানের প্রতি গুরুত্ব প্রদান

ত্রয়োদশ স্তম্ভ হলো— বিশ্ব মানবতাকে হিদায়াতের দিশা দিতে, অন্যান্য নবীদের উম্মতের সাক্ষ্যদাতা হতে, আল্লাহ্‌র জমিনে আল্লাহ্‌র ইবাদত-বন্দেগী'র পথকে বাধামুক্ত ও নিরঙ্কুশ করতে এবং আল্লাহ্‌র একত্ববাদের পয়গামকে ব্যাপক ও সার্বজনীন করতে মুসলিম উম্মাহ ইতিহাসের বাঁকে-বাঁকে ও ধাপে-ধাপে যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ও অবদান

রেখে চলেছে— তাকে মূল্যায়ন করা এবং গুরুত্ব প্রদান করা। এই উম্মতের শানেই সেদিন বদর যুদ্ধের প্রাক্কালে আল্লাহ্‌র নবী এক আবেগ-উদ্বেলিত ও অশ্রুময় মুনাজাতে বলেছিলেন :

'اَللّٰهُمَّ إن تَهْلِكْ هٰذِهِ الْعِصَابَةَ لاَ تُعْبَد فِيْ الأَرْضِ

'আল্লাহ! এ-দলটি যদি ধ্বংস হয়ে যায়, তাহলে জমিনে তোমার ইবাদত করার কেউ-ই যে থাকবে না!'

মুসলিম উম্মাহ এক ব্যাপকভিত্তিক পয়গাম ও পরিপূর্ণ সভ্যতার গর্বিত উত্তরাধিকারী। এ-পয়গাম ও সভ্যতার সবচে' বড় অবদান হলো এই যে, তা বস্তুবাদের জড়তায় এঁকে দিয়েছে রূহের ছোঁয়া। আকল-বুদ্ধিকে করেছে সুষমামণ্ডিত– হৃদয়ের পরশে। নিঃসীম আকাশের সাথে জুড়ে দিয়েছে জমিনের সম্পর্ক। আখেরাতের সাথে সৃষ্টি করেছে দুনিয়ার বন্ধন। সু-সমন্বয় সাধন করেছে জ্ঞান-বিজ্ঞান ও ঈমান-ইখলাসের মাঝে। ঘুচিয়ে দিয়েছে ব্যক্তিসার্থ আর সমাজসার্থের যোজন-যোজন ব্যবধান।

এই উম্মতের অবস্থান— বড়ো মর্যাদাপূর্ণ অবস্থান। মানব কাফেলাকে নেতৃত্ব দেয়ার জন্যে .. সঠিক পথের দিশা দেয়ার জন্যে এই উম্মতকে পৃথিবীতে দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে। বিশ্ব মানবতা এই কীর্তি ও অবদানে ধন্য হয়েছিলো— যখন এ-উম্মত বরিত ও অধিষ্ঠিত ছিলো নেতৃত্বের আসনে। জ্ঞানে-বিজ্ঞানে-উৎকর্ষে-নৈতিকতায় ছিলো সর্বসেরা। কিন্তু পরের ইতিহাস বড়ো করুণ। বড়ো বেদনাদায়ক। নেতৃত্বের আসন থেকে তারা ছিটকে পড়লো। পরিণতিতে তারা পিছিয়ে পড়লো মানব কাফেলা থেকে। এ-পিছিয়ে-পড়ায় তারা নিজেরাই শুধু ক্ষতিগ্রস্ত হলো না, অনেক বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হলো পৃথিবীও। এই ক্ষতির খতিয়ানই তুলে ধরেছেন শায়খ নদভী তাঁর অমর গ্রন্থ ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين (মুসলমানদের পতনে বিশ্ব কী হারালো)-এর শব্দে-শব্দে, বাক্যে-বাক্যে।

এ-গ্রন্থের আলোচনা আসলেই আমার স্মৃতির আকাশে উড়ে বেড়াতে থাকে অতীতের একঝাঁক মধুময় স্মৃতি। এ-গ্রন্থের সুবাদেই আমি তাঁর সাথে প্রথম পরিচিত হতে পেরেছিলাম। তাও তাঁকে না দেখেই। আগেই বলেছি; এ-গ্রন্থ প্রকাশিত হয় মিসর থেকে এবং বিপুলভাবে তা নন্দিত ও সমাদৃত হয়। এ-গ্রন্থ সম্পর্কে কতোজন কতোভাবে নিজেদের আবেগাপ্লুতির কথা প্রকাশ করেছেন! তাদেরই একজন হলেন শায়খ ড. ইউসূফ মূসা। তিনি বলেছেন

إن قراءته فرض علي كل مســــــلمٍ يعمل لإعــــــــــــادة مجد الإسلام.

'ইসলামের হারানো গৌরব ও ঐতিহ্য ফিরিয়ে আনার স্বপ্ন দেখে— এমন সব মুসলমানকেই এই বই পড়তে হবে।'

আল্লামা নদভী রহ. আজীবন মুসলিম উম্মাহকে সতর্ক করে গিয়েছেন এ-গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব ও মিশন সম্পর্কে এবং বলেছেন : এ-কাজের জন্যেই এ-উম্মতের উদ্ভব ঘটানো হয়েছে। নিজেদের নয় শুধু— বিশ্ব মানবতার মুক্তি ও কল্যাণ-কামনাই তাদের মূল কাজ।

এ-বিষয়ে আল্লামা নদভী'র সর্বশেষ প্রকাশনা সম্ভবত কাতারে প্রদত্ত তাঁর এ-ভাষণটি—

قيمة الأمة الإسلامية بين الأمم ودورها في العالم

'অপরাপর উম্মতের তুলনায় মুসলিম উম্মাহর গুরুত্ব এবং বিশ্বময় তাদের ভূমিকা ও দায়িত্ব।'

১৪- সাহাবায়ে কেরামের মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব এবং তাঁদের দীনি অবস্থান

চতুর্দশ স্তম্ভ হলো— উম্মতের সর্বপ্রথম ও সর্বশ্রেষ্ঠ প্রজন্ম সাহাবায়ে কেরামের সম্মান ও মর্যাদা এবং শ্রেষ্ঠত্ব তুলে ধরা। হৃদয় যাঁদের সবচে' বেশি আল্লাহময়-রাসূলময়-পুণ্যময়, জ্ঞান যাঁদের সবচে' বেশি গভীর—সুদৃঢ় এবং ভনিতা ও কৃত্রিমতা যাঁদের আচার-আচরণকে কখনোই কলুষিত করতে পারে নি। নবীজীর সান্নিধ্য-পরশে ধন্য হতে এবং আল্লাহ্‌র দীনের ঝান্ডাকে বুলন্দ করতে আল্লাহই তাঁদেরকে নির্বাচিত করেছেন। বদর খন্দক ও হোনায়নে আসমানের ফেরেশতারা ছিলো তাঁদের সহযোদ্ধা। আল্লাহ তাঁদের প্রশংসায় নাজিল করেছেন একাধিক সূরায় একাধিক আয়াত। আল্লাহ্‌র নবীও বিভিন্ন হাদীসে তাঁদের প্রশংসা করেছেন।

প্রকৃতই তাঁরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের পক্ষ থেকে এমন প্রশংসা পাওয়ার হকদার ছিলেন। তাঁদের জীবনেতিহাস ও কীর্তিগাথা— এর জ্বলন্ত সাক্ষি। তাঁরাই সংরক্ষণ করেছেন পবিত্র কুরআন। বর্ণনা করেছেন হাদীস। বিজয় করেছেন দেশের পর দেশ— শুধু ইসলামের পয়গাম পৌঁছে দিতে, দেশে-দেশে, জাতিতে-জাতিতে। তাঁরা মোটেই কোনো সাধারণ মানুষ নন, তাঁরা সরাসরি 'মুহাম্মদী মাদরাসা'র ছাত্র। 'নবুওত উদ্যানে' সযত্নে ও সু-তত্ত্বাবধানে বেড়ে-ওঠা একগুচ্ছ সুরভিত ফুল। আল্লাহ তাঁদেরকে নিয়ে আল কুরআনে তাই বলেছেন

وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ.

'অনুরূপভাবে আমি তোমাদেরকে মধ্যপন্থী উম্মত বানিয়েছি অপরাপর মানুষের বিরুদ্ধে সাক্ষি হওয়ার জন্যে।' -বাকারা: ১৪৩

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ.

'তোমরাই সর্বশ্রেষ্ঠ উম্মত। মানব জাতির কল্যাণের জন্যেই তোমাদের উদ্ভব ঘটানো হয়েছে।' -আলে ইমরান:১১০

তাঁরা উম্মতের এ-কাফেলার অগ্রগামী দল। তাঁরা উম্মতের আদর্শ— ইলমে ও আমলে। তাঁরা উম্মতের বরণীয় নেতা ও ইমাম— জিহাদের ময়দানে ও ইজতিহাদের ব্যাপ্ত আঙিনায়। তাঁদের হাতে-গড়া পরবর্তী প্রজন্ম 'তাবেঈনরা'ও ঠিক তাঁদেরই মতো। যদিও এঁরা কখনো তাঁদের সম মর্যাদায় পৌঁছতে পারবে না।

خير القرون قرني، ثم الذين يلونهم

'আমার শতাব্দীই সেরা কল্যাণ-শতাব্দী, অতঃপর তাদের, যারা এদের পরে আসবে।'

সুতরাং যারাই শ্রেষ্ঠতম কল্যাণ-শতাব্দীর এ-মুবারক জামাতকে নিয়ে সংশয় ছড়াবে, তাঁদের মর্যাদা, চরিত্র ও অবস্থান নিয়ে বিষোদগার করবে, ধরে নিতে হবে তাদের কাছে 'মুহাম্মদী তারবিয়ত'-এর কোনো মূল্য নেই।

শ্রেষ্ঠতম কল্যাণ-শতাব্দীর এ-মুবারক জামাতকে নিয়ে সবচে' বেশি বাড়াবাড়ি ও বেয়াদবি করেছে শিয়া সম্প্রদায়। আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের বিপরীতে অবস্থান নিয়ে তারা কার্যত 'মুহাম্মদী তারবিয়ত'-এর ভিতকেই নাড়িয়ে দেয়ার এবং সাহাবায়ে কেরাম সম্পর্কে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের আলোকিত চিত্রাঙ্কনকেই মুছে ফেলার অপচেষ্টা করেছে। শায়খ নদভী তাদের এ-ন্যাক্কারজনক আকিদার জবাব দিয়েছেন বিদগ্ধ গবেষকের গাম্ভীর্য এবং বিনয় ও কৌশলের মাধ্যমে صـــورتان متضـــا د تـــان গ্রন্থে।[১]

---

[১] খতিবে বাগদাদী তাঁর কিতাব 'আল-কিফায়াতে' বলেছেন : হাফেজ আবু যার'আ আল-রাজি বলেছেন : 'যদি তুমি কাউকে রাসূলের কোনো সাহাবী'র সমালোচনা করতে শোনো, তাহলে মনে করবে যে, সে যিন্দিক (নাস্তিক, অবিশ্বাসী)। কারণ আমাদের আকিদা হলো, রাসূল সত্য, কুরআন সত্য, রাসূল যা নিয়ে এসেছেন তা সত্য। এই সাহাবীরাই আমাদের পর্যন্ত কুরআন ও হাদীস পৌঁছিয়েছেন। এরা (সমালোচকরা) আসলে চায়, আমাদের সাক্ষিদেরকে বিতর্কিত ও কালিমালিপ্ত করতে— কুরআন ও হাদীসকে মিথ্যা প্রমাণ করার জন্যে। এইসব লোকদের মুখোশ উন্মোচিত করে দেয়াটা খুবই জরুরি। কেননা এরা যিন্দিক। - (মূল) প্রকাশক।

১৫- ফিলিস্তিন সমস্যার সমাধানের পথ-নির্দেশ এবং ইহুদীদের কবল থেকে তার মুক্তি

পঞ্চদশ স্তম্ভ হলো— ফিলিস্তিন সমাস্যার দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করা। ইহুদীমুক্ত স্বাধীন ফিলিস্তিনের পক্ষে জোরালো অবস্থান গ্রহণ করা। ফিলিস্তিন সমস্যা শুধু ফিলিস্তিনীদের সমস্যা নয়, শুধু আরবদের সমস্যাও নয়, বরং এটি সারা বিশ্বের মুসলমানদের সমস্যা। সুতরাং ফিলিস্তিনকে ইহুদীদের কবল-মুক্ত করা— সমস্ত মুসলমানের দীনি দায়িত্ব। আর ফিলিস্তিন পুনরুদ্ধারের এ-মুক্তি সংগ্রামের জন্যে যুগ-চাহিদার ভিত্তিতে যাবতীয় উপায়-উপকরণ ও প্রস্তুতি গ্রহণ করে কাঁধে-কাঁধ মিলিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্যে মুসলিম উম্মাহকে অবিলম্বে ঐক্যবদ্ধ করা এবং পদক্ষেপ গ্রহণ করা— বর্তমান সময়ের সবচে' বড় দাবি।

উম্মাহর চিহ্নিত দুশমন কর্তৃক এবারই প্রথম ফিলিস্তিন আক্রান্ত হয় নি, এর আগে ক্রুসেড-যুদ্ধ-চলাকালে প্রায় দু'শ বছর ফিলিস্তিন দুশমনের দখলে ছিলো। নব্বই বছর আল-আকসা মসজিদ অবরুদ্ধ ছিলো। কিন্তু সময় একভাবে যায় নি। সেই কঠিন দুঃসময় থেকেও আল্লাহ মুসলিম উম্মাহকে মুক্ত করেছিলেন— উম্মাহর সোনালী ইতিহাসের কিছু সংখ্যক দুর্লভ বীর পুরুষের আগমন ঘটিয়ে। যাঁরা এসে উম্মতের উদ্দীপ্ত তারুণ্যে ঈমানী চেতনা ও জিহাদী জযবার আগুন জ্বালিয়ে দিয়েছিলেন। যাঁদের শীর্ষভাগে রয়েছেন মহাবীর নূরুদ্দীন ও সালাহুদ্দীন আইয়ূবী। শায়খ নদভী শত-শত পৃষ্ঠায় চিত্রিত করেছেন এঁদের বীরত্বগাথা। গেয়েছেন তাঁদের প্রশস্তি। এঁকেছেন তাঁদের কুশলী বীরত্বের অমরগাথা।

মহান পূর্বসুরীদের নীতি-আদর্শে পথ-চলা ছাড়া ফিলিস্তিনকে স্বাধীন করার আর কোনো বিকল্প নেই। সুতরাং নতুন প্রজন্মের ভিতরে আবার জ্বেলে দিতে হবে ঈমানী চেতনা ও জিহাদের আগুন। ফিরিয়ে আনতে হবে নূরুদ্দীন ও সালাহুদ্দীনের পুণ্য যুগ। শায়খ নদভী ফিলিস্তিন সমস্যা নিয়ে প্রচুর প্রবন্ধ ও পুস্তিকা লিখেছেন। এর ভিতরে সর্বশেষ সংযোজন হলো— المسلمون وقضية فلسطين (ফিলিস্তন সমস্যা ও মুসলমানরা)

১৬- স্বাধীন ইসলামী শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের প্রতি গুরুত্ব প্রদান

ষষ্ঠদশ স্তম্ভ হলো— স্বাধীন ইসলামী শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের প্রতি গুরুত্ব প্রদান। এ শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের 'দর্শন ও উপকরণ' প্রাচ্য বা প্রতীচ্য থেকে

নয়— আহরিত হবে শুধু ইসলাম থেকে। ইসলামই হবে আকিদা, ইসলামই হবে শরীয়ত, ইসলামই হবে মূল্যবোধ এবং ইসলামই হবে স্বভাব-চরিত্র ও নীতি-নৈতিকতা। হ্যাঁ.. তার উপায়-উপকরণ ও সহযোগিতা-সামগ্রি সংগৃহীত হতে পারে যে কোনো উৎস থেকেই। শর্ত একটাই: তা ইসলামের নীতিমালার গন্ডি অতিক্রম করতে পারবে না। ইসলামী আদর্শ ও নীতিমালার ভিতরে অবস্থান করে যে কোনো জ্ঞানের কথা যে কারো কাছ থেকেই আহরণ করা যায়। কেননা—

الحكمة ضالة المؤمن أنى وجدها فهوأحق بها.

'জ্ঞানের কথা মু'মিনের হারানো সম্পদ। যেখানেই তা পাওয়া যাক, সেখান থেকেই তা কুড়িয়ে নেয়ার অধিকার রয়েছে তার।'

শায়খ নদভী সনাতনি শিক্ষা পদ্ধতি —যা কেবল শব্দ এবং তর্ক-বিতর্কের মধ্যে সীমাবদ্ধ ও ঘূর্ণ্যায়মান— পছন্দ করতেন না। আধুনিক শিক্ষাও তাঁর কাছে ভীষণ অপছন্দ। কেননা তা আধ্যাত্মিকতাশূন্য ও ধর্ম বিবর্জিত। জীবনের প্রকৃত লক্ষ্য-উদ্দেশ্য সম্পর্কে এখানে কোনো দিক-নির্দেশনা নেই। আধুনিক শিক্ষার এই দেউলিয়াত্বের ক্ষেত্রে প্রায়ই তিনি আল্লামা ইকবালের এই 'দর্শন' উদ্ধৃত করতেন

إن التعليم الحديث لا يُعَلِّمُ عَيْنَ الطالبِ الدُّموعَ ولا قلبَه الخُشوعَ.

'আধুনিক শিক্ষা আঁখি ও আঁখিনীরের মাঝে বিভেদ তৈরী করে আর হৃদয় ও আল্লাহভীতির মাঝে প্রাচীর খাড়া করে।'

এ জন্যেই শায়খ নদভী পরিপূর্ণ ইসলামী শিক্ষা ও যথাযথ প্রশিক্ষণের ব্যাপারে খুবই গুরুত্ব আরোপ করেছেন। কারণ এ ছাড়া 'আদর্শ প্রজন্ম' জন্ম নেবে না। এ ব্যাপারে বিন্দুমাত্র অবহেলা বা শিথিলতা চরম বিপর্যয় ডেকে আনবে। তিনি হিন্দুস্তানের এক কবিকে উদ্ধৃত করে বলেছেন:

إن فرْعَونَ كان يكفيه عن تذبيحِ بني إســـــــــــــــرائيل أن يُنْشئ لهم كليةً يُكَيِّفُ عقولَهم فيها كما يريد، دون أن يُريقَ دماً، ولكنه كان غبياً.

'গোটা বনী ইসরাঈলের পুত্র সন্তানদের হত্যা না করে ফেরাউন যদি তাদের আকল-বুদ্ধি ও মন-মানসিকতাকে নিজের ইচ্ছেমত 'ধোলাই' করার জন্যে একটা 'ধোলাই প্রতিষ্ঠান' খুলতো, তাহলেই তো তার 'উদ্দেশ্য' (ক্ষমতা স্থায়ী করার পথ কন্টকমুক্ত করা!) হাসিল হয়ে যেতো! কিন্তু ফেরাউনটা ছিলো বড়ো মোটামাথাওয়ালা!'

এ বিষয়ে শায়খ নদভীর উল্লেখযোগ্য পুস্তিকা হলো— التربية الإسلامية الحـرة (স্বাধীন ইসলামী তারবিয়াত (শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ)। এ ছাড়া এ সম্পর্কে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করা হয়েছে এ গ্রন্থেও— كيف ينظـر المسلمون إلى الحجاز وجزيـرة العـرب (হিজাযভূমি ও আরব-বদ্বীপের কাছে মুসলমানদের প্রত্যাশা)

দারুল উলুম নদওয়াতুল উলামা'র মাধ্যমে এ ব্যাপারে তিনি নিজেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন।

১৭- শিশু-কিশোরদের প্রতি গুরুত্ব

সপ্তদশ স্তম্ভ হলো— শিশু-কিশোরদের প্রতি গুরুত্ব প্রদান এবং তাদের জন্যে গঠনমুখী সাহিত্য রচনা করা। কেননা, তারাই আগামী দিনের দিক-দিশারী এবং মুসলিম উম্মাহর সোনালী ইতিহাসের নির্মাতা। শায়খ নদভী এ-গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টির প্রতি দৃষ্টি দিয়েছেন একেবারে তারুণ্যদীপ্ত বয়সেই, যখন তাঁর বয়স ছিলো ত্রিশের দশকে। শিশু সাহিত্যের দক্ষ কথাশিল্পীও ছিলেন তিনি। তাই মনের সব মাধুরী মিশিয়ে লিখেছেন অমর 'নবী কাহিনী সিরিজ'— قـصـص الـنـبـيـيـن سـلـسـلـة (কাসাসুন নাবিয়্যিন)। সাবলীল ও প্রাঞ্জল ভাষায়.. চিত্তাকর্ষক ও মন ছুঁয়ে যাওয়া উপস্থাপনায়। নবী কাহিনীর আড়ালে মুসলিম শিশু-মানস গঠনে যা যা প্রয়োজন তার সবই তিনি অপূর্ব দক্ষতা ও নৈপুণ্যে এই সিরিজে বিন্যস্ত করেছেন। শিশু কিশোররা তন্ময়চিত্তে পড়তে থাকবে নবী কাহিনীর এ-সিরিজ আর এর ভিতর দিয়েই তারা পেয়ে যাবে জীবন সাজাবার সকল উপকরণ।

তারা পাবে এখানে তাওহীদ ও আকিদার খোরাক।

তারা পাবে এখানে ঈমান ও আমলের খোরাক।

তারা পাবে এখানে আদর্শ ও মূল্যবোধের খোরাক।

তারা পাবে এখানে শিক্ষা ও উপদেশের খোরাক।

তারা পাবে এখানে সত্যের মহিমায় উজ্জীবিত হওয়ার খোরাক।

তারা পাবে এখানে চিত্তাকর্ষক শিশু-সাহিত্যের পেলব জমিনে হাঁটতে হাঁটতে.. চলতে চলতে তারকা-লেখক হয়ে যাওয়ার খোরাক। এবং অসত্যের জয়জয়কারে সত্যের ঝান্ডাকে বুকে আকড়ে ধরে রাখার খোরাক।

এ-সিরিজ পড়ে শীর্ষ সারির উলামায়ে কেরামের কেউ কেউ নিজেদের অনুভূতির কথা প্রকাশ করতে বাধ্য হয়েছেন এভাবে— إنها علم توحيد جديد للأطفال (নিঃসন্দেহে এ-সিরিজ শিশু-কিশোরদের সামনে তাওহীদ ও আকিদা শেখার এক নয়া দিগন্ত উন্মোচিত করলো।)

শহীদ সায়্যিদ কুতবও এই সিরিজের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। ত্রিশ বছর অথবা আরো পরে سيرة خاتم النبيين (সীরাতে খাতামুন নাবিয়্যিন) লিখে তিনি এ-সিরিজকে পূর্ণতা দেন। শিশু-কিশোরদের জন্যে তাঁর আরেকটি গ্রন্থ হলো: قصص من التاريخ الإسلامي (গল্পে আঁকা ইসলামী ইতিহাস)।

এক জায়গায় শায়খ নদভী এই আশাবাদ ব্যক্ত করেছেন যে, আমি শিশু-কিশোর সাহিত্যে একটি পরিকল্পনা পেশ করলাম মাত্র। আশা করি এ পথ ধরে আগামী দিনে শিশু-কিশোর-সাহিত্য আরো সমৃদ্ধ হবে, আরো প্রাণবন্ত হবে। আরো ডালপালা ছড়াবে। আর এই দায়িত্বটা নিতে হবে তাদেরকেই, যারা শিশু-কিশোরদের ঘিরে স্বপ্ন দেখেন সুন্দর একটি আগামীর। আদর্শ একটি প্রজন্মের।

১৮- যুগ সচেতন আলেম ও আল্লাহওয়ালা দাঈ তৈরী

অষ্টদশ স্তম্ভ হলো— যুগ সচেতন আলেম ও আল্লাহওয়ালা দাঈ তৈরীর জন্যে অবিরাম সাধনা করে যাওয়া। যারা একদিকে দক্ষতা অর্জন করবেন শরীয়তের গভীর জ্ঞান ও নিগূঢ় তাৎপর্যে অপরদিকে আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানেও থাকবে সচেতন পদচারণা। পাশাপাশি যারা গুণান্বিত হবেন 'ঈমানী গায়রত' ও 'রাব্বানী আখলাক' এর সুষমায়।

শায়খ নদভী'র সিংহভাগ জীবনই কেটেছে—
এই মুবারক সাধনায়।
কখনো দারুল উলুম নদওয়াতুল উলামা'র
তাদরিসের (শিক্ষাদানের) আসনে বসে বসে..
কখনো ভারতবর্ষের বিভিন্ন দীনি প্রতিষ্ঠান ও মাদরাসার
কিংবা সাধারণ মুসলমানদের দাওয়াতী জলসায় বসে বসে
কখনো আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে ব্যাপকভিত্তিক সফরের মধ্য দিয়ে।

তাঁর মতে বর্তমানে মুসলমানরা গভীর জ্ঞান ও প্রজ্ঞার আধার এবং দূরদৃষ্টিসম্পন্ন ও যুগ-সচেতন আলেম ও দাঈ'র সবচে' বেশি মুখাপেক্ষী।

যারা উম্মাহর যে-কোনো কঠিন সমস্যায় শক্ত হাতে হাল ধরতে সক্ষম হবে। যখন ফায়সালা প্রদানের প্রশ্ন আসবে, তখন তারা ফায়সালা প্রদান করবেন ন্যায়সঙ্গতভাবে। ফতওয়া প্রদানের প্রশ্ন আসলে ফতওয়া প্রদান করবেন দলিল প্রমাণের ভিত্তিতে। আল্লাহ্র পথে মানুষকে ডাকবেন স্থান-কাল-পাত্র-আঙ্গিক বিচার বিশ্লেষণ করে। দূরের মানুষকে কাছে টানতে.. কাছের মানুষকে আরো কাছে আনতে।

শায়খ নদভী বর্ণিত 'এ-কাফেলা'ই উম্মতের গর্ব ও নিয়ামক শক্তি, সর্বযুগে, সর্বকালে। তাদের ছাড়া এই উম্মতের সার্বিক মঙ্গল ও কল্যাণ অসম্ভব।

১৯- ইসলামী জাগরণ ও আন্দোলনকে সঠিক পথে পরিচালিত করা

ঊনবিংশ স্তম্ভ হলো— ইসলামী বিশ্বের সবুজ মানচিত্রসহ বিশ্বময় যে ইসলামী জাগরণের শীতল হাওয়া বইতে শুরু করেছে, তার জন্যে সঠিক দিক নির্ণয় করে দেয়া। এ জাগরণ— বুদ্ধির জাগরণ, হৃদয়ের জাগরণ, দৃঢ় সংকল্পের জাগরণ।

কিন্তু আফসোসের বিষয় হলো, বাইরের কোনো দুর্জন নয়— আমাদের সুজনদের দ্বারাই এ-জাগরণ বাধাগ্রস্ত হওয়ার আশঙ্কা সবচে' বেশি। এ-জাগরণের আরেকটি উদ্বেগজনক অন্তরায় হলো, এই উম্মাহর কতিপয় সদস্যের নিরর্থক সীমালংঘন ও বাড়াবাড়ি। 'মূল' ছেড়ে দিয়ে 'বহিরাভরণ' নিয়ে কাড়াকাড়ি। জরুরি ও আবশ্যিক বিষয়কে পাশ কাটিয়ে অপ্রয়োজনীয়, প্রান্তিক ও মতবিরোধপূর্ণ বিষয় নিয়ে মাতামাতি। অপর মুসলিম ভাইদের প্রতি বিনা দলিলে খারাপ ধারণা পোষণ করাও এই তাদের— আরেকটি ব্যাধি। কখনো 'পাপী' বলে, কখনো 'বিভ্রান্ত' বলে আবার কখনো একেবারে 'কাফের' বলেই তারা তাদের এই খারাপ ধারণার প্রকাশ ঘটান।

কিন্তু শায়খ নদভী কেমন ছিলেন? .. না, তিনি মোটেই এমন ছিলেন না। তিনি ছিলেন মধ্যপন্থী। নয় অতি বাড়াবাড়ি নয় অতি কড়াকড়ি। এ মধ্যপন্থা ছিলো তার জীবনের নিবিড় ও অচ্ছেদ্য অংশ। এ মধ্যপন্থা মিশেছিলো তার চিন্তায়-চেতনায় .. আচারে-আচরণে .. স্বভাবে-প্রকৃতিতে। তিনি তাঁর জীবনটা সাজিয়েছিলেন এইসব শিরোনামের পুষ্প দিয়ে মালা গেঁথে-গেঁথে—

তিনি ছিলেন প্রাচীনপন্থী— কিন্তু নতুনের স্বীকৃতির কেতন উড়িয়ে।

তিনি ছিলেন ঐতিহ্য-প্রেমিক— কিন্তু আধুনিকতার প্রয়োজনের স্বীকৃতি দিয়ে।

তিনি ছিলেন মহান পূর্বসুরীদের আদর্শের ধারক বাহক।

তিনি ছিলেন রূহানিয়াত ও আধ্যাত্মিকতার একনিষ্ঠ সাধক।

তিনি ছিলেন আদর্শিক মূল্যবোধের প্রশ্নে অটল, আপোষহীন।

তিনি ছিলেন সময়ের দাবি পুরণে আবশ্যকীয় পরিবর্তনের বিশ্বস্ত বাহন।

তিনি ছিলেন রেশমের কোমলতায় মোলায়েম।

তিনি ছিলেন লোহার কঠোরতায় দৃঢ়তম।

এই হলেন আমাদের শায়খ নদভী। আগামী প্রজন্ম ঠিক এমনটাই হোক— এই ছিলো তাঁর আজীবন স্বপ্নসাধ।

শায়খ কোনো দল ও সংগঠনের সাথে সম্পৃক্ত ছিলেন না। তিনি ছিলেন মুক্ত স্বাধীন। তবে হকপন্থী অনেক দলকেই তিনি বাইরে থেকে পৃষ্ঠপোষকতা করতেন। এ জন্যেই দলের ত্রুটি-বিচ্যুতি ও স্খলন যতোটা তাঁর চোখে ধরা পড়তো, দলের ভিতরের সদস্যদের চোখে ততোটা ধরা পড়তো না। ফলে অনায়াসেই তিনি দলের দুর্বলতাগুলি ধরে ধরে দিক-নির্দেশনা দান করতেন, উপদেশ দিতেন। প্রয়োজনে সমালোচনাও করতেন। এর ভিতরেই সম্ভবত কল্যাণ নিহিত ছিলো। অপরদিকে সুযোগ ও পরিবেশ সৃষ্টি না হলে তিনি মুসলিম শাসকবৃন্দ ও নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গকে বা অন্য কাউকে যেচে উপদেশ দিতেন না। কারো কাছ থেকেই তাঁর কোনো কিছু পাওয়ার ও নেওয়ার ছিলো না।

২০- অমুসলিমদের প্রতি ইসলামের দাওয়াত

সর্বশেষ ও বিংশতম স্তম্ভ হলো— অমুসলিম সম্প্রদায়কে ইসলামের দিকে দাওয়াত দেওয়া। তবেই সেই পুণ্য কাফেলার সাথে যোগসূত্র প্রতিষ্ঠিত হবে, যাঁরা যুগে-যুগে বিশেষত ইসলামের কল্যাণ-শতাব্দীগুলিতে অসংখ্য অগণিত মানুষকে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচানোর জন্যে এই কাজে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। শায়খ নদভী ২২ বছর বয়সেই এ-ময়দানে পদার্পণ করেছিলেন। ১৯৩৫ সালে তিনি বোম্বাই সফর করেন ড.

উম্বেদকারের কাছে ইসলামের দাওয়াত নিয়ে। ড. উম্বেদকার ছিলেন নীম্ন বর্ণের (Depresse Classes) এক সম্প্রদায়ের নেতা।

শায়খ নদভী মনে করতেন, অন্যান্য জাতি ও সম্প্রদায়ের চেয়ে এই উম্মতের শ্রেষ্ঠত্ব নির্ভর করে ইসলামের দিকে মানুষকে দাওয়াত দেওয়া-না-দেওয়ার উপর। বিজ্ঞান-প্রযুক্তি ও 'হাই টেকনোলজি'র শীর্ষ চূড়ায় পৌঁছে গেলেও বিশ্ব মানবতা সবচে' বেশি মুখাপেক্ষী— ইসলামের দিকে। ইসলামের শাশ্বত জীবন ব্যবস্থার দিকে। পিপাসার্ত ব্যক্তি যেমন পানির মুখাপেক্ষী, অসুস্থ ব্যক্তি যেমন চিকিৎসার মুখাপেক্ষী ঠিক তেমনি বিশ্ব মানবতাও আজ ইসলামের মুখাপেক্ষী। মুসলিম উম্মাহ্‌র কাছেই আছে আরোগ্যদানকারী ঔষধ এবং পিপাসা নিবারণকারী শীতল পানি।

এই হলো বিশটি স্তম্ভ। এর উপরই দাঁড়িয়ে আছে শায়খ নদবী'র দাওয়াতী দর্শনের প্রাসাদ। প্রতিটি স্তম্ভই বিশদ আলোচনার দাবি রাখে। আল্লাহ্‌র কাছে তাওফীক চাই আগামী দিনে যেনো আমি পূর্ণতায় পৌঁছতে পারি। তিনি নিশ্চয়ই আমার ইচ্ছা পূরণ করবেন। তিনি তো শুধু শুনেন না, সাড়াও দেন!

* * *

ইসলামী শরীয়তে বুদ্ধি নয়— ওহীই শ্রেষ্ঠ

তবে দ্বিতীয় স্তম্ভটি নিয়ে —অর্থাৎ আকল-বুদ্ধি নয়— শরীয়তে ওহী-ই হলো প্রধান ও মূল— এখানে একটু বিশদ আলোচনার প্রয়োজন অনুভব করছি। ধর্মীয় বিষয়ে ওহীই হলো একমাত্র উৎস। সুতরাং আকিদা-বিশ্বাস, উলূহিয়াত (আল্লাহর একমাত্র উপাস্য হওয়া), নবুয়ত ও পরজগত সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করা এবং তার বিশদ ব্যাখ্যা জানা— ওহী ছাড়া কল্পনাই করা যায় না। অনুরূপভাবে শরীয়তের যাবতীয় হুকুম-আহকাম ও বিধি-বিধানও সম্পূর্ণ ওহী-নির্ভর।

তাহলে বুদ্ধির কাজ কী? বুদ্ধির কাজ হলো— ওহীর বাণীকে উপলব্ধি করা, হৃদয়ঙ্গম করা। তারপর ইসলামের আকিদা-বিশ্বাসকে সে বাণীর আলোকে হৃদয়-মনে প্রোথিত করা অবশেষে বাস্তব জীবনে তা প্রতিফলিত করা— শরীয়ত নির্ধারিত ইবাদত-বন্দেগী, আচার-আচারণ ও লেন-দেনের ভিতর দিয়ে। অর্থাৎ ওহী পথ দেখাবে আর বুদ্ধি সে-পথ ধরে চলবে। পথ খুঁজে বের করার বা নির্ধারণ করার যোগ্যতা ও অধিকার— কোনোটাই বুদ্ধির নেই। আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে ওহীর মাধ্যমে নির্দেশনামা বা নিষেধাজ্ঞা

আসবে তখন তার সামনে বুদ্ধিকে সমর্পিত হতে হবে। এ-সমর্পণই বুদ্ধির কাজ।

এ মূলনীতির আলোকেই শায়খ নদভী রহ. পরিস্কার ভাষায় বলেছেন যে, 'নবুয়ত'ই হলো বিশুদ্ধ জ্ঞান ও পরিপূর্ণ হিদায়াত লাভের একমাত্র অনিবার্য মাধ্যম। কুরআনে কারীমেও এ-সত্য বারবার উচ্চারিত হয়েছে যে, নবীরা-ই হলেন আল্লাহ্‌র অস্তিত্বের দ্যোতিত প্রমাণ। আল্লাহকে সঠিকভাবে জানার একমাত্র মাধ্যম। যে জানায় থাকবে না কোনো অজ্ঞতা ও বিভ্রান্তি, যে জানায় থাকবে না কোনো স্খলন ও বিচ্যুতি।

সুতরাং বুদ্ধি নয়—
আল্লাহকে সঠিকভাবে জানতে হলে .. চিনতে হলে,
নবীদের-বাতানো-পথ ও পন্থাই—
অর্থাৎ ওহীই একমাত্র স্বচ্ছ ও নির্ভেজাল মাধ্যম।
বুদ্ধি এখানে অচল,
নির্মল চরিত্রও এখানে অচল,
প্রখর ধী-শক্তিও এখানে অচল।
বিপুল অভিজ্ঞতার কোনো মূল্য নেই এখানে,
যুক্তির পথও এখানে আঁধারে ঘেরা—কাঁটায় ছাওয়া।
চ্যালেঞ্জের পথ তো এখানে একেবারেই নিশ্চিত ধ্বংস ডেকে আনে!

আল্লাহ তা'আলা এই দ্যোতিত বাস্তবতাকেই জান্নাতবাসীদের ভাষায় —আর জান্নাতবাসীরা যে বাস্তব ও অভিজ্ঞতাময় সত্যকেই দুনিয়াবাসীদের সামনে তুলে ধরবে, এতে সন্দেহের কোনো অবকাস নেই— এভাবে বলেছেন :

وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ.

'তারা বলবে সকল প্রশংসা সেই আল্লাহ্‌র, যিনি আমাদেরকে সৎ কর্ম করার পথ দেখিয়েছেন। আল্লাহ আমাদেরকে সঠিক পথ না-দেখালে আমাদের পক্ষে সঠিক পথ খুঁজে পাওয়ার কোনো উপায় ছিলো না।'

-আরাফ: ৪৩

এরপরই জান্নাতবাসীরা অকপটে স্বীকার করছে এ সত্য

لَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ.

'অবশ্যই এসেছিলো আমাদের রব কর্তৃক প্রেরিত রাসূলগণ সত্যের বাণী নিয়ে।' -আরাফ:৪৩

জান্নাতবাসীদের ভাষায় বর্ণিত এ-আয়াত থেকে সুস্পষ্ট ভাবে কী প্রমাণিত হয়? .. প্রমাণিত হয় যে, রাসূলগণের আগমনের কারণেই তারা আল্লাহকে চিনতে পেরে তাঁর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্যে তাঁর পাঠানো-বিধান অনুযায়ী আমল করে অবশেষে 'চির শান্তি নিকেতন' জান্নাতে প্রবেশ করে তার অফুরন্ত নায-নেয়ামত ভোগ করতে পারছে!

গ্রীক দর্শনের ভ্রষ্টনীতি এবং তা প্রত্যাখ্যাত ও ব্যর্থ হওয়ার নেপথ্য কথা

সুতরাং যে আল্লাহকে সঠিকভাবে জানতে চায়, তাঁর গুণাবলী ও অনুপম নামাবলী—আসমাউল হুসনা জানতে চায়, এ-বিশ্ব জগত ও আল্লাহ্‌র মাঝে কী সম্পর্ক রয়েছে— তা জানতে চায়, আরো জানতে চায়, এ-বিশ্ব জগতকে আল্লাহ কীভাবে নিয়ন্ত্রণ করেন, শাসন করেন, তাহলে নবী-রাসূলগণের মাধ্যমেই তা জানতে হবে। অন্য কোনো পথ নেই। অন্য কোনো উপায় নেই। নবী-রাসূলগণের পথ ও পন্থা বাদ দিয়ে যারা শুধুমাত্র নিজেদের জ্ঞান ও বুদ্ধি এবং বিজ্ঞতা ও অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর করবে, কিংবা বিজ্ঞানে ও শিল্পে অর্জিত কোনো প্রাপ্তির উপর নির্ভর করবে, নিজস্ব মেধা ও প্রতিভার উপর নির্ভর করবে, অথবা প্রযুক্তির ক্ষেত্রে কোনো আংশিক বা ব্যাপক সাফল্যের উপর নির্ভর করবে, তাহলে বলতেই হয় সবই মরীচিকা, সবই কুহেলিকা। কিংবা পণ্ডশ্রম। এ-পথে ভ্রান্তি অনিবার্য। পথচ্যুতি অবধারিত। এদের কথাই কুরআনে চিত্রিত করা হয়েছে এভাবে—

هَاأَنْتُمْ هَؤُلَاءِ حَاجَجْتُمْ فِيمَا لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ فَلِمَ تُحَاجُّونَ فِيمَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ.

'শোনো! যে বিষয়ে তোমাদের জানা ছিলো, তা নিয়ে তোমরা (রাসূলের সাথে) বিবাদ করেছো, কিন্তু যে বিষয়ে তোমাদের কিছুই জানা নেই, তা নিয়ে কেনো বিবাদ করছো? আল্লাহ জানেন, তোমরা জানো না।'

-আলে ইমরান:৬৬

এটাই হলো গ্রীক ধর্মতাত্ত্বিক দর্শন এবং নিশানবরদারদের পথভ্রষ্টতা ও গোমরাহির রহস্য। তাদেরকে এ-দুঃপ্রবেশ্য নয় শুধু— অসম্ভব-প্রবেশ্য পথে পা-বাড়াতে উস্কানি দিয়ে বিভ্রান্ত করেছে— তাদের মেধা ও প্রতিভা, তাদের জ্ঞান ও গবেষণা, তাদের শৈল্পিক সাহিত্য-সংস্কৃতি ও উর্বর-অনুপম

কাব্যগাথা এবং গণিত শাস্ত্র ও প্রকৌশল বিজ্ঞানে তাদের পারদর্শিতা। এ সবের কারণে তাদের মধ্যে 'ফুঁসে' উঠেছিলো যে অহংবোধ, তার তাল সামলাতে না-পেরেই তারা ধর্মতত্ত্বের নিগূঢ়তত্ত্ব, আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব ও গুণাবলী এবং সৃষ্টি রহস্য উদঘাটনের 'নিষিদ্ধ হেরেম'-এ প্রবেশ করে বসেছিলো। অথচ পরিণতিতে অর্জন কিছুই নেই— কিছু খোড়া যুক্তি ও উদ্ভট চিন্তা এবং অসার কল্পনা ও অযৌক্তিক অনুমান পরিবেশন ছাড়া! এইসব 'মহা' দার্শনিকদের যুক্তির বাহার ও বুদ্ধির নমুনা বর্ণনা করতে গিয়ে হুজ্জাতুল ইসলাম ইমাম গাযালী আফসোস করেছেন এভাবে —

'ظلمات فوق ظلمات، لو حكاه الانسان عن منام رآه لاستدل علـــى ســوءِ مزاجه، أو لو أوردَ جنسه في الفقهيات التي قصارى المطلب فيها تخمينات، لقيل إنهـــا ترهات، لا تفيد غلبات الظنون'

'অন্ধকার, স্তূপ স্তূপ অন্ধকার! কোনো মানুষ যদি এ-অন্ধকার স্বপ্নে দেখেছে বলেও জানায়, বুঝতে হবে ওর ভিতরটাই নষ্ট। আর অতিপ্রয়োজনীয় ফিকাহ শাস্ত্রে যদি তা ঢুকিয়ে দেওয়া হয়, তাহলে এই শাস্ত্রটাই বিগড়ে যাবে, পরিণত হবে ফালতু কল্পকথায়। যা নিশ্চিত পরিণতিতে পৌঁছাতে সাহায্য করবে তো দূরের কথা; তার ধারে কাছেও (প্রবল ধারণায়) পৌঁছাতে সক্ষম হবে না।'[১]

শায়খুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমিয়া রহ.ও এই দার্শনিকদের দর্শন খণ্ডন করে বলেছেন : 'সময় এসেছে বুদ্ধি-বিবেচনাসম্পন্ন ব্যক্তিদের ভাবার— এইসব মানুষকে (দার্শনিকদের) নিয়ে, যারা নিজেদেরকে এতোটাই বুদ্ধিমান, বিচক্ষণ ও অনুসন্ধানী বলে দাবি করছে যা তাদেরকে অনেকটা নবী-রাসূলদের পর্যায়ে নিয়ে যাচ্ছে। নিজেদের দর্শন-ফালসাফা ও প্রজ্ঞা-কৌশলের কথা এতোটা উঁচু গলায় কী করে তারা বলে? বোঝে না ওরা, ওদের গলা যে ঠিক উম্মাদের প্রলাপোক্তির মতো শোনায়?! আশ্চর্য! যা সত্য ও শাশ্বত, তাকে বাতিল বলে এবং যা মিথ্যা ও অসত্য তাকে সত্য ও শাশ্বত বলে ওরা চালিয়ে দিচ্ছে! শুধুমাত্র নিজেদের সংশয়ঘেরা ও প্রতারণাপূর্ণ কথার আড়ালে!'[২]

---

১. তাহাফুতুল ফালাসিফা:১০৫

২. মিনহাজুস সুন্নাহ

তিনি আরো বলেছেন : 'এইসব তথাকথিত দার্শনিকদের ক্ষেত্রে আল কুরআনের এ-আয়াত যথার্থই প্রযোজ্য

أَشَهِدُوا خَلْقَهُمْ سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْأَلُون.

'তারা কি তাদের সৃষ্টি প্রত্যক্ষ করেছে? তাদের কথা লিপিবদ্ধ করা হবে এবং সে সম্পর্কে তাদেরকে জিজ্ঞাসা করা হবে।' -যুখরুফ: ১৯

مَا أَشْهَدْتُهُمْ خَلْقَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَلا خَلْقَ أَنفُسِهِمْ وَمَا كُنتُ مُتَّخِذ الْمُضِلِّين عَضُداً.

'নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল সৃষ্টিকালে আমি তাদেরকে সাক্ষি রাখি নি। এমনকি তাদের নিজেদের সৃষ্টির সময়ও না। আমি বিভ্রান্তকারীদেরকে (আমার) সাহায্যকারী বানাতেই পারি না।' -কাহফ:৫১

কিন্তু দুঃখের বিষয় হলো; যে ইসলামী দর্শনের জন্মই হয়েছিলো এ-আল্লাহদ্রোহী গ্রীক দর্শনকে মুকাবিলা করার জন্যে, তাও যথেষ্ট প্রভাবিত হয়ে পড়েছে এ-গ্রীক দর্শনের দ্বারা। কেননা ইসলামী দর্শনও এমন সব গভীর বিষয়ে অনুপুঙ্খভাবে আলোচনা ফেঁদে বসেছে, যার কোনো নীতিমালা ও ভিত্তিই নেই। ইসলামী দর্শনের ভিতরে আগ্রাসী ও সীমালংঘনকারী এই গ্রীক দর্শনের সূক্ষ্ণ অনুপ্রবেশের কারণে ইসলামী দার্শনিকরাও গ্রীকধারায় আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব, তাঁর নাম ও গুণাবলী নিয়ে এমন সব অদ্ভুত ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ও সূক্ষ্ণাতিসূক্ষ্ণ আলোচনার অবতারণা ঘটিয়েছেন, যা পড়লে মনে হয়— তারা বুঝি কোনো রসায়নিক গবেষণাগারে বসে-বসে গবেষণা করেছেন আর তার 'রিপোর্ট' পেশ করেছেন। (আল্লাহ এ-সবের চেয়ে অনেক মহান, চির উন্নত।)

প্রকৃতির স্বাভাবিক নিয়মের অন্তরালে লুকিয়ে থাকা রহস্য বুঝতে দার্শনিকদের অক্ষমতা

শায়খ নদভী রহ. এ কথাটিই বলেছেন তাঁর النبوة والأنبياء في القرآن (কুরআনে নবুয়ত ও নবী) গ্রন্থে। অনুর্ধ ত্রিশ বছরের টগবগে যৌবনে দাঁড়িয়ে الدين والمدنية (দীন ও নগর সভ্যতা) সম্পর্কে যে জ্ঞানগর্ভ ও প্রজ্ঞাপুর্ণ ভাষণ দান করেন, তাতে তিনি প্রচলিত দর্শনশাস্ত্র এবং ধর্মতত্ত্ব ও প্রকৃতির স্বাভাবিক নিয়মের অন্তরালের রহস্য সম্পর্কে তার অবস্থান নিয়ে এক সত্যানুসন্ধানী বিদগ্ধ গবেষকের ভাষায় আলোকপাত করেন। সে

ভাষণের এক অংশে তিনি বলেন: 'সুস্থ মন-মানস ও সুকুমারবৃত্তিসম্পন্ন কোনো ছাত্র মানব-জ্ঞানের গোটা ইতিহাসের মধ্যে যদি সবচে' শ্রেষ্ঠ ও চটকদার 'জ্ঞান-গবেষণা-আবিস্কার'টি উপহার দেয়, তাহলে এটা যতোটা বিস্ময় ও চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করবে তারচে' অনেক অনেক বেশি বিস্ময়কর ও চাঞ্চল্যকর আবিস্কারটি হলো সেই (গ্রীক) দর্শন, যা বুদ্ধিবৃত্তিক গবেষণা ও যুক্তিবৃত্তিক দর্শনের এবং যুক্তিবিদ্যার মৌলিক নীতিমালার 'একক উদ্ভাবক' হওয়ার দাবি করছে। এই (গ্রীক) দর্শন যদিও সুদীর্ঘ আড়াই হাজারটি বছর ধরে অব্যাহতভাবে তার 'গবেষণা-কর্ম' চালিয়ে যাচ্ছে, কিন্তু কী নিয়ে? কী লক্ষ্যে? কোন্ সে নীতিমালার উপর ভিত্তি করে?.. এ সব প্রশ্নের উত্তরে যা বেরিয়ে আসে তা খুবই বিস্ময়কর ও হতাশাব্যঞ্জক। এমন সব বিষয় নিয়ে তার গবেষণা-কর্ম চালাচ্ছে, যে বিষয়ে তার ন্যূনতম কোনো ধারণাও নেই। এমনকি সে বিষয়ের প্রাথমিক নীতিমালাগুলো পর্যন্ত তার অজানা। এই দর্শনের দিকপালরা এমন সব লক্ষ্য স্থির করে তার পেছনে ছুটে বেড়াচ্ছেন, যে লক্ষ্যের কোনো চিহ্ন পর্যন্ত তাদের সামনে নেই। অদ্ভুত, বড়ো অদ্ভুত! তারা গবেষণা করে—

আল্লাহর অস্তিত্ব নিয়ে, তাঁর সত্ত্বাতত্ত্ব নিয়ে,
তাঁর নাম ও গুণ নিয়ে,
তাঁর গুণের ধরন ও প্রকৃতি নিয়ে,
তাঁর অস্তিত্ব ও সত্ত্বার সাথে তাঁর গুণাবলীর সম্পর্ক নিয়ে,
কখন কীভাবে তাঁর কর্ম ও গুণ প্রকাশ পায়— তা নিয়ে,
তারা আরো গবেষণা করে—
পৃথিবীর বিনাশ ও অবিনাশ নিয়ে, নশ্বরতা ও অবিনশ্বরতা নিয়ে,
মৃত্যু পরবর্তী জীবনের খুটিনাটি নিয়ে,
ধর্মতত্ত্বের আরো নানা দিক ও প্রান্ত নিয়ে,

প্রকৃতির স্বাভাবিক নিয়ম ভেঙে গেলে পরবর্তীতে কীভাবে কী হবে— তা নিয়ে।

এ সবই হয় বড়ো আস্থার সাথে,
বড়ো নিশ্চিতির সাথে,
বড়ো বিস্তৃতি ও বিশ্লেষণের সাথে।

যেনো কোনো গবেষণাগারে বসে তারা গবেষণা করে করে রিপোর্ট পেশ করে যাচ্ছেন!!

মজার ব্যাপার হলো, দর্শনের এই সুদীর্ঘ জীবন সফরে কেউই দর্শনের এই মৌলিক ভুলটি ধরতে পারেন নি এবং এ জন্যে কারো মাঝে কোনো দায়বদ্ধতাও পরিলক্ষিত হয় নি। অথচ তখন সমালোচনা ও গবেষণা শিল্পে তাদের ছিলো অবাধ স্বাধীনতা ও মুক্ত পদচারণা। কিন্তু দর্শনের এতো বড় একটি ভুল চিহ্নিত করে তা শোধরানোর বেলায় তারা একেবারেই বে-খবর ও ব্যর্থ প্রমাণিত হলেন। অপরদিকে দর্শন শাস্ত্রের সমৃদ্ধ লাইব্রেরীগুলিতেও এমন দার্শনিকের নাম খুঁজে পাওয়া যায় নি, যারা এই 'ভুল' নিয়ে কথা বলেছেন এবং প্রতিবাদ করেছেন— অতি দুর্লভ ব্যতিক্রম ছাড়া।

হ্যাঁ .. আরব দর্শনের লম্বা ইতিহাসে সবার দৃষ্টি এড়িয়ে-যাওয়া এ সূক্ষ্ম দিকটি যিনি পুরোপুরি উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন এবং এ ব্যাপারে তাঁর দৃঢ় ও স্পষ্ট মত জানিয়ে বলেছিলেন : 'দার্শনিকদেরকে কে বলেছে একেবারে আল্লাহকে নিয়ে গবেষণা চালাতে এবং প্রকৃতিসম্মত বিষয়ের বাইরের জিনিস নিয়ে মেতে উঠতে! এ শ্রম নয়— পণ্ডশ্রম।' তিনি হলেন আরব জাহানের সুবিখ্যাত 'ইতিহাস-প্রতিভা-বিস্ময়' বরং সারা পৃথিবীর ইতিহাস-দর্শন-পণ্ডিত এবং সুবিজ্ঞ স্থাপত্যবিদ আল্লামা আবদুর রহমান ইবনে খালদুন রহ.। তিনি তাঁর কালজয়ী মুকাদ্দিমার একাধিক জায়গায় এ বিষয়টির কঠিন সমালোচনা করেছেন। তাঁর মতে— মানুষের বুদ্ধি ও প্রতিভার ঘোড়া যতো 'বোরাক-গতি'সম্পন্নই হোক, তার একটা নির্দিষ্ট সীমানা আছে। সে-সীমানা অতিক্রম করতে যাওয়ার অর্থই হলো বিভ্রান্তিতে ডুবে যাওয়া। শায়খ নদভী তাঁর মুকাদ্দিমা থেকে উদ্ধৃতি টেনে এ বিষয়টিকে আরো 'আয়না-পরিস্কার' করে দিয়েছেন এভাবে—

'যদি এমন চিন্তা তোমার মাথায় কাজ করে যে, সকল সৃষ্টিলোকের সৃষ্টি-রহস্য ও তার ইতিবৃত্তান্ত আয়ত্ব করতে তুমি সক্ষম, তাহলে এমন উদ্ভট চিন্তাকে মোটেই তুমি প্রশ্রয় দেবে না। অসার-অযৌক্তিক বলে উড়িয়ে দেবে। মনে রাখবে; সৃষ্টি জগত সম্পর্কে প্রত্যেক মানুষের জ্ঞানই সীমাবদ্ধ। কেউ-ই এ-সীমানা অতিক্রম করতে পারে না, কারণ বাস্তবতা সম্পূর্ণ ভিন্ন। এবং সত্য নিহিত আছে তার চিন্তা-শক্তির সীমানার বাইরে। আরেকটু স্পষ্ট করে বলি— 'বধির'-এর প্রতি লক্ষ্য করুন। সৃষ্টিলোকের গোটা অস্তিত্ব তার কাছে এসে থমকে দাঁড়িয়েছে— শুধু ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ও বুদ্ধিগ্রাহ্য অনুভূতির ভিতরে। শ্রবণেন্দ্রিয় তার কাছে অস্তিত্বহীন। অনুরূপ অবস্থা অন্ধ ব্যক্তির ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। তার কাছে দৃষ্টিগ্রাহ্য ও অবলোকনীয় জিনিস অস্তিত্বহীন।

সুতরাং যদি বধির ও অন্ধ ব্যক্তি যথাক্রমে শ্রবণেন্দ্রিয় ও অবলোকনেন্দ্রিয় সম্পর্কে জোরালো ধারণা না পেতো, তাহলে এরা তা স্বীকারই করতো না। কিন্তু ফিতরাত ও স্বভাবগত চাহিদার কারণে না হলেও এরা পিতা-মাতা ও নিকটজনদের কথায় বিশ্বাস করে এ সকল ইন্দ্রিয়-এর অস্তিত্ব ও বাস্তবতা মেনে নেয়। এ জন্যেই নির্বাক জন্তুর কাছে কিছু জানতে চাওয়া হলে সে জন্তুটা যদি তখন সত্যি-সত্যি সবাক হয়ে উঠে তাহলে এটা কোনো বিচারেই যুক্তিনির্ভর ও গ্রহণযোগ্য নয়।

আমাদের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগতের বাইরে আরেকটা জগত আছে। আমাদের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগত হলো একটি অস্থায়ী সৃষ্টবস্তু। কিন্তু আল্লাহ্‌র সৃষ্টিজগত মানুষের এই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগত থেকে আরো অনেক ব্যাপ্ত ও প্রসারিত। তা আয়ত্বে আনা অসম্ভব। সৃষ্টিলোকের পরিধিও আমাদের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগতের পরিধির তুলনায় সীমাহীন ব্যাপ্তিতে প্রসারিত। শুধু আল্লাহই জানেন সে ব্যাপ্তির সীমানা। সুতরাং আপনার অনুভবের সীমানা সীমিত ও চিহ্নিত। সে-সীমানা অনতিক্রম্য। আপনার কাজ শুধু আল্লাহ যা বিশ্বাস করতে বলেছেন তা বিশ্বাস করা এবং যা করতে বলেছেন তা করা। এটাই আপনার নাজাত, মুক্তি ও সফলতার একমাত্র পথ ও উপায়। এর মানে এ নয় যে, আপনার বুদ্ধি ও অনুভব শক্তিই ত্রুটিযুক্ত। বরং বুদ্ধি-বিবেচনা ও অনুভব শক্তিই হলো কোনো কিছু বিচার-বিশ্লেষণ করার আসল মানদণ্ড। এ-মানদণ্ডে যা কিছু উত্তীর্ণ হয়ে যাবে তা-ই মিথ্যার সংমিশ্রণ থেকে মুক্ত ও গ্রহণযোগ্য। তবে বুদ্ধির এ-মানদণ্ড দিয়ে যা ইচ্ছে তা-ই আপনি করতে পারবেন না। এ মানদণ্ড দিয়ে আল্লাহ্‌র তাওহীদ ও একত্ববাদকে আপনি মাপতে যাবেন না। আখেরাতকে মাপতে যাবেন না। নবুয়তের অন্তর্নিহিত রহস্য উদ্ঘাটন করতে যাবেন না। আল্লাহ্‌র 'সিফাত' ও গুণাবলীর নিগূঢ় তত্ত্ব উদ্ঘাটন করতে যাবেন না। এ-সব মাপা ও উদ্ঘাটন করা আপনার ক্ষুদ্র বুদ্ধির কাজ নয়। বরং অসম্ভবকে সম্ভব করতে চাওয়া। উদাহরণ দিচ্ছি— মনে করুন একজন লোক একটি স্বর্ণ মাপার পাল্লা দেখলো। তখন সে তা দিয়েই একটা পাহাড় মাপতে চাইলো। বলুন তো! এটা কি যুক্তিসঙ্গত? বুদ্ধিগ্রাহ্য? বলা যাবে কি যে, আসলে পাল্লাটাই ভালো ও উপযোগী না? পাল্লা আসলে ঠিকই আছে। কিন্তু যতো গোলমাল বেধেছে, সে ঐ বুদ্ধিটাতেই। কারণ, বুদ্ধি কখনোই তার নির্ধারিত সীমানা অতিক্রম করতে পারে না। এখন বলুন; এই ক্ষুদ্র বুদ্ধি দিয়ে আল্লাহ্‌র.. তাঁর

গুণাবলী'র রহস্য বোঝা কি সম্ভব? বুদ্ধি তো আল্লাহ্‌র অসংখ্য অগণিত সৃষ্টিলোকের অতি ক্ষুদ্র একটি কণা!' [১]

শায়খুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমিয়া রহ.ও তাঁর বিভিন্ন গ্রন্থের বিভিন্ন জায়গায় এ বিষয়টি আলোকপাত করেছেন এবং স্পষ্ট ভাষায় বলিষ্ঠভাবে এ-সত্যকে তুলে ধরেছেন তাঁর বিভিন্ন ধর্মতাত্ত্বিক গবেষণাধর্মী লেখায়। পাশাপাশি দার্শনিকদের ভুলগুলো চিহ্নিত করে দিয়েছেন— দাঁতভাঙা জবাব।

এ ক্ষেত্রে সবচে' বেশি বীরত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন প্রখ্যাত জার্মান দার্শনিক ইম্মানুয়েল ক্যান্ট (Emmanuel Kant- (১৭২৯-১৮০৪)। তিনি এই কাল্পনিক দর্শন শুধু খণ্ডনই করেন নি, তার পেছনে ছুটে চলা দার্শনিকদের আত্মপ্রতারণাময় মুখোশও উন্মোচন করে দিয়েছেন। তার বক্তব্যের খোলাসা হলো— বুদ্ধিকে পাগলা ঘোড়া বানিয়ে যে দিকে ইচ্ছে সে দিকেই ছুটে যাওয়া যায় না। বুদ্ধির একটা সীমানা আছে। সব সময় বুদ্ধিকে সে-সীমানার ভিতরেই থাকতে হবে। নইলে বিপদ পদে-পদে। স্খলন মুহূর্তে-মুহূর্তে।

এ-জার্মান দার্শনিকের প্রশংসা করেছেন খ্যাতিমান মুসলিম দার্শনিক আল্লামা ড. ইকবাল রহ. নিজেও। তিনি তাঁর تجديد الفكر الديني في الإسلام (ইসলামে ধর্মীয় চিন্তা-সংস্কার) গ্রন্থে এই জার্মান দার্শনিকের কথা উল্লেখ করে বলেন 'তিনি তথাকথিত এই দার্শনিকদের কর্মকাণ্ডকে ধ্বংস করে একেবারে মাটির স্তূপে পরিণত করেছেন— তাঁর প্রসিদ্ধ গ্রন্থ Critque of pure qeason এর মাধ্যমে।'

ধর্মীয় দর্শনের ত্রুটি ও অসম্পূর্ণতা

শায়খ আবুল হাসান আলী নদভী রহ. এখানে দর্শনের আরেকটি বিশেষ প্রকারের কথাও বলেছেন, যে-দর্শনের বেড়াজালে আটকে পড়ে অনেকেই বিভ্রান্ত হয়েছেন। দর্শনের এ-প্রকারটিকে সাধারণত 'ইলমুল কালাম' বা ধর্ম-দর্শন বলা হয়। শায়খ নদভী এ-দর্শন সম্পর্কে আলোকপাত করতে গিয়ে বলেছেন

[১] (মুকাদ্দিমা, ইবনে খালদুন, পৃষ্ঠা: ৩২২-৩২৩)

'প্রাচীন দর্শনের বিপরিতে ধর্মকে সহয়তা দেয়ার জন্যে যে দর্শনটির জন্ম ও উৎপত্তি এখানে তার সমালোচনা করাটা মোটেই অন্যায়সঙ্গত হবে না। মূলত এটিকে' কোনো 'পৃথক দর্শন' বলা ঠিক নয়। যদিও বিষয়বস্তু ও যুক্তি-উপস্থাপন-পদ্ধতির দিক থেকে দর্শনের সাথে এর একটা সাজুয্য রয়েছে। অর্থাৎ আল্লাহ্‌র স্বত্ত্বা ও গুণাবলী প্রমাণের চেষ্টা করা এবং বুদ্ধিগ্রাহ্য নয়— এমন জিনিসকে বুদ্ধিগ্রাহ্য পদ্ধতি ও উপায়ে সাব্যস্ত করার চেষ্টা করা। পারস্পরিক বিরোধ সত্ত্বেও প্রাচীন দর্শন এবং কথিত এ-ধর্মীয় দর্শনের ভিতরে মৌলিকভাবে একটা মিল রয়েছে। এখানে আমি ধর্মীয় দর্শন বলতে বুঝাতে চাচ্ছি সে-দর্শনকে, যা ধর্মতাত্ত্বিক এবং প্রকৃতির স্বাভাবিক পরিণতি-পরবর্তী-বিষয়সমূহ নিয়ে, অনুপুঙ্খ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ নিয়ে ঠিক প্রচীন দর্শনের মতোই লিপ্ত হয়। এবং এ-আলোচনা ও ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণকে গভীরে নিতে-নিতে এমন পর্যায়ে নিয়ে যাওয়া হয়, যেখানে এসে গ্রীক দর্শনের সাথে এ-'দর্শন'-এর আর কোনো তফাতই থাকে না। যদিও শেষ পরিণতিতে দু'টি দু' দিকে প্রবাহিত হয়।'

এভাবেই শায়খ নদভী 'ইলমে কালাম'কে সমালোচনা করেছেন। কেননা তা গ্রীক দর্শনের মুকাবিলায় ব্যর্থ হয়েছে। ব্যর্থতার কারণ হলো এই যে, তা গ্রীক দর্শনের বিরুদ্ধে এমন কোনো অস্ত্রই ব্যবহার করতে পারে নি, যা ধারালো ও কার্যকর। এখানেই পরিস্কার ফুটে উঠে মানব-জ্ঞানের সীমাবদ্ধতা ও তার জানা-শোনার অপ্রতুল উপায়-উপকরণের প্রকটতা।

দার্শনিকদের পক্ষে কথা বলতে গিয়ে মানব-জ্ঞানের সীমাবদ্ধতার এ বিষয়টিই পরিস্কার করে তুলে ধরে ইবনে রূশদ ইমাম গাযালী'র জবাব দিয়েছেন এভাবে :

'আমার মতে এ-সব নিয়ে গবেষণার অর্থ হলো— শরীয়ত নিয়ে বাড়াবাড়ি করা। শরীয়ত নির্দেশ দেয় নি— এমন জিনিস নিয়ে গবেষণা করা, বাড়াবাড়ি ছাড়া আর কী! মানুষ কেনো ভুলে যায় যে, এ ক্ষেত্রে তার জ্ঞান-বুদ্ধি সীমাবদ্ধ? .. তবে এর মানে এ নয় যে, 'শরীয়ত নীরব'— এমন কোনো বিষয় নিয়ে গবেষণা করা যাবে না। বরং অধিকাংশ দার্শনিকের মতে এ-নিষেধাজ্ঞা কেবল আকিদাগত বিষয়ের ব্যাপারে। কেননা আকিদাগত বিষয়েই দর্শনের অনুপুঙ্খ বিচার-বিশ্লেষণ যতো বিপত্তির সৃষ্টি করে এবং সব তালগোল পাকিয়ে ফেলে। সুতরাং আকিদাগত যে সকল বিষয়ে শরীয়ত নীরব, তাকে দর্শন-গবেষণার বিষয়বস্তু বানানো

সর্বত:ভাবেই বর্জনীয়। কেননা এ বিষয়ে গবেষণা করার মতো জ্ঞান-বুদ্ধি মানুষের নেই।'[১]

ইবনে রূশদ দার্শনিকদের বিপক্ষে الكشف عن مناهج الأدلة في عقائد الملة নামক যে গ্রন্থটি লিখেছেন, তাতে তিনি কুরআন দ্বারা যুক্তি উপস্থাপনের অকাট্যতা ও দৃঢ়তাকে এবং দর্শনভিত্তিক যুক্তি উপস্থাপনের উপর তার শ্রেষ্ঠত্বকে বড়ো সাবলীল ভঙ্গিতে এবং 'লা-জওয়াব' তথ্য-তত্ত্বে সমৃদ্ধ করে উপস্থাপন করেছেন। এ সব বিষয় উপলব্ধি করতে 'অধিকাংশ দার্শনিকদের' অক্ষমতার কথাও তিনি এ-গ্রন্থে বলেছেন। এ কারণেই ইবনে রূশদের এ-গ্রন্থটি (দর্শনের ময়দানে) তাঁর সুস্থ চিন্তার একটি আদর্শ ও অনুসরণীয় নমুনা।

কিন্তু শায়খ নদভী ইবনে রূশদের কথা ও মন্তব্যের সাথে একমত হলেও ইবনে রূশদের মন্তব্যের উপর বড়ো বিরল মন্তব্য করেছেন তিনি— বড়ো আত্মবিশ্বাসের সাথে, বড়ো দৃঢ়তার সাথে, বড়ো প্রজ্ঞার সাথে। তিনি বলেন : 'আমি তাঁর মতের সাথে সম্পূর্ণ একমত। সত্যি মানব-বুদ্ধি ও ক্ষমতা এ সব বিষয় অনুধাবন করতে এবং তা নিয়ে গবেষণা করতে অক্ষম, অপারগ। কিন্তু এটা সাধারণ মানুষের ক্ষেত্রে যেমন প্রযোজ্য আমি মনে করি 'সকল' দার্শনিকের ক্ষেত্রেও সমভাবে প্রযোজ্য। আমি মনে করি; প্লেটো, এ্যারস্টেটল, ফারাবি, ইবনে সিনা ও ইবনে রূশদ— সবাই এ-মানব কাফেলারই সদস্য। নিজেদের স্থান ও অবস্থান এবং বুদ্ধি ও ক্ষমতা সম্পর্কে তাঁদেরও সচেতন থাকা উচিত। তাঁদেরও উপলব্ধি করা উচিত যে, তাঁদের জ্ঞান-বুদ্ধিও অন্য সব মানুষের জ্ঞান-বুদ্ধির মতোই অসম্পূর্ণ, ত্রুটিযুক্ত। স্রষ্টাতত্ত্ব ও সৃষ্টি-রহস্যের মতো সুক্ষ্ম বিষয়াবলী উদ্ঘাটনে অন্য সব মানুষের জ্ঞান-বুদ্ধির মতো তাঁদের জ্ঞান-বুদ্ধিও অসম্পূর্ণ, ত্রুটিযুক্ত ও অসহায়। স্থির ও নিশ্চিত পরিণতিতে এবং অকাট্য ও বিশুদ্ধ জ্ঞানে উপনীত হওয়া— তাঁদের পক্ষেও অসম্ভব। এমনকি এর জন্যে যে প্রাথমিক জ্ঞানটুকু ও মূলনীতিটুকু দরকার, তাও তাঁদের অজানা।

এ ক্ষেত্রে সবচে' বড় বাড়াবাড়িটা করেছে 'মু'তাযিলা' সম্প্রদায়টি। এ সকল ধর্মীয় দার্শনিকদেরকে পেছনে ফেলে তারা বুদ্ধির পাগলা-ঘোড়া দাপিয়ে দাপিয়ে ছুটে বেড়াচ্ছিলো। কখনো একটু রাশ টেনে ধরারও সুযোগ

---

[১] তাহাফুতুত তাহাফুত: ১১০ পৃষ্ঠা

হয় নি তাদের। বাড়াবাড়ি করতে-করতে তারা আল্লাহকে কিয়াস করে বসেছিলো মানুষের উপর আর দুনিয়াকে আখেরাতের উপর। অতঃপর তার উপর ভিত্তি করে একের পর এক ছুরি চালিয়েছিলো ধৃষ্টতাপূর্ণ বল্গাহারা মন্ত ব্যের। একটু ভেবে দেখারও ফুরসত হলো না— তারা 'মানুষ'। বুদ্ধি তাদের সীমাবদ্ধ, অসম্পূর্ণ ও অসহায়।'

শায়খ এখানে মু'তাযিলাদের ব্যাপারে সমকালীন একজন বিখ্যাত ঐতিহাসিকের মন্তব্য উদ্ধৃত করেছেন। যিনি মু'তাযিলাদের বুদ্ধিবৃত্তিক ঝোঁক ও চিন্তাবৃত্তিক স্বাধীনতার প্রশংসায় নিজের মুগ্ধতা যেমন ঢেকে রাখতে পারেন নি, তেমনি ইনসাফ ও স্পষ্টবাদিতার সাথে তাদের দোষ-ক্রটি ও দুর্বলতার কথা তুলে ধরতেও কার্পণ্য করেন নি। তিনি হলেন ইসলামী চিন্ত া-ইতিহাসের অন্যতম রূপকার ড. আহমদ আমিন। বিশেষভাবে যা রূপায়িত হয়েছে তাঁর বিখ্যাত ত্রয়ীগ্রন্থ : فجر الإسلام (ইসলামের ভোর), ضحى الإسلام (ইসলামের সকাল (পূর্বাহ্ন) এবং ظهر الإسلام (ইসলামের জোহর (মধ্যাহ্ন)-এর পাতায় পাতায়। ضحى الإسلام (ইসলামের সকাল (পূর্বাহ্ন) গ্রন্থে ড. আহমদ আমিন বলেন :

'সম্ভবত তাদের (মু'তাযিলাদের) দুর্বলতার মূল কারণ ছিলো এই যে, তারা 'অদৃশ্য'কে (আল্লাহকে) 'দৃশ্য' (মানুষ)-এর উপর কিয়াস (তুলনা) করে বাড়াবাড়ি করে বসেছিলো এবং পরিণতিতে আল্লাহকেও তারা এই বিশ্ব জগতের নিয়ম-নীতির অধীন বলে মনে করে বসেছিলো। যেমন তারা মনে করতো যে, 'পৃথিবীর নিয়ম অনুযায়ী মানুষে-মানুষে ইনসাফ প্রতিষ্ঠা ও ন্যায়বিচার যেমন বাধ্যতামূলক ঠিক তেমনি আল্লাহ্‌র জন্যেও এই ইনসাফ ও ন্যায়বিচার একইভাবে বাধ্যতামূলক'। অথচ তারা ভুলে বসেছিলো যে, আল্লাহ কোনো নিয়ম-নীতির অধীন ও মুখাপেক্ষী নন। তা ছাড়া মানুষের চোখে আজ যা ন্যায়বিচার, স্থান-কাল-পাত্র–এর ব্যবধানে তা-ই তো পরিণত হয় অবিচারে?! এটি সম্পূর্ণ আপেক্ষিক বিষয়। এ জন্যেই প্রথম যুগে যা 'ন্যায়বিচার' হিসাবে সাব্যস্ত হয়ে আসছিলো তা-ই মধ্যযুগে এসে 'অবিচারে' বদলে যাচ্ছে। তাহলে দুনিয়ার জীবন পার হয়ে পর জীবনে আল্লাহ্‌র কাছে যাওয়ার পরও কী করে এই 'ন্যায়বিচার' এর অর্থ ও মর্ম এক ও অভিন্ন থাকতে পারে?! অনুরূপভাবে তারা বাড়াবাড়ি করেছে— সুন্দর-অসুন্দরের এবং উপযোগী-অনুপযোগী'র ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে। আমরা মনে করি; সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গির কবলে আটকা পড়লে মানুষ যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ

করে, সংকীর্ণতার কবল থেকে মুক্তি পেলে আবার সে পূর্ব-সিদ্ধান্ত থেকে বেরিয়েও আসে।'[১]

'অনুরূপভাবে তারা যে বলে : 'আল্লাহর গুণাবলীই হলো 'অবিকল' আল্লাহ অথবা 'গায়রুল্লাহ', এ ক্ষেত্রেও তাদের সকল যুক্তি-প্রমাণ আবর্তিত হয়েছে উপরোক্ত কিয়াস অর্থাৎ 'অদৃশ্য'কে (আল্লাহকে) 'দৃশ্য' (মানুষ)-এর উপর কিয়াস (তুলনা) করে। অথচ অদৃশ্য আর দৃশ্য-এর মাঝে কোনো তুলনা বা 'উপমা-ক্ষেত্র' নেই। (অর্থাৎ একটিকে আরেকটির সাথে তুলনা করতে হলে উভয়টির মাঝে যে মিল ও সাযুজ্য থাকা অপরিহার্য, এখানে তা অবিদ্যমান।) তারা ধরে নিয়েছিলো যে, 'স্বরূপে আবির্ভূত হওয়া বা ভিন্নরূপে আবির্ভূত হওয়া, সময় সংশ্লিষ্ট হওয়া, স্থান সংশ্লিষ্ট হওয়া, কার্যকারণ হওয়া বা কার্যকারক হওয়া— সবই হলো প্রতিটি অস্তিত্বশীল বস্তুর জন্যে অপরিহার্য নীতিমালা।' (সুতরাং আল্লাহ যেহেতু অস্তিত্বশীল, সেহেতু তাঁর জন্যেও এ সব নীতিমালা অপরিহার্য।) আমার মতে, তাদের এ-মতবাদ সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। কেননা, এ সব মানবীয় নীতিমালা। অর্থাৎ আমরা যে জগতে বসবাস করি সে জগতের নীতিমালা। সুতরাং মানবীয় জগতের কোনো নীতিমালাকে অন্য জগতের জন্যেও স্থির করা— মোটেই গ্রহণযোগ্য নয়। তাহলে মানবীয় এ সব নীতিমালাকে আল্লাহ্‌র উপর সাব্যস্ত করা— এ কি রীতিমত ধৃষ্টতা নয়? চরম সীমালংঘন ও বাড়াবাড়ি নয়? .. কোনোভাবেই এটা মেনে নেয়া যায় না।

এ সমস্যা শুধু মু'তাযিলাদের সমস্যা নয়, বরং তাদের পরবর্তীতে আগত ধর্মতাত্ত্বিক দার্শনিকেরাও এমন মত-বিশ্বাসে আক্রান্ত হয়ে পড়েছিলেন।[২]

শায়খ নদভী রহ. নিজে যে সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন এবং তাঁর এ সিদ্ধান্তের পক্ষে তিনি তাঁর 'নতুন-পুরাতনের সমন্বয়ে বলীয়ান' দীর্ঘ গবেষণা থেকে যে যুক্তি পেশ করেছেন, তা আমাদেরকে অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে বলে যে, আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান সাফল্যের যতো শীর্ষচূড়ায়-ই উপনীত হোক না কেনো, আবিস্কার-উদ্ভাবনায় উৎকর্ষতার যতো দূরে-দিগন্তই ছুঁয়ে ফেলুক না কেনো, মানব-বুদ্ধির সীমাবদ্ধতা ও অক্ষমতাকে কোনোভাবেই অতিক্রম করতে পারবে না। বুদ্ধির দৌড়ের একটা সীমানা

---

[১] ضحى الإسلام ৩/৬৯

[২] ضحى الإسلام ৩/৭০

আছে— নিষিদ্ধ সীমানা, অনতিক্রম্য সীমানা। এ-সীমানার কাছে এসে বুদ্ধিকে অক্ষমতার দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে অসহায়ত্ব প্রকাশ করতে হবেই। এ সীমানা পেরিয়ে ভিতরে প্রবেশ করার কোনো পথ নেই, উপায়ও নেই। কারণ এর জন্যে যে 'ভিসা' প্রয়োজন, তা বুদ্ধির জন্যে শুধু দুর্লভ্যই নয়, অসম্ভব-লভ্যও।

এক সময় কোনো কোনো দার্শনিক ভেবে বসেছিলেন যে, তারা সব রহস্যেরই কিনারা করে ফেলেছেন। কিন্তু সে ভাবনা কেবলই মরীচিকাময় ভাবনা। কখনোই তা বাস্তবতার নাগাল পায় নি। এমন কোনো দার্শনিকই খুঁজে পাওয়া যাবে কি, যার রয়েছে সুনির্দিষ্ট চিন্তাদর্শন ও মতবাদ? হোক না তা বাহ্যজগত কিংবা আত্মাজগত সম্পর্কে? অথবা বাস্তবজগত বা উপমা-জগত সম্পর্কে? ... নেই! আসলেই নেই! এমন কোনো দার্শনিকের সন্ধান আজো মিলে নি, পরবর্তীতে আরেক দার্শনিক এসে যার মতবাদ ও চিন্ত াদর্শনকে ক্ষত-বিক্ষত করেন নি কিংবা খন্ডন করেন নি— বুদ্ধি ও যুক্তির সে পথ ধরেই, যে পথে তারা উভয়েই চলেন একান্ত বিশ্বাসের সঙ্গে.. নির্ভরতার সঙ্গে।

এ জন্যেই বুঝি দর্শনের এক মহান শিক্ষক ড. আবদুল হালীম মাহমুদ বলতে বাধ্য হয়েছিলেন : 'দর্শন! আসলে তার কোনো মৌলিক ভিত্তিই নেই। কেননা এ-দর্শন আজ বলছে যে কথা, কাল বলছে ঠিক তার উল্টোটা। মানুষের কাজে লাগে— এমন কোনো সাফল্যই আজ পর্যন্ত দর্শন অর্জন করতে পারে নি। পেশ করতে পারে নি মানুষের সামনে বিশ্বাস-দ্যুতিত দেদীপ্যমান কোনো ফলাফলও।

পারবেই বা কেমন করে?

দ্যুতিত বিশ্বাসের একমাত্র উৎস হলো— ওহী।

এই ওহীই উত্তর দিতে পারে সবকিছুর।

সমাধান দিতে পারে সব সমস্যার।

কিনারা করতে পারে সব রহস্যের।

নতুনের, পুরাতনের।

কোত্থেকে? কোথায়? কেনো? ... সব প্রশ্নের উত্তরের।

এমন উত্তরের, যাতে হৃদয় হয় প্রশান্ত,

খুলে যায় অবিশ্বাস ও দ্বিধা-দ্বন্দ্বের সব গিঁট।

অপসৃত হয়ে যায় সংশয়-সন্দেহের সকল কুয়াশা।

وَمَنْ لَمْ يَجْعَلْ اللّٰهُ لَهُ نُوراً فَمَا لَهُ مِن نورٍ

'আল্লাহ যার জন্যে আলো বরাদ্দ করেন নি, তার আলো আসবে কোত্থেকে!' -নূর: ৪০[১]

আমরা অনেক জগতখ্যাত নামী-দামী পর্যবেক্ষক ও দার্শনিকদেরকে দর্শনের উত্তাল-সমুদ্রে সাঁতার কাটতে দেখেছি। দেখেছি গবেষণা ও ঝড়তোলা বিতর্কের তলদেশে ডুব দিতে, কিন্তু তারা তীর খুঁজে পান নি, ফিরে এসেছেন শূন্য-হাতে—ব্যর্থতার বুক-বুক বেদনা নিয়ে। অবশেষে সীমালংঘনের অনুভূতিতে দগ্ধ হয়ে কামনা করেছেন— কেবল ঈমানী মৃত্যু। জান্নাতের কোলে একটুখানি জায়গা।

দর্শনের আরেক দিকপাল ইমাম ফখরুদ্দীন রাযি রহ. বলেছেন : 'দর্শনের পথ ও পন্থা নিয়ে অনেক তো ভাবলাম। কিন্তু বিশ্বাস করুন; এমন কিছুই খুঁজে পেলাম না, যা নিবারণ করতে পারে পিপাসার্তের পিপাসা এবং ব্যাধিগ্রস্তকে দিতে পারে আরোগ্যের ঠিকানা। সুতরাং আমার স্পষ্ট ঘোষণা হলো— কুরআনের পথই সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ পথ। এ-ই হলো আমার অভিজ্ঞতা ও সিদ্ধান্ত। আমার দৃঢ় বিশ্বাস; যার হবে আমার অভিজ্ঞতা, তার সিদ্ধান্তও হবে আমার সিদ্ধান্ত।'

আল্লামা শেহরেস্তানী দার্শনিকদের শেষ পরিণতিকে চিত্রিত করেছেন কবিতার বিন্যাসে এভাবে—

لقد طفتُ تلك المعاهدَ كلها + وسرحتُ طرفي بين تلك المعالم!

فلم أرَ إلا واضِعاً كَفَّ حائرٍ + على ذُقْنٍ، أو قارعا سِن نادمٍ!

'সে সব শিক্ষায়তন একে একে আমি ঘুরে দেখেছি,
'চক্ষু মেলিয়া' অবলোকন করেছি তার চিহ্নসমূহ।
কিন্তু হায়! দেখেছি কেবল চিবুক-ধরা একঝাঁক অস্থির মানুষকে,
কিংবা আক্ষেপে-অনুশোচনায় দাঁত কামড়াতে!'

সাক্ষী হিসাবে এরাই তো যথেষ্ট! এরা যে 'এ-শিল্পেরই শিল্পী'! এঁদের সাক্ষীই তো আসল সাক্ষী!!

* * *

---

[১] الفلسفة والحقيقة (দর্শন ও বাস্তবতা), লেখক: শায়খ আবদুল হালীম মাহমুদ, প্রথম শায়খুল আযহার

তৃতীয় অধ্যায়

সায়্যিদ আবুল হাসান আলী নদভী রহ. যখন সমাজ সংস্কারক

> শায়খ নদভী'র ব্যক্তিত্বে সংস্কারকের বৈশিষ্ট্য
> সংস্কার এবং শায়খ নদভী'র দৃষ্টিভঙ্গি
> শায়খ নদভী ও শায়খ হাসানুল বান্না
> শায়খ নদভী ও রাজনৈতিক বিবর্তন
> শায়খ নদভী'র সংস্কার পদ্ধতি ও সংস্কার দর্শন
> দল গঠন ও সামাজিক পরিবর্তন
> সংস্কার ঃ শায়খ নদভী'র দৃষ্টিতে সর্বোত্তম পন্থা

তৃতীয় অধ্যায়

আবুল হাসান আলী নদভী রহ. যখন সংস্কারক

শায়খ নদভী রহ. এর গ্রন্থের পাঠক যারা অথবা তাঁর আলোচনা ও বক্তৃতার শ্রোতা যারা, তাদের এ ব্যাপারে কোনো সন্দেহ থাকার কথা নয় যে, শায়খ নদভী ছিলেন এ-যুগের এক মহান সংস্কারক। 'শ্রেষ্ঠ উম্মত' হিসাবে উম্মতে মুহাম্মদী'র উপর যে গুরু-দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছে তা পালনের জন্যে। উম্মাহর মন-মানস সংস্কারের ক্ষেত্রে, তাদের ভিতরে 'ঈমানী জাগরণ' সৃষ্টি করার ক্ষেত্রে এবং তাদেরকে নব-চেতনায় উদ্দীপ্ত করার ক্ষেত্রে শায়খ নদভী রহ. -এর রয়েছে এক বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত চিন্তাধারা ও দৃষ্টিভঙ্গি। এই সংস্কার-দায়িত্ব পালনের জন্যে তিনি প্রচলিত ধারায় কোনো দল গঠন না করলেও এবং কোনো সংগঠন প্রতিষ্ঠা না করলেও এমন এক শিক্ষায়তনের সাথে সংশ্লিষ্ট, যা 'সদা-জাগ্রত' ঈমানী চেতনা ও বৈশিষ্ট্যে দেদীপ্যমান। যার বলয় ও আবহে উম্মাহর সামগ্রিক কল্যাণ কামনায় সদা চিন্তামগ্ন কিছু 'জীবন্ত' হৃদয়।

সংস্কারকের বৈশিষ্ট্য

একজন সংস্কারকের প্রথম বৈশিষ্ট্য হলো এই যে, তাঁকে জানতে হবে- উম্মতের সমস্যা কী। তাদের আশা-আকাঙ্খা ও স্বপ্ন-সাধ কী। তাদের উত্তরণের পথে বাধা-বিপত্তি ও প্রতিবন্ধকতা কী।

সংস্কারকের দ্বিতীয় বেশিষ্ট্য হলো এই যে, উম্মতের সঙ্কট ও সমস্যা দূরীকরণের ব্যাপারে তাঁর স্পষ্ট ধারণা ও জ্ঞান থাকতে হবে। উপযুক্ত সমাধান খুঁজে বের করার যোগ্যতা থাকতে হবে। সুতরাং প্রথম বৈশিষ্ট্যের আলোকে নির্ণিত হবে রোগ আর দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্যের আলোকে নির্ণিত হবে ঔষধ।

সংস্কারকের ভিতরে তৃতীয় যে বৈশিষ্ট্যটি থাকতে হবে তা হলো— রুগীকে ঔষধ সেবনের জন্যে মানসিকভাবে পুরোপুরি প্রস্তুত করে তোলা। অর্থাৎ ঔষধ সেবনের প্রয়োজনীয়তা, উপকারিতা ও ফলাফল সম্পর্কে অবহিত করা এবং সাময়িক ঔষুধ-তিক্ততায় ধৈর্য ধরতে উদ্বুদ্ধ করা।

পাশাপাশি তার মনে এ-কথাও বদ্ধমূল করে দেয়া যে, এ-ঔষধ সেবনেই রয়েছে তার রোগমুক্তির নিশ্চিতি, আল্লাহ্‌র ইচ্ছায় অবশ্যই সে সুস্থ হয়ে উঠবে।

সফল ও অভিজ্ঞ চিকিৎসক যারা, রুগীদের সাথে তাদের আচরণ এমনই হয়ে থাকে। অনুরূপভাবে সত্যিকারের সমাজ-সংস্কারক যারা, উম্মত ও সমাজের সাথেও এমনই হয়ে থাকে তাদের আচরণ ও সংস্কারপন্থা।

সামনের পৃষ্ঠাগুলোতে শায়খ নদভী রহ. এর সংস্কার-চিন্তার এ-দিগন্ত টাই আমরা উন্মোচিত করবো। আমরা পরিস্কার দেখতে পাবো— একদিকে তিনি উম্মতের রোগ নির্ণয় করছেন আরেকদিকে প্রতিকার বাতলে দিচ্ছেন— সীমাহীন দক্ষতা ও মায়াময়তায়।

শায়খ নদভী'র জীবনে সমসাময়িক ঘটনাপঞ্জির প্রভাব

বিংশ শতাব্দীর ঘটনাবিক্ষুব্ধ সময়কালটায় শায়খ নদভী ছিলেন পূর্ণ পরিণত। সবকিছুই ঘটেছিলো তাঁর চোখের সামনে। নিঃসন্দেহে হিন্দুস্তান, মুসলিম জাহান এবং প্রাচ্য-প্রতীচ্যসহ সমগ্র পৃথিবী জুড়ে ঘটে-চলা এ-ঘটনাবলী— গভীর প্রভাব ফেলেছিলো তাঁর মন-মানসে। তাঁর মতো এক সুপরিণত ব্যক্তিত্ব এই ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ বিশ্ব পরিস্থিতি থেকে কোনোভাবেই দৃষ্টি সরিয়ে রাখতে পারেননি কিংবা উদাসীন থাকতে পারেন নি। বরং তিনি সবই পূর্ণমাত্রায় উপলব্ধি করেছেন এবং প্রভাবিত হয়েছে তার চিন্তা-চেতনা ও হৃদয়-মন। প্রতিকারের জন্যে হয়তো তিনি হাত বাড়াতে পারেন নি, কিন্তু তাঁর দৃষ্টি তো ছিলো প্রসারিত! তিনি দেখেছেন তো সবই! পর্যবেক্ষণের দ্বার তো রুদ্ধ ছিলো না! এই বেদনাময় বিশ্ব পরিস্থিতি ঝড় তোলে তাঁর চিন্তায়-অনুভবে। রক্তক্ষরণ ঘটায় তাঁর হৃদয়-মনে। মানবতার করুণ দশায় বারবার ঝাপসা হয়ে আসে তাঁর চোখের পাতা। কবির সাথে কণ্ঠ মিলিয়ে তখন তিনিও হাহাকার করে উঠেন—

قلبي يُحِسُّ، وهذه عيني ترى + ما حيلتي فيما أحس وما أرى؟

'হৃদয় আমার অনুভব করছে, চোখও আমার প্রত্যক্ষ করছে,

কিন্তু এ-অনুভব-অবলোকনে কোনো উপায় যে আমি স্থির করতে পারছি না?!'

শায়খ নদভীকে দেখতে হয়েছে হিন্দুস্তানের বুকে ব্রিটিশ বেনিয়াদের অপশাসন। অথচ এমনটি হওয়ার কথা ছিলো না। এর আগে শতাব্দীর পর

শতাব্দী ধরে এই হিন্দুস্তান শাসন করেছে মুসলমানরা। তাদের সুশাসনের ছায়ায় এখানে গড়ে উঠে গরবের ইতিহাস, প্রাণের ঐতিহ্য ও স্বপ্নের সভ্যতা। অর্জিত হয় আকাশ-ছোঁয়া অর্থনৈতিক সাফল্য। স্থাপিত হয় আধ্যাত্মিকতার শত-শত আলোকমিনার। নৈতিকতার অসংখ্য বাতিঘর।

শায়খ নদভী রহ. ব্রিটিশ আগ্রাসনের বিরুদ্ধে দেশ-প্রেমিক প্রতিরোধ-যোদ্ধাদের উত্তাপ ছড়ানো লড়াইও প্রত্যক্ষ করেছেন। প্রত্যক্ষ করেছেন এ-প্রতিরোধ লড়াইয়ে মুসলমানদের ঐতিহাসিক ভূমিকা। উলামায়ে কেরামের দূরদর্শী নেতৃত্ব ও রক্তময় ত্যাগ। যাঁদের চোখের ইশারায় লাখো মুসলমান সেদিন ঝাঁপিয়ে পড়েছিলো আযাদির মহা সংগ্রামে। সিপাহসালার ছিলেন মাওলানা আবুল কালাম আযাদ রহ., শায়খুল হিন্দ মাওলানা মাহমুদুল হাসান রহ., শায়খুল হাদীস মাওলানা হোসাইন আহমদ মাদানী রহ.সহ দারুল উলুম দেওবন্দেন অন্যান্য উলামায়ে কেরাম।

শায়খ নদভী আরো প্রত্যক্ষ করেছেন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের কবল থেকে হিন্দুস্তানের মুক্তি এবং তার বিভাজন। একদিকে পূর্ব-পশ্চিম পাকিস্তান নিয়ে মুসলমানরা, আরেকদিকে হিন্দুস্তান নিয়ে হিন্দুরা। দ্বি-জাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে এই বিভাজনের পরও কোটি কোটি মুসলমান থেকে গেলেন হিন্দুস্তানেই- ইতিহাসের টানে, ঐতিহ্যের মায়ায়। জন্মভূমির ভালোবাসায়। সর্বোপরি সালফে সালেহীন ও আকাবির-কাফেলার ছায়ায়। যদিও হিন্দুস্তানে থেকে-যাওয়াটা পরবর্তীতে তাদের জন্যে মোটেই সুখকর প্রমাণিত হয় নি। সইতে হয়েছিলো তাদেরকে অনেক দুর্ভোগ-লাঞ্ছনা ও জুলুম-নিপীড়ন।

শায়খ নদভী হাসানুল বান্না ও অন্যান্য সংস্কারকদের মতো আরো লক্ষ্য করেছেন যে, ইসলামী দেশগুলো, বিশেষত এশিয়ার ইসলামী দেশগুলো— কী বেদনাদায়কভাবে পশ্চিমা পুঁজিবাদী কিংবা প্রাচ্যের কমিউনিজমপন্থী উপনিবেশে আক্রান্ত হয়ে পড়েছে। তারপর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষে শায়খ দেখেছেন উপনিবেশের কবল থেকে মুক্তির লক্ষ্যে দানা বেঁধে-ওঠা অগ্নিময় গণ-আন্দোলন এবং সামরিক-রাজনৈতিক-উপনিবেশ বাদ-চক্রের বিরুদ্ধে অর্জিত বিজয়ধারা— একের পর এক। আর এ-মুক্তি আন্দোলনের পুরোভাগে ছিলেন উলামা-মাশায়েখ এবং অনেক ইসলামী সংস্থা ও প্রতিষ্ঠানের নেতৃবৃন্দ।

কিন্তু বড়ো বেদনাদায়ক সত্য হলো এই যে, এ-মুক্তি ছিলো— আংশিক মুক্তি। কেননা, সামরিক ও রাজনৈতিক উপনিবেশবাদের কবল থেকে মুক্তি অর্জিত হলেও চিন্তা-দর্শনভিত্তিক, সাংস্কৃতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক উপনিবেশ থেকে মুক্তি অর্জিত হয় নি। কেননা, পরবর্তীতে প্রায় দেশগুলোর শাসন ক্ষমতায়ই চেপে বসে পুঁজিবাদ ও কমিউনিজমের মানসপুত্র ধর্মনিরপেক্ষতাবাদিরা। যারা ইসলামী নেতৃবৃন্দের অসচেতনতা, অদূরদর্শিতা, অনৈক্য ও ইসলামের শত্রু-মিত্র নিরূপণে তাদের ব্যর্থতার কারণে ছিঁড়ে নিচ্ছিলো 'অন্যের হাতে' রোপন করা বৃক্ষের ফল-ফুল। ইতিহাস ক্লান্ত হয়ে পড়েছে— এ-সব ঘটনার পুনরাবৃত্তি দেখতে দেখতে। কী আশ্চর্য! ইসলামের ধারক-বাহকরা রোপন করেন আর ধর্মনিরপেক্ষতাবাদিরা এসে ফুল-ফসল লুটে নিয়ে যায়।

শায়খ নদভী কিশোর বয়স থেকেই দেখে এসেছেন যে, মুসলিম উম্মাহর দেহে কী বীভৎস আকৃতি ধরে জুড়ে বসেছে একটি বিষাক্ত 'দেহ'। এই দেহটা হলো ফিলিস্তিনের পবিত্র ভূ-খণ্ডে জায়নবাদী ইহুদী চক্রের অবস্থান। আর এর পেছনে প্রধানত কাজ করেছে ব্রিটেন। ব্রিটেনের প্রতিশ্রুতি ও প্রত্যক্ষ সহযোগিতা পেয়েই ইহুদীরা তাদের 'গোপন' উদ্দেশ্য নিয়ে ফিলিস্তিনের বুকে জড়ো হতে থাকে। সে গোপন উদ্দেশ্য আর কিছু নয়— ফিলিস্তিনের বুকে জায়নবাদী সন্ত্রাসী নেটওয়ার্কের একটি কেন্দ্র স্থাপন করা। যে কেন্দ্রের প্রধান কাজ হবে—

ফিলিস্তিনের 'সন্তানদের' ধরে-ধরে কখনো গোপনে হত্যা করা ..

কখনো প্রকাশ্যে হত্যা করা ..

কখনো ওদেরকে বাস্তুভিটা থেকে ঘাড় ধরে বের করে দেয়া।

আর ওরা যদি বেশি উচ্যবাচ্য করে,

তাহলে বিশ্ব-বিবেক ও বিশ্ব-রাজনীতি-কূটনীতির মুখোশ-পরা,

বিশ্ব প্রতারকদের প্রতারণা ও শঠতাপূর্ণ রাজনীতি-কূটনীতির

করুণ শিকার বানিয়ে যে কোনো মুহূর্তে ওদের উপর ব্যাপক বিধ্বংসী মারণাস্ত্র নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়া।

হায়! কী অদ্ভুত বিশ্ব মোড়লদের রাজনীতি ও কূটনীতি!

একদিকে ইহুদীদের হাতে আত্মরক্ষা ও জান বাঁচানোর খোঁড়া অজুহাতে..

তুলে দেয়া হচ্ছে অত্যাধুনিক মারণাস্ত্র।

অপরদিকে বেচারা ফিলিস্তিনীদের জান থাকলেও..

জান বাঁচনোর জন্যে যে কোনো ধরনের আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহার ও বহন নিষিদ্ধ করে দেয়া হচ্ছে!

জানে-জানে কেনো এতো ব্যবধান?

রক্তে-রক্তে কেনো এতো তফাত?

মানুষে-মানুষে কেনো এতো বিভেদ-বিদ্বেষ-ঘৃণা?!

এ এক জঘন্যতম অপরাধ! মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ!!

এ-অপরাধীদের কোনো ক্ষমা নেই, ক্ষমা নেই, অবশ্যই ক্ষমা নেই!

এদেরকে কঠিন শাস্তির মুখোমুখি হতে হবে, হতেই হবে।

আজ না হোক কাল! কাল না হোক পরশু।

নইলে অবশ্যই আহকামুল হাকিমীনের মহা বিচারালয়ে!!

সুদীর্ঘ ত্রিশ বছর ধরেই প্রত্যক্ষভাবে ব্রিটেন-আমেরিকা এই বজ্জাত ইহুদীদেরকে পোষে চলেছে। যখন যা প্রয়োজন হয়েছে তা-ই দিয়ে সহযোগিতা করেছে। এদের প্রত্যক্ষ মদদে-সহযোগিতায় যখন ফিলিস্তিনের মাটিতে ইহুদীরা শিকড় বিছিয়ে ফেললো, দৃঢ় থেকে দৃঢ়তর করে ফেললো নিজেদের অবস্থান, চারপাশে ডালপালা ছড়িয়ে লকলকিয়ে উঠলো ওদের শক্তি-সামর্থের বিষবৃক্ষটি, এবং অবশেষে যখন কোটি কোটি আরবদের বিরুদ্ধে লড়াই করে বিজয় লাভের সোনালী সম্ভাবনার বন্দরে পৌঁছে গেলো; তখনই এলো 'ইসরাঈল রাষ্ট্র' প্রতিষ্ঠার মহা ঘোষণা।

হ্যাঁ .. অবশ্যই আরব ও মুসলিম বিশ্বের জন্যে এটি একটি কালো দিন।

রক্ত কান্নায় বুক ভাসিয়ে জিহাদি শপথে আকাশ বাতাস মুখরিত করার দিন।

শোকের দিন বটে, কিন্তু শোকে-শোকে পাথর নয়—

আগুন হয়ে দাউ দাউ জ্বলে ওঠার দিন।

মাতম করার দিনও বটে,

কিন্তু মাতম করতে করতে জমিনে লুটিয়ে পড়া নয়—

নবচেতনায় শাণিত হওয়ার দিন।

ইহুদী বিতাড়নের দিন।

ফিলিস্তিন পুনরুদ্ধারে জিহাদে ঝাঁপিয়ে পড়ার দিন।

শায়খ নদভী'র বয়স যখন বারো কি তেরো, তখন ঘটলো আরেকটি বিয়োগান্তক ঘটনা। শত ষড়যন্ত্র ও চক্রান্তের করুণ শিকার হয়ে পতন

ঘটলো উসমানিয়া খেলাফতের। আমি স্বীকার করি; এ-খেলাফত ছিলো নড়বড়ে, তবুও তা-ই ছিলো মুসলমানদের সর্বশেষ দূর্গ, ঘাটি। হ্যাঁ.. ইতিহাস আমাদেরকে খুব স্পষ্ট ভাষায় জানিয়েছে যে, এই পতনের পেছনে মূল হোতা ছিলো— ইহুদী-খৃষ্টান-পৌত্তলিক সংঘ। যারা সব সময় ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিলো, আছে এবং থাকবে। উসমানিয়া খেলাফতের পতনে ইসলামী দেশগুলোর ভাগ্যে কী পরিণতি নেমে এসেছিলো? হ্যাঁ .. ইসলামী বিশ্ব বিশেষ করে আরব বিশ্ব সেই পশ্চিমা উপনিবেশের হাতে শেকল-পরা বন্দির ন্যায় নিক্ষিপ্ত হলো। এই পশ্চিমা উপনিবেশের চরিত্রটা হলো— এরা মুসলিম বিশ্বকে একটি দুগ্ধবতী গাভী ও তরতাজা উষ্ট্রী বানিয়ে শুধু দুধটুকুই দোহন করে নিয়ে যায়। আর খাদ্য দেয়ার সময় যাচ্ছে তাই আচরণ করে।

পশ্চিমা উপনিবেশ আরব জাহানের বিভিন্ন অঞ্চলে তার নখাল থাবা বিস্তার করেছিলো একটি পরিকল্পিত নীল নক্সা অনুযায়ী। লক্ষ্য ছিলো একটাই—

আরব বিশ্বের সম্পদ যতো পারো, যেভাবে পারো— চুষে নাও।
এলাকার পর এলাকা ধ্বংস করে দাও।
আরবদের ভিতরে 'গৃহদাহ' লাগিয়ে দাও।
সভ্যতা-সংস্কৃতিকে নষ্ট করে দাও।
পারস্পরিক সহযোগিতা ও সহমর্মিতাবোধের গলা টিপে ধরো।
রাজ্যের অনারব শব্দের অনুপ্রবেশ ঘটাও,
নষ্ট করে দাও ওদের ভাষার স্বাভাবিক গতি-ছন্দ-চারুতা।
এ ভাষার প্রতি এদের ভক্তি-ভালোবাসাকে বদলে দাও—
অভক্তি ও ঘৃণায়।
আধুনিক জীবনধারার সাথে সামঞ্জস্যহীন
এবং প্রগতি ও অগ্রগতির অন্তরায় আখ্যা দিয়ে থামিয়ে দাও—
এই ভাষার ক্রমবিকাশকে।

হ্যাঁ পাঠক! এ সব ভাবনা শায়খ নদভী'র কিশোর মনে তোলপাড় সৃষ্টি করলো। বেদনা ছড়াতে লাগলো। পাশাপাশি চলতে লাগলো তাঁর ছাত্র জীবনের পাঠ, গভীর অনুরাগে। একনিষ্ঠ অনুসন্ধিৎসায়।

অনুভব তাঁর শাণিত ও ধারালো।
চেতনা তাঁর সজাগ ও জাগ্রত।

হৃদয় তাঁর আল্লাহ্‌র উপর অবিচল আস্থা ও বিশ্বাসে বলীয়ান।
অস্বচ্ছ প্রবৃত্তির ঝড়-উৎক্ষিপ্ত আবিলতা থেকে মুক্ত তাঁর চিন্তা-মানস।
তিনি বেড়ে উঠেছেন এমন এক পরিবেশ-প্রতিবেশে,
যেখানে সদা বহমান দীনি জযবা,
জিহাদী চেতনা ও দাওয়াতি মেযাজের হিমেল হাওয়া।
এমন এক খান্দানে তাঁর জন্ম,
যার পুণ্যধারা গিয়ে মিশে গেছে হাসানী খান্দানের পবিত্র ও স্বচ্ছ মোহনায়—
ঈমানী নে'আমতের পরই যে নে'আমত নিয়ে সবচে' বেশি,
গর্ব করা যায়, আনন্দ করা যায়।
সুতরাং এমন খান্দানে জন্ম-নেয়া,
এমন পরিবেশ-প্রতিবেশে বেড়ে-ওঠা-আবুল হাসান আলী নদভী'র কিশোর মনে যদি জন্ম নেয় এই দৃঢ় সংকল্প ও অবিনাশী চেতনা—
যে কোনো মূল্যে মুসলিম উম্মাহকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে হবে—
হারানো ঐতিহ্যের দেশে।
যেখানে তাদের জন্যে অপেক্ষা করছে সম্মান ও মর্যাদা
এবং আযাদী ও স্বাধীনতা।
অবশ্যই মুসলিম উম্মাহকে আহ্বান জানাতে হবে সে পথ অবলম্বনের,
যে পথে চললে নিশ্চিত হয় স্বাধীকার ও স্বাধীনতা
এবং দৃঢ় হয় আল্লাহ্‌র জমিনে সুপ্রতিষ্ঠা,
যা বদলে দেবে অধঃপতনকে উৎকর্ষতায়,
পশ্চাদপদতাকে অগ্রসরমানতায়—
তাহলে অবাক হওয়ার কী আছে?!

অপরদিকে হিন্দুস্তানের বুকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী শাসনামলের শেষ সময়টাও তিনি দেখেছেন। দেখেছেন তিনি অশ্রুভরা চোখে ওদের জুলুম-নিপীড়নের শেষ ও বীভৎস মহড়াটা। নিষ্ঠুর অমানবিকতায় কেঁপে কেঁপে উঠছিলো হিন্দুস্তানের সারজমিন। অন্যায় রক্তপাতে লালে-লালে ভেসে গেলো হিন্দুস্তানের সাদা মাটি। স্বাধীনতার পতপত পতাকা হাতে লুটিয়ে পড়তে লাগলো আযাদির মহান সৈনিকেরা— রক্তরাঙা ভূ-পৃষ্ঠে। শুধু তাই নয়, আযাদির এই মহান সৈনিকদের লাশ মাড়িয়ে-মাড়িয়ে 'মানুষখেকো' ব্রিটিশরা এবার গুড়িয়ে দিতে লাগলো শত-শত বছরের

গড়ে-ওঠা মুসলিম শাসনের স্মৃতিচিহ্ন ও স্মারকচিহ্নসমূহ। জীবাণু ঢুকিয়ে দিতে লাগলো শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে গড়ে-ওঠা তাদের সভ্যতা-সংস্কৃতি ও নীতি-নৈতিকতায়। কিশোর আবুল হাসান আলী নদভী আরো দেখেছেন ব্রিটিশ খেদাও আন্দোলনের বীর সৈনিক উলামায়ে কেরামের সাহসী ভূমিকা। তাঁদের ত্যাগ-তিতিক্ষা ও কুরবানী।

কিছুদিন পর যখন স্বাধীন হলো হিন্দুস্তান তখন দৃশ্যপটে এলো আরো কতো ঘটনা। অভিপ্রেত-অনভিপ্রেত। সবই তিনি সচেতনভাবে দেখলেন, হৃদয়ঙ্গম করলেন। সবচে' বড় ঘটনাটা হলো— 'দেশ বিভাজন'। যে ব্যাপারে আগেই আমরা ইঙ্গিত করে এসেছি। দেশ ভাগ হয়ে গেলো দু'ভাগে। হিন্দুস্তান এবং পাকিস্তান। তিনি দেখলেন যে, উলামায়ে কেরামের সুদীর্ঘ সংগ্রামের ইতিহাস এখানে এসে কেমন যেনো ম্লান ও নিস্প্রভ হয়ে যাচ্ছে। ধূলিমলিন হয়ে যাচ্ছে। ছিন্নভিন্ন হয়ে যাচ্ছে। আযাদির লড়াইয়ে ক্লান্ত-শ্রান্ত-ঘর্মাক্ত মুসলমানেরা এই বিভাজনে কোনো সার্থকতাই খুঁজে পেলো না— কিছু তিক্ত অভিজ্ঞতা ছাড়া। বরং নতুন করে আবার তারা সঙ্কটে পড়লো। আকিদা-বিশ্বাস ও ইজ্জত-আব্রু এবং ধর্মীয় মূল্যবোধ ও আবেগ-অনুভূতি নিয়ে বিভাজিত হিন্দুস্তানে টিকে থাকাটাই তাদের সামনে এক চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়ালো। তাদের সামনে প্রকাশ্যভাবে হুমকি ছড়াতে লাগলো কট্টরপন্থী হিন্দুত্ববাদ-প্রভাবিত ধর্মনিরপেক্ষতাবাদিরা। সীমাহীন মুসলিম বিদ্বেষী এ-কট্টরপন্থী হিন্দুরা মুহূর্তের জন্যেও হিন্দুস্তানে মুসলমানদের সরব অস্তিত্বকে মেনে নিতে পারে নি। স্বাধীনতা যুদ্ধে মুসলমানদের হাজারো ত্যাগ-তিতিক্ষা, জান-মালের কুরবানী এবং দেশপ্রেমের বীরোচিত ভূমিকা— কোনোকিছুই এই হিন্দুদের 'মুসলিম বিদ্বেষবাদ'-এর দাউ-দাউ আগুনে পানি ছিটাতে পারে নি। সুতরাং আরব ও মুসলিম বিশ্বের হৃত–গৌরব কী করে ফিরিয়ে আনা যায় এবং ঈমান-আকিদা ও ধর্মীয় মূল্যবোধ সংরক্ষণের পাশাপাশি কী করে সর্বভারতবর্ষের মুসলমানদের জান-মালের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা যায়— এ লক্ষ্য ও মিশন নিয়েই ভাবতে বসলেন শায়খ নদভী এবং তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধু ও সহকর্মী মাওলানা মনযূর নু'মানী (ওফাত: ১৯৯৭)। এবং এ লক্ষ্য বাস্তবায়নের জন্যে তাঁরা মনে-প্রাণে কর্মের ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। এ লক্ষ্যকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত হতে লাগলো তাঁদের লেখালেখি ও বক্তৃতা।

জীবনের ধাপে ধাপে শায়খ নদভীকে অতিক্রম করতে হয়েছে কঠিন কঠিন মঞ্জিল। আস্বাদন করতে হয়েছে নানা তিক্ততা। একেবারে শৈশব থেকে আরম্ভ করে কর্মক্ষেত্রে প্রবেশের পূর্ব পর্যন্ত প্রায়ই তাঁকে মুখোমুখি হতে হয়েছে বাহ্যিক জীবনোপকরণের প্রকট অপ্রতুলতারও। অন্যদিকে তাঁর শারীরিক গড়নও ছিলো হ্যাংলা-পাতলা-দুর্বল। অল্প গরমেই দরদর করে ঘাম ঝরতো তাঁর। প্রায় সময়ই থাকতেন অসুস্থ্। কিন্তু বাহ্যিক জীবনোপকরণের ঘাটতি বলুন আর শারীরিক দুর্বলতা বলুন, কিছুই তাঁর লক্ষ্য-উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের পথে বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারে নি। স্থির করা-লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিলেন তিনি আপন গতিতে— পারিবারিক ইতিহাস-ঐতিহ্যের আলো থেকে আলো গ্রহণ করে। কোনো রকম ছাড় না দিয়ে। দ্বিধা-সংশয়ের অনেক উপরে অবস্থান করে। তাই কোনো আশঙ্কাই ছিলো না তাঁর জীবনে— 'যাত্রাপথে যাত্রা ভঙের' কিংবা 'তীরে এসে তরী ডোবার'। অথচ লেখক, দাঈ ও ইসলামী চিন্তাবিদদের ভিতরে অনেকেই শাণিত চেতনার দৃঢ় সংকল্পের পথে শেষ পর্যন্ত যেতে পারেন না, পার্থিব ইন্দ্রজালের মোহনীয় পরশে ভোতা হয়ে যায় তাদের চেতনা। দিক হারিয়ে ফেলে তাদের সংকল্প।

সংস্কার এবং শায়খ নদভী'র দৃষ্টিভঙ্গি

উম্মত-যে বিভিন্ন সঙ্কট ও সমস্যার আবর্তে ঘুরপাক খাচ্ছে, শায়খ নদভী তা ভালো করেই জানতেন। কেননা, তিনি উম্মতের প্রতি দরদ ও ব্যথা নিয়ে ছুটে গেছেন সারা দুনিয়ায়। যেখানেই তিনি গিয়েছেন গভীরভাবে মিশেছেন সেখানকার উলামায়ে কেরাম ও লেখক সাহিত্যিক এবং রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ ও উর্ধতন প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের সাথে। সব দেশের মসজিদ-মাদরাসা ও কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি অসংখ্য বক্তৃতা দিয়েছেন। সম্বোধন করেছেন কখনো সমাজের বিশেষ শ্রেণীকে কখনো আবার সাধারণ শ্রেণীকে। এভাবেই তিনি উম্মাহর সাথে মিশে গিয়ে জানতে পেরেছেন তাদের সঙ্কট ও সমস্যার কথা। তাদের দুর্যোগ ও ব্যাধির কথা। তাদের অধঃগতি ও অনৈতিকতার কথা। তাদের শূন্যতা ও দৈন্যতার কথা। আরো অনেক কিছুই তিনি জানতে পেরেছেন। উপলব্ধি করতে পেরেছেন। তাঁকে সবচে' বেশি উদ্বিগ্ন করে তুলেছিলো পাশ্চাত্যের কাছে মুসলিম উম্মাহর অসহায় আত্মসমর্পণ। পাশ্চাত্য সভ্যতা-সংস্কৃতির করুণ শিকারে

পরিণত হয়ে নিজেদের স্বপ্নসাধ, ইতিহাস-ঐতিহ্য, গর্বিত সভ্যতা, সমৃদ্ধ সংস্কৃতি ও গৌরবদীপ্ত অতীতকে পিষে পিষে চকচকে মরীচিকাময় পাশ্চাত্য জীবনধারার দিকে এই যে ছুটে-চলা, তা বড়ো পীড়িত করতো শায়খ নদভীর মন-মানসকে। হায়! ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব ও তার চিরন্তন বাণী'র প্রতি কেমন করে তারা হারিয়ে ফেলতে পারলো আস্থা ও বিশ্বাস? অবজ্ঞা আর অবহেলায় কেমন করে তারা ছুঁড়ে দিতে পারলো ইসলামের কালজয়ী নীতি-আদর্শ ও আইন-কানুন? এ-অবস্থাকে 'ফিকরী ইরতিদাদ' বা আদর্শিক স্খলন ছাড়া আর কী বলা যায়? .... হ্যাঁ, এই কঠিন বাস্তবতার মুখে দাঁড়িয়েই তিনি লিখতে বাধ্য হলেন তাঁর ঐতিহাসিক ও কালোত্তীর্ণ এই লেখাটি—

ردة ولا أبا بكرٍ لها!!

'বুদ্ধিবৃত্তিক ধস নেমেছে ঐ
কে ঠেকাবে .. আবু বকর কই!'

নৈতিকতা ও সুকুমারবৃত্তির এই ধস শায়খ নদভীকে ভীষণ উদ্বেগাকুল করে তুলেছিলো।

কোথায় হারিয়ে গেলো মুসলমানদের চরিত্র-সুষমা?

কোথায় ভেসে গেলো সুকুমারবৃত্তির মন-মাতানো সৌরভ?

কী পার্থক্য তাদের এই চরিত্রে আর মুনাফিকদের ঐ চরিত্রে?

আলোর পথ ছেড়ে কোন্ অন্ধকারে সাফল্য খোঁজে বেড়ায় তারা?

মুক্তির পুষ্পিত-উদ্যানে কাঁটা ছড়িয়ে কোন্ কাঁটাবনে ছুটে যাচ্ছে তারা?

ও পথ তো অভিশপ্তদের পথ! বিভ্রান্তদের পথ!

শায়খ নদভী'র লেখায়-বক্তৃতায়-আলোচনায় ফুটে উঠতে লাগলো এমন উদ্বেগমাখা অসংখ্য প্রশ্নচিহ্ন। আজ মুসলিম উম্মাহ লুটিয়ে পড়ছে দুনিয়ার পায়ে। দুনিয়ার বিত্ত-বৈভব ও যশ-খ্যাতির মোহে পড়ে বিস্মৃত হতে চলেছে আখেরাতকে। যে মৃত্যুর চোখে চোখ-রেখে একদিন মুসলমানরা ইসলামী দুনিয়ার সবুজ মানচিত্রে যোগ করেছিলো লক্ষ-লক্ষ বর্গ মাইল, আজ সে মৃত্যুভয়েই তারা পালিয়ে বেড়াচ্ছে। পরিণতিতে চারদিক থেকে ঝড়ের তাণ্ডবে নেমে আসছে লাঞ্ছনা, গঞ্জনা আরো কতো কি! পার্থিব ইন্দ্রজালে এভাবে জড়িয়ে পড়লে এবং শহীদী মৃত্যুকে এতো ভয় পেলে দুশমন যে আমাদের উপর সর্বগ্রাসী তাণ্ডবে ঝাঁপিয়ে পড়বে, তাতে বিস্মিত

হওয়ার কিছুই নেই। আশপাশে তাকালে কী চোখে পড়ে? মুআজ্জিনের কণ্ঠে আজান ধ্বনিত হচ্ছে কিন্তু অদূরে দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে কিংবা দুনিয়াবী ব্যস্ততায় মেতে উঠে নামায কাযা করছে মুসলমান। দিনের পর দিন চলে যাচ্ছে অথচ একটু মসজিদমুখী হওয়ার সুযোগ হচ্ছে না। শুধু দুনিয়া কুড়ানোর মহা প্রতিযোগিতা। প্রবৃত্তি পূজার মহা আয়োজন। ফরয লংঘিত হচ্ছে, তবু পরোয়া নেই। নারীর ইজ্জত-আব্রু লুণ্ঠিত হচ্ছে, তবু জ্বলন নেই। সৎ কাজের জন্যে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না কোনো নির্দেশদাতা। অন্যায় কাজের সামনে দাঁড়ানো একটি মানুষের চেহারায়ও নেই— ঘৃণা বা প্রতিরোধের ভ্রু-কুঞ্চন। আমানতের মাল হারিয়ে যাচ্ছে খেয়ানতের গভীর খাদে। কেউ এগিয়ে আসছে না তা উদ্ধার করতে। সুকুমারবৃত্তির হাহাকারে.. কূ-প্রবৃত্তির জয়জয়কারে সবাই উল্লাস করছে। নেই কোনো অশ্রুময় চোখের বেদনাময় চাহনি। কথা ছিলো যাদের শাসক ও নেতা হওয়ার তারা নেই ক্ষমতার আসনে। যারা অযোগ্য অথর্ব ও অসৎ তারা উম্মাহর ভাগ্য নিয়ে.. ইসলামের বিধান নিয়ে উপহাস করছে— ক্ষমতার দম্ভে। কেনো এমন হচ্ছে? .. এমন হওয়ার তো কথা ছিলো না! ...

শায়খ নদভী রহ. এর মতে এমন হওয়ার মূল কারণ হলো— মু'মিনের হৃদয়ে ঈমানের যে শিখা জ্বলছিলো তা নিভে গেছে। যে শিখা তাকে পথ দেখায় মঙ্গলের—কল্যাণের। হতোদ্যম হলে, উদ্যম যোগায়। হতাশ হলে, আশা যোগায়। এ-শিখা জ্বলতে থাকলে কোনো অশুভ ও অকল্যাণ কাছে ঘেঁষতে পারে না। ঘেঁষতে চাইলেও এ-শিখার উত্তাপ-দাহে ঝলসে যায়, দূরে ছিটকে পড়ে। কেনো এবং কখন নিভে যায়— ঈমানের এ-শিখা? .. এ-শিখা নিভে যায় মানুষ যখন আল্লাহওয়ালা বুযর্গদের শিক্ষা ও সংস্রব (সুহবত) থেকে এবং ছায়া ও মায়া থেকে বঞ্চিত হয়। কেননা, আল্লাহওয়ালা বুযুর্গরা পিপাসার্ত হৃদয়কে তৃপ্ত করে থাকেন— ঈমানের সুপেয় পানীয় দ্বারা। গাফলতের ঘুমে অচেতন হয়ে-থাকা মানুষকে তাঁরা জাগিয়ে তুলেন— কুরআনের স্পর্শ দ্বারা। অসুস্থ আত্মাকে তাঁরা চিকিৎসা দেন— ইলম, ইয়াকিন, তাযকিয়া (আত্মশুদ্ধি) ও ইহসান (আল্লাহ-প্রাপ্তির নিবিড় সাধনা)-এর প্রতিষেধক দ্বারা। সুতরাং এমন আল্লাহওয়ালা বুযুর্গানে দীনের সংস্রব থেকে উম্মত যখন বঞ্চিত হয়, তখন তার শূন্য হৃদয়ে হামলে পড়ে একটি অশুভ চক্র। গ্রাস করে নেয় তার সুকুমারবৃত্তি। আগুন জ্বালিয়ে দেয় কূ-প্রবৃত্তির নেভানো-সলিতায়। এই অশুভ চক্রটি দু' দলে বিভক্ত হয়ে

উম্মতের উপর আক্রমণ রচনা করে। একটি দল ঠিক জাহান্নামের কিনারায় দাঁড়িয়ে উম্মতকে ডাকে জাহান্নামের দিকে। এদের ডাকে সাড়া দেয়ার অর্থই হলো— জাহান্নামের দিকে ছুটে চলা। হযরত হোযায়ফা রা. বর্ণিত হাদীসে আল্লাহ্র নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এদের সম্পর্কে বলেছেন :

'هم من بني جلدتنا، ويتكلمون بألسنتنا'

'তারা আমাদেরই সম্প্রদায়ের (ভিতরের) লোক। কথা বলে আমাদেরই ভাষায়।'[১]

হ্যাঁ .. এই এরাই উম্মতকে ক্রমাগত ডেকে চলেছে পাশ্চাত্যের দিকে। উম্মতের ভিতরে ছড়িয়ে দিচ্ছে পাশ্চাত্য মতবাদ ও চিন্তাধারা। তাদের বস্তুবাদী দর্শন, জাতীয়তাবাদী সাম্প্রদায়িক চেতনা ও স্বেচ্ছাচারী নীতি-আদর্শ। ইসলামী সভ্যতা ও পাশ্চাত্য সভ্যতার দ্বন্দ্বকে সামনে নিয়ে এসেছে। এরাই নিয়ন্ত্রণ করছে শিক্ষা ব্যবস্থা ও শিক্ষানীতি এবং সভ্যতা-সংস্কৃতি ও তথ্য-প্রযুক্তি। আর এ সবের সুবাদে তারা মুসলিম সমাজ-সভ্যতা ও জীবনাচারের রন্ধ্রে রন্ধ্রে পৌঁছে যাচ্ছে তাদের নিজস্ব মিশন বাস্তবায়নের লক্ষ্য নিয়ে। এ ভাবে তারা শুধু মুসলিম বিশ্বের রাষ্ট্রক্ষমতাই দখল করে নেয় নি, বরং নতুন প্রজন্মের মন-মানস ও আকল-বুদ্ধিকেও তারা সম্পূর্ণভাবে নিজেদের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে নিয়েছে। ফলে নতুন প্রজন্মের দৃষ্টিসীমা থেকে হারিয়ে যাচ্ছে ইসলামের সভ্যতা-সংস্কৃতি ও শিক্ষা-নৈতিকতার সোনালী দিগন্ত এবং তারা পরিণত হচ্ছে এদের খেলার পুতুলে— যেভাবে নাচায় সেভাবেই নাচে।

এই অশুভ চক্রের দ্বিতীয় দলটি হলো, ধর্মের বিকৃত ব্যাখ্যাদানকারীরা। যারা মুখে-মুখে ইসলামের কথা উচ্চারণ করে কিন্তু ইসলামের চিরন্তনতা ও সার্বজনীনতাকে তারা হৃদয় দিয়ে বিশ্বাস করে না এবং বাস্তব জীবনে তার প্রতিফলনও ঘটায় না। এদের কথা-কাজে বৈপরিত্যের সম্পর্ক। ভিতর-বাহিরেও কোনো মিল নেই।

يَا أَيُّهَا الَّذِين آمَنُوا لِمَ تَقُولُون مَا لا تَفْعَلُون. كَبُرَ مَقْتاً عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لا تَفْعَلُون.

---

[১] বুখারী-মুসলিম

'হে ঈমানদারগণ! যা করো না, কেনো তা বলে বেড়াও? যা করো না তা তোমাদের বলে বেড়ানোটা আল্লাহ্‌র কাছে বড়ো ঘৃণিত।' -সফ: ২-৩

এই মুখোশধারী ধর্মপন্থীরাই মূলত ধর্মের জন্যে .. ধর্মপ্রাণ মানুষের জন্যে সবচে' বড় ফেতনা এবং আল্লাহ্‌র কাছে পৌঁছার সবচে' বড় বাধা।

সংস্কার-সংশোধন ঃ সূচনা হবে কাকে দিয়ে

আল্লামা নদভী রহ.-এর মতে সমাজ-সংস্কারের জন্যে জরুরি হলো ব্যক্তির সংশোধন। ব্যক্তির সংশোধন ছাড়া সমাজের সংশোধন অকল্পনীয় এবং অসম্ভব। ব্যক্তি হলো 'সমাজ-অট্টালিকা'র একেকটি আলাদা-আলাদা ইট। এই ইট যদি ভালো ও মজবুত না হয়, তাহলে সমাজ-অট্টালিকা কী করে নির্মিত হবে? আর কোনো রকমে নির্মিত হয়ে গেলেও তা ক'দিন দাঁড়িয়ে থাকতে পারবে?

ব্যক্তির সংশোধন শুরু হবে মূল কেন্দ্র থেকে অর্থাৎ অভ্যন্তর থেকে— বাহির থেকে নয়, আত্মা থেকে— দেহ থেকে নয়। সর্বাগ্রে সংশোধন করতে হবে ব্যক্তির হৃদয়াত্মা বা অন্তর্জগত। এই ক্বলব বা হৃদয় নামের টুকরোটি যদি ঠিক হয়ে যায়, তাহলে সবই ঠিক হয়ে গেলো। আর তা যদি নষ্ট হয়ে যায় তাহলে সবই নষ্ট হয়ে গেলো।

এ জন্যে ইসলাম সবচে' বেশি জোর দিয়েছে 'ক্বলব' এর পরিচ্ছন্নতা বা আত্মশুদ্ধির ব্যাপারে। এই 'ক্বলব'কে পরিচ্ছন্ন ও পরিশুদ্ধ করতে হলে সর্বাগ্রে পরিহার করতে হবে— শিরক ও মুনাফেকি এবং প্রত্যাখ্যান করতে হবে সর্বোতভাবে কু-প্রবৃত্তির শাসন। হাদীসের ভাষায় :

'إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم،'

وأشار الرسول الكريم إلى صدره وقال: 'التقوى ههنا .... ثلاثا'

'আল্লাহ তোমাদের দেহ বা আকৃতির দিকে তাকান না। তিনি তাকান তোমাদের হৃদয়ের দিকে'।[১] আল্লাহ্‌র নবী এরপর নিজের বুকের দিকে ইশারা করে বলেন : 'তাকওয়া এখানে।' এ কথাটি তিনি তিনবার বলেন।[২]

---

[১] মুসলিম শরীফ

[২] মুসলিম শরীফ

কুরআনে ইরশাদ হচ্ছে:

وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوب.

'যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র নিদর্শনসমূহকে সম্মান করবে, নিশ্চয়ই তা হৃদয়ের তাকওয়া হিসাবে গণ্য হবে'। -হজ্ব: ৩২

আরো ইরশাদ হচ্ছে:

يَوْمَ لا يَنفَعُ مَالٌ وَلا بَنون. إِلاَّ مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْب سَلِيمٍ .

'সেদিন ধন-সম্পদ ও পুত্র সন্তান কোনো কাজে আসবে না। তবে (মুক্তি লাভ করবে) ঐ ব্যক্তি যে আসবে সুস্থ আত্মা নিয়ে'।

-শু'আরা: ৮৮-৮৯

مَنْ خَشِيَ الرَّحْمَنَ بِالْغَيْب وجَاء بِقَلْبٍ مُنِيب.

'যে ভয় করবে আল্লাহকে (দুনিয়াতে) না-দেখে এবং (কেয়ামতের দিন) আল্লাহ্‌র কাছে আসবে বিনীত (পাপমুক্ত) হৃদয় নিয়ে'। -কাফ: ৩৩

এ জন্যেই শায়খ নদভী আত্মশুদ্ধির উপর সবচে' বেশি জোর দিতেন। কেননা আত্মশুদ্ধি হলো মৌলিক পরিবর্তনের মূল কেন্দ্রবিন্দু। পরিপূর্ণ সংশোধনের ভিত্তি। নেতা ও নীতির পরিবর্তন কিংবা রাজনৈতিক পালাবদল বা সংবিধানের রদবদল— কোনো কিছুই কোনো কাজে আসবে না, যদি না সাথে-সাথে পরিবর্তন সাধিত হয় আত্মার জগতে— গভীরভাবে।

আত্মার জগতে পরিবর্তন ঘটলেই মানুষের ভাগ্যের (অবস্থার) পরিবর্তন ঘটে। এ বিষয়টিই পবিত্র কুরআনে এভাবে বিধৃত হয়েছে—

إِنَّ اللَّهَ لا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ.

'আল্লাহ কোনো জাতির ভাগ্য (সুঅবস্থা) পরিবর্তন করেন না, যতোক্ষণ না তারা (নাফরমানি করে) নিজেরা নিজেদের (আত্মা ও আমলের) পরিবর্তন ঘটায়।' -রা'দ:১১

আল্লাহর রাসূলের মক্কী জীবনের দিকে লক্ষ্য করুন।
'দারুল আরকাম'-এ কিসের সাধনা চলছে?
হৃদয় পরিবর্তনের সাধনা।
অন্তর্জগত আলোকিত করার সাধনা।
জাহিলিয়াতের অন্ধকার ও অপরিচ্ছন্ন বোধ-বিশ্বাস
এবং নিরর্থক ভাবনা-চিন্তা থেকে ..

হৃদয়াত্মাকে পরিশুদ্ধ করার সাধনা।
অনৈতিকতা ও বিচ্যুতি থেকে পরিত্রাণ লাভের সাধনা।
নববী তারবিয়াত ও প্রশিক্ষণের ছায়া ও পরশে ..
মৃত আত্মাকে জীবন্ত আত্মায়,
অপরিচ্ছন্ন আত্মাকে পরিচ্ছন্ন আত্মায়,
অপূর্ণ আত্মাকে পূর্ণতর আত্মায়— পরিণত করার সাধনা এবং
ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব ও সৌন্দর্যে এবং উন্নত চরিত্র ও সুকুমারবৃত্তিতে—
রূপান্তরিত করার সাধনা।

শায়খ নদভী দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করেন যে 'তাযকিয়াতুন নুফূস' (আত্মশুদ্ধি)-এর মহা দায়িত্ব আঞ্জাম দেয়ার জন্যে একমাত্র উপযোগী ও হকদার যে জামাতটি, তা হলো উলামায়ে কেরামের জামাত। যাঁরা প্রতিনিয়ত .. প্রতিক্ষণে .. প্রতিপলে নিবেদিত করেন আল্লাহ্‌র নামে নিজেদের সালাত ও কুরবানী। জীবন ও মৃত্যু। উম্মদের হিদায়াত-চিন্তায় ও কল্যাণ-কামনায় উৎসর্গীত যাঁদের সকাল-সন্ধ্যা ও দিবস-রজনী। এই উলামায়ে কেরামের ইখলাসপূর্ণ দাওয়াতের বদৌলতেই তো পথহারা মানব কাফেলা ফিরে পায়— পথের সন্ধান! পাপাচারে হারিয়ে যাওয়া মানুষ খুঁজে পায়— তাওবার মহা দৌলত! বিপথগামী মানুষের বিবেকে ঝড় উঠে— ন্যায় ও সত্যের পথে ফিরে আসার!

হ্যাঁ .. তাঁদের দাওয়াত এতো কার্যকর হওয়ার কারণ হলো তাঁদের ইখলাস (নিষ্ঠা)। ইখলাসের কারণেই তাঁদের কথা উৎসারিত হয় হৃদয় থেকে এবং সে কারণে তা প্রভাবও ফেলে ঐ হৃদয়ে গিয়েই। তাঁদের কথা যেনো বৈদ্যুতিক বাতির সুইচ, যা টিপলেই বাতি জ্বলে উঠে— পথহারা, দিশাহারা মানুষের আঁধার-আচ্ছন্ন হৃদয়ে। আর যাদের ওয়াজ-নসীহত ইখলাসশূন্য ও হৃদয়োৎসারিত নয়, তাদের কথায় মানুষ প্রভাবিত হয় না। সু-পথে ফিরে আসে না। মুখের কথা অন্তরে যাবেই বা কী করে? মুখের কথা কখনো হৃদয়ের গভীরে পৌঁছে না, শুধু কান পর্যন্তই সীমিত থাকে।

এ জন্যেই শায়খ নদভী তাবলিগ জামাতকে ভালোবাসতেন। এর কার্যক্রমকে হৃদয় থেকে স্বাগত জানিয়ে নিজেও তার সাথে সম্পৃক্ত হয়েছেন এবং দীর্ঘ সময় এ-পথে ব্যয় করেছেন। শায়খ নদভী'র মতে তাবলিগ জামাতের দাঈরা মানুষের সামনে হিদায়াতের রাস্তা তুলে ধরেন বড়ো হৃদয়স্পর্শী করে। তারা মানুষকে বদলে দেন একেবারে মন-মানস থেকে।

তাদের বিনয়ঝরা ও হিকমতপূর্ণ ওয়াজ-নসীহত, তাদের পারস্পরিক মমতাভরা কষ্ট-সহিষ্ণু দাওয়াতী সফর, সফরের বাইরেও তাদের পারস্পরিক ঐক্য ও শ্রদ্ধাবোধ, মানুষকে স্নেহভরে .. মায়াভরে সুন্নতের আমলের দিকে আহ্বান— এ সব শায়খ নদভীকে ভীষণ আকৃষ্ট ও অভিভূত করতো।

শায়খ নদভী মনে করেন এমন একটি চাবি আছে, যা দিয়ে সব ধরনের তালাই খোলা যায়। এই চাবি হলো— ঈমানের চাবি। এই চাবি দিয়েই তিনি খুলেছিলেন আরবদের হৃদয়ের বন্ধ কপাটগুলো— একে একে।

কপাট খুলে গেলো যখন, তখন কী ঘটলো?
কীভাবে ঘটলো?
তখন যাযাবর আরবরা পরিণত হলেন এমন সোনার মানুষে,
পৃথিবীভরা সোনা দিয়েও যাঁদের একজনের মূল্যও ..
নির্ধারণ করা যাবে না।
এ-চাবির স্পর্শ লাগতেই ..
পালিয়ে গেলো জাহিলিয়াতের সকল কালো।
উদিত হলো ইসলামের শাশ্বত আলো।
পৃথিবীর একটি অজানা-অচেনা জাতি পরিণত হলো শ্রেষ্ঠ জাতিতে।
গোটা মানব জাতির জন্যে মঙ্গল ও কল্যাণের আধারে।

এই চাবি কী করে আরবদের যাযাবরি জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দিয়েছিলো, সে কথা লক্ষ্য করুন শায়খ নদভী'র নিজের ভাষায়—

'জীবন ছিলো তালাবদ্ধ, কপাটবদ্ধ।
বুদ্ধিও ছিলো তালাবদ্ধ,
যা খুলতে গিয়ে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন বিজ্ঞজনেরা, দার্শনিকেরা।
বিবেকও ছিলো তালাবদ্ধ, যা খুলতে গিয়ে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন—
ধর্মীয় দিক দিশারীরা।
হৃদয়গুলোও ছিলো তালাবদ্ধ,
কুদরতি নিদর্শন ও ঘটনাবর্তও তা খুলতে পারছিলো না।
প্রতিভাগুলোও ছিলো বন্দি,
শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ এবং পরিবেশ ও প্রতিবেশ বারবার চেষ্টা করেও ..
তা মুক্ত করতে ব্যর্থ হয়েছে।

মাদরাসাগুলো পর্যন্ত তালাবদ্ধ ছিলো,
তা খুলতে ব্যর্থ হয়ে পড়েছিলেন উলামায়ে কেরাম ও শিক্ষকমণ্ডলী।
বিচার বিভাগেও প্রবেশ করা যাচ্ছিলো না,
চারদিক থেকে তা ছিলো আটকানো—
অসহায় বিচারপ্রার্থিরা বঞ্চিত হচ্ছিলো ন্যায় বিচার থেকে।
পরিবারও ছিলো তালাবদ্ধ,
তা খুলতে পারছিলেন না সমাজতত্ত্ববিদ ও সমাজ-সংস্কারকরা।
রাজপ্রাসাদের ফটকও ছিলো বন্ধ,
তা খোলে সেখানে প্রবেশ করতে পারছিলো না নিপীড়িত জনতা,
ঘামক্লান্ত শ্রমিক এবং কর্মক্লান্ত কৃষক।
আমির-উমারা ও বিত্তবানদের ধন-সম্পদও ছিলো তালাবদ্ধ,
তা খুলতে পারছিলো না দারিদ্র্যের কষাঘাতে জর্জরিত—
ক্ষুধাকাতর চাহনি,
নারীর বিবস্ত্রান,
দুগ্ধপোষ্য শিশুর ক্ষুধার্ত অবোধ কান্না।

বড় বড় সংস্কারকরা, বড় বড় দিকপালরা এ-বন্ধ তালা খোলার চেষ্টা করে বারবার ব্যর্থ হচ্ছিলেন। হতাশার তিমিরে হারিয়ে যাচ্ছিলেন। কেউ কোনোভাবেই এ-তালা খুলতে পারছিলেন না। আর খোলা সম্ভবও ছিলো না। কেননা যুগ-যুগ ধরে .. শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে এ-তালার আসল চাবিই খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিলো না। নতুন-নতুন চাবি বানিয়ে তালা খোলার অনেক চেষ্টাই করা হয়েছে, অনেক কসরতই চালানো হয়েছে, কিন্তু কোনো চাবিই লাগে নি, তালাও খুলে নি। কেউ কেউ তখন রাগে-ক্ষোভে ফুঁসতে ফুঁসতে তালাই ভেঙে ফেলতে চাইলেন, আঘাত করলেন স্বজোরে হাতুড়ি দিয়ে, এটা দিয়ে .. সেটা দিয়ে, কিন্তু তালা খুললো না, খুললোই না। হাত ফেটে রক্ত ঝরেছে, হাতুড়ি ভেঙে এদিক-সেদিক ছিটকে পড়েছে, কিন্তু তালা ভাঙলো না, কিচ্ছু হলো না। আসলে এভাবে এ-তালা ভাঙারও ছিলো না।

ঠিক এই নাজুকতম পরিস্থিতিতেই আল্লাহ পাঠালেন মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বিশ্ব জগতের জন্যে রহমত ও করুণার আধার বানিয়ে। বইতে লাগলো তখন রহমতের ফোয়ারা ..ছুটতে লাগল তখন করুণার ধারা। পেশ করলেন তিনি সবার সামনে নাজাত ও মুক্তির

পয়গাম। সন্ধান দিলেন তালা খোলার আসল চাবির। হারিয়ে-যাওয়া সেই চাবির। কী সেই চাবি? সেই চাবিটিই হলো— ঈমান! আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমান। নবী-রাসূলগণের প্রতি ঈমান।

পরকালের প্রতি ঈমান।

এই চাবি দিয়েই তিনি খুললেন একে একে— সব তালা। সব কপাট।

ঈমানের এই চাবি যখন লাগালেন তিনি ভোতা আকলের তালায়,

নিমেষেই তা খুলে গেলো।

ভোতা আকল-বুদ্ধিতে ফিরে এলো–ধার ও তেজ।

উদ্যম ও গতি।

নিমেষেই হয়ে উঠলো তা—

আল্লাহ্‌র কুদরত ও নিদর্শন থেকে উপদেশ ও শিক্ষা গ্রহণ করার—

চির উপযোগী।

হয়ে গেলো তাঁর নৈকট্য লাভের পথে এগিয়ে যাওয়ার—

দৃঢ় মনোবল ও ধারালো চেতনা সম্পন্ন।

শত প্রভুর বুকে 'পদচিহ্ন' এঁকে দিয়ে একমাত্র রব ও উপাস্য—

আল্লাহ্‌র কাছে ফিরে যাওয়ার শাণিত-দীপ্তিত-দ্যুতিত সংকল্প।

তখন তার সামনে পরিস্কার ফুটে উঠলো—

শিরক, পৌত্তলিকতা ও মূর্তিপূজার অসারতা ও অযৌক্তিকতা।

অথচ ইতিপূর্বে এই বুদ্ধিই কূ-প্রবৃত্তির মরীচিকাময় মোহময়তায় মোহাচ্ছন্ন হয়ে পাগলের মতো তার পেছনে পেছনে ছুটে বেড়িয়েছে। ভালো ও মন্দের ভিতরে এবং হক ও বাতিলের ভিতরে পার্থক্য নির্ণয়ের কোনো যোগ্যতাই তার ছিলো না।

ঘুমন্ত মানবতার বিবেকের উপর রাখা হলো এই চাবি। সাথে সাথে তা জেগে উঠলো। এ-চাবির ছোঁয়া পেয়ে আরো জেগে উঠলো নিষ্প্রাণ অনুভব-অনুভূতি। নিমেষেই তা হয়ে উঠলো প্রাণময়, বাঙ্ময়। এ-চাবির ছোঁয়ায় 'দুষ্ট আত্মা' পরিণত হলো 'প্রশান্ত আত্মায়'— বাতিল ও পাপ যার কাছে অসহ্য। এ-চাবির পরশে মাটি হয়ে গেলো সোনা! অন্ধকারাচ্ছন্ন পৃথিবীর মানুষের হৃদয়াকাশে উদিত হলো আলো ছড়ানো .. জ্যোৎস্না ঝরানো চাঁদ-সিতারা। ফলে এইসব সোনার মানুষেরা মানুষ হিসাবে কোনো অপরাধ করে ফেললেও তার অকপট ও অনুশোচনাদগ্ধ স্বীকারোক্তি নিয়ে রাসূলের সামনে এসে দাঁড়াতেন এবং শাস্তি গ্রহণের জন্যে সর্বান্তকরণে

নিজেদের পেশ করতেন। প্রয়োজনে তার জন্যে পীড়াপীড়িই শুরু করতেন। অপরদিকে এ-চাবির পরশে নৈতিকতা, আমানতদারী ও সুকুমারবৃত্তি এমনভাবে প্রোথিত হয়েছিলো যে এক মামুলী সৈনিক কিসরার মহামূল্যবান রাজমুকুট সিপাহসালারের কাছে জমা দিতে এসেছেন পরিধেয় বস্ত্রের আড়ালে লুকিয়ে। যাতে কেউ তার আমানতদারী ও সততার খবর জেনে না- ফেলে, তার ইখলাস ও নিষ্ঠায় বিঘ্ন না-ঘটায়। অথচ ইচ্ছে করলে তিনি তা অনায়াসে লুকিয়ে ফেলতে পারতেন নিজের জন্যে। কেউ একটু আঁচও পেতো না। কিন্তু তারপরও শত দারিদ্র ও দৈন্যকে এবং তীব্র সঙ্কট ও অর্থাভাবকে চোখ রাঙিয়ে তিনি এসে হাজির হলেন সরাসরি সেনাপতির কাছে! কারণ এ যে আল্লাহ্‌র সম্পদ! আল্লাহ্‌র সম্পদে খেয়ানত করবে বান্দা— এ কেমন করে সম্ভব?!

মানুষের হৃদয় ছিলো তালাবদ্ধ। শিক্ষনীয় ঘটনা থেকেও শিক্ষা গ্রহণ করতে পারতো না। যেনো পাষাণে-গড়া। নিষ্ঠুরতায় ঘেরা। ছিলো না নম্রতা ও মায়াময়তা। কিন্তু তার 'গায়ে' যখনই লাগলো এ-চাবির ছোঁয়া ও পরশ, সাথে সাথে ছুটে এলো কোমলতা। বান ডেকে গেলো দয়া-মায়া ও করুণার। শিক্ষনীয় ঘটনা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতে লাগলো। মজলুমের আর্তচীৎকারে মোমের মতো গলে গেলো। দুর্বল-অসহায়ের বেদনা কাতর চাহনি'র সামনে অশ্রু ঝরালো।

এই চাবি যখন রাখা হলো নিঃশেষ হয়ে-যাওয়া শক্তির উপরে এবং নষ্ট হয়ে-যাওয়া প্রতিভার উপরে, মুহূর্তেই তা জ্বলে উঠলো আগুনের মতো, বয়ে গেলো স্রোতের মতো। বিভ্রান্ত জাতি খুঁজে পেলো গন্তব্যের দিশা। উটের রাখালই তখন হয়ে গেলো উম্মতের 'রাখাল'। বিশ্ব শাসনকারী খলিফা। ছোট্ট ও অপরিচিত গোত্র বা গ্রামের অশ্বারোহিটিই পরিণত হলো বড়-বড় সাম্রাজ্যের বীর বিজেতায় এবং শক্তিধর জাতি-গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে বিজয়ের মহানায়কে।

এই চাবি যখন রাখা হলো তালাবদ্ধ মাদরাসায় .. যেখানে নেই তালিবে ইলমের মধুর গুঞ্জন, নেই শিক্ষকের দরদী অভিভাবকত্ব, সাথে সাথে সেখানে মুখর হয়ে উঠলো ইলম ও জ্ঞানের সজীব আলোচনায় ছাত্র-শিক্ষকরা। মহিমান্বিত হলো ইলমের চর্চা। বুলন্দ হলো মু'আল্লিম (শিক্ষক)-এর মর্যাদা। শুধু মসজিদই নয়, প্রতিটি গৃহকোণ পর্যন্ত পরিণত হলো একেকটি মাদরাসা ও পাঠশালায়। প্রতিটি মুসলমান পরিণত হলেন

একই সাথে নিজের জন্যে ছাত্রে আর অপরের জন্যে শিক্ষকে। সবার চোখে মুখে ঝলমল করছিলো দীন শেখার বাসনা। ইলম শেখার সাধনা। আল্লাহওয়ালা হওয়ার তামান্না!

যে বিচারালয় ছিলো তালাবদ্ধ ও বিরান, এ-চাবির পরশে তা-ই হয়ে উঠলো ন্যায়-বিচারের প্রত্যাশায় ভিড়-জমানো মানুষের অবারিত মিলনমেলায়। বিচারকেরও নেই কোনো অভাব। প্রত্যেক শাসক ও আলেমই পরিণত হলেন ন্যায়বিচারের মূর্তপ্রতীকে। সবার হাতেই শোভা পাচ্ছে ন্যায়-বিচারের শোভিত পতাকা। সগর্জনে সবাই সাক্ষ্য দিলো সত্যের পক্ষে—মিথ্যার বিরুদ্ধে। মিথ্যা সাক্ষ্যদানের নেই কোনো লেশ। নেই অন্যায় ও অন্যায্য বিচারাদেশের আরশ-দোলানো কোনো কালো ঘটনা। নেই ফায়সালা-পূর্ববর্তী কিংবা ফয়সালা পরবর্তী কোনো অন্যায় বিবাদ-বিসম্বাদ। এভাবে হৃদয় যখন আবাদ হলো ঈমানে-ঈমানে, তখন আঁধার বসুন্ধরাও ভরে গেলো আদলে-ইনসাফে।

এ-চাবির ছোঁয়া লাগলো পরিবারে .. সমাজে.. রাষ্ট্রে। অথচ এর আগে পরিবার ছিলো নরকতুল্য। পিতা-পুত্রের মাঝে ছিলো না স্নেহ-ভালোবাসার বন্ধন। ছিলো শুধু অনাস্থা, অবিশ্বাস ও অবজ্ঞা। সমাজেও ছিলো না শান্তি, স্বস্তি ও স্থিতি। রাষ্ট্রেও ছিলো না শান্তি, স্বস্তি ও স্থিতি। ‘পরিবার-নরক’ বিষ ছড়ালো ‘সমাজ-নরকে’ আর ‘সমাজ-নরক’ বিষ ছড়ালো ‘রাষ্ট্র-নরকে’। নরকে-নরকে বিষাক্ত হয়ে উঠেছিলো পৃথিবী। মনিব-গোলামের সম্পর্ক ছিলো জুলুম-নিপীড়ন ও অনাস্থা-অবিশ্বাসের। শাসক-শাসিতের সম্পর্ক ছিলো শোষণ-ত্রাসন ও অনাস্থা-অবিশ্বাসের। ছোট-বড়তেও ছিলো না স্নেহ-মমতা ও ভালোবাসা-শ্রদ্ধার সম্পর্ক। সবাই দেখতো কেবল নিজের সার্থ। অপরকে ঠকিয়ে, অপরকে দমিয়ে। সবাই মাপে দিতে চায় কম কিন্তু নিতে চায় বেশি।.... হ্যাঁ, ঠিক এমন পরিবেশ-পরিস্থিতিতেই যখন ছোঁয়া লাগলো এ-চাবির, রাতারাতি স-ব বদলে গেলো।

অন্ধকারের সয়লাব বদলে গেলো— আলোর বন্যায়,
নিষ্ঠুরতা বদলে গেলো— ভালোবাসার উষ্ণতায়।
অসুন্দর বদলে গেলো— সুন্দরে সুন্দরে,
অন্যায়ের কালো পর্দা বদলে গেলো— ন্যায়ের শুভ্র চাদরে।
ক্ষোভ জমানো রক্তরাঙা চোখ বদলে গেলো—
হৃদয়কাড়া মায়াময় চাহনিতে,

গালাগালি বদলে গেলো— গলাগলিতে।
পরিবারে .. সমাজে .. রাষ্ট্রে—
এখন শুধু ছড়িয়ে আছে ভালোবাসার পান্না,
কোথাও শোনা যায় না এখন নিষ্ঠুরতাসঞ্জাত কোনো করুণ কান্না।
সবখানে ছায়া বিস্তার করলো ঈমানের সবুজ বনানী,
হে সুন্দর ধরনী! তোমার ভিতর লুকিয়ে ছিলো এতো যে সুন্দর—
আগে তো কখনো বলো নি!
কোন্ সে মোহন পরশে তুমি মাটি হয়েও— হয়ে গেলে সোনা!
সাবধান! এমন পরশ ছেড়ে কোথাও তোমার হারিয়ে যেতে—
একদম মানা!

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيراً ونِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَتَسَاءلُون بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً.

'হে মানব সম্প্রদায়! ভয় করো তোমরা তোমাদের প্রতিপালককে, যিনি তোমাদেরকে একই মানুষ থেকে সৃষ্টি করেছেন এবং সৃষ্টি করেছেন তার থেকে তার সঙ্গিনীকে। আর তাদের দু'জনের মাধ্যমে ছড়িয়ে দিয়েছেন অনেক নারী-পুরুষ। ভয় করো তোমরা আল্লাহকে যাঁর নামে তোমরা যাচঞ্চা করো এবং আত্মীয়তার বন্ধনকেও (ভয় করো), নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের উপর সতর্ক প্রহরায় রয়েছেন। -নিসা: ১

হ্যাঁ .. এখন কোনো বিশৃঙ্খলাও নেই। অরাজকতাও নেই। সবার মাঝে দায়িত্ব বন্টন করে দেয়া হয়েছে। পরিবার .. সমাজ .. রাষ্ট্র— সবারই এখন আলাদা আলাদা দায়িত্ব রয়েছে। আল্লাহ্র নবী বলেছেন

'كلكم راعٍ وكلكم مسئول عن رَعَيَّتِه'

'প্রত্যেকেই তোমরা দায়িত্বশীল। প্রত্যেককেই জিজ্ঞাসা করা হবে তার দায়িত্ব সম্পর্কে।'

এ-চাবির পরশে এভাবেই জন্ম নিলো এমন পরিবার,
যেখানে ন্যায় আছে, কিন্তু অন্যায় নেই।
ভালোবাসা আছে, কিন্তু ঘৃণা নেই।
সরলতা আছে, কিন্তু বক্রতা নেই।
হাসি আছে, কিন্তু কপটতা নেই।

সম্পদ আছে, কিন্তু লোভ নেই।
ক্ষমতা আছে, কিন্তু মোহ নেই।
পদবি আছে, কিন্তু প্রত্যাশি নেই।
জন্ম নিলো এমন সমাজ—
যেখানে ইনসাফ আছে, কিন্তু জুলুম নেই।
সাম্য আছে, কিন্তু বৈষম্য নেই।
এ সমাজের সকল সদস্যের হৃদয়-মনে সদা জাগরূক—
সততা ও আমানতদারীর মর্যাদা ও মাহাত্ম্য।
আল্লাহ ও পরকালের ভয়ে তারা সদা চিন্তিত, তটস্থ।

এ-অবস্থা শুধু সাধারণ জনতা ও প্রজাকুলের ভিতরেই নয়, বরং রাষ্ট্রের আমির-উমারা ও শাসক মহলেও তা সুবাস ছড়াতে লাগলো। এরাও সবাই সৎ, সবাই আল্লাহভীরু। দুনিয়ার প্রতি ভীষণ তাদের অনাসক্তি, আখেরাতের প্রতি গভীর তাদের অনুরক্তি। এখানে নেতাই বিনীত সেবক। শাসকরাই এখন পিতৃহারা এতিমের সবচে' আপনজন ও দায়িত্বশীল অভিভাবক। প্রাচুর্যের স্রোতে তারা ভেসে যেতেন না, থাকতেন পবিত্র ও স্বচ্ছ। অভাবের তাড়নায়ও তারা নষ্ট হয়ে যেতেন না, থাকতেন অল্পতে তুষ্ট ও সততায় বিশ্বস্ত। এ-চাবির পরশে ধনীরা হলো আখেরাতমুখী, ব্যবসায়ীরা হলো দুনিয়া-বিরাগ উদার দানশীল।

وَأَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ.

'এবং তিনি তোমাদেরকে যার উত্তরাধীকারী করেছেন, তা থেকে ব্যয় করো। -হাদিদ: ৭

وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ.

'এবং তাদেরকে দান করো আল্লাহ্‌র সেই সম্পদ থেকে, যা তিনি তোমাদেরকে দান করেছেন।' (নূর:৩৩)

আল্লাহ্‌র রাসূল তাঁর পয়গাম ও দাওয়াতের মাধ্যমে তৈরী করেছেন সাহাবায়ে কেরামের এমন এক মুবারক জামাত—
যাঁরা সৎ ও বিশ্বস্ত।
আল্লাহ্‌র প্রতি সুদৃঢ় ঈমান ও অবিচল আস্থায় উত্তীর্ণ।
আল্লাহ্‌র শাস্তিকে তাঁদের সবচে' বেশি ভয়।
তাঁরা আনুগত্য-কাতর, সততঃ বিশ্বস্ত।

তাঁরা বিনয়-কাতর— সবখানে।
তাঁরা কান্না-প্রবন— আল্লাহর সকাশে—ইবাদত-বন্দেগীতে,
নীরবে-নির্জনে। প্রকাশ্য প্রহরে, গোপন প্রহরে।
আখেরাতই তাঁদের সকল চাওয়া-পাওয়ার কেন্দ্রবিন্দু।
সে তুলনায় দুনিয়া তাদের কাছে তুচ্ছ, মূল্যহীন।
যে কোনো পার্থিব মায়াজাল ও জাগতিক অর্জনকে,
আখেরাতের সার্থে তাঁরা অবলীলায় ছিন্ন করে ফেলেন।
উপেক্ষা করে চলেন।
তাঁদের ঈমানী মজবুতি ও দৃঢ়তার সামনে ..
তাঁদের রূহানী জযবা ও আধ্যাত্মিক শক্তির কাছে ..
পার্থিব মায়াজাল ও জাগতিক অর্জনের কোনো মূল্য নেই।

তাঁরা সর্বান্তকরণে এই বিশ্বাস করেন যে, দুনিয়া তাদের জন্যে আর তারা আখেরাতের জন্যে।

এই মুবারক জামাতের মধ্যে যাঁরা ব্যবসায়ী, সততা-বিশ্বস্ততা ও আমানতদারীতে তাঁদের কোনো জুড়ি নেই। আর যাঁরা দরিদ্র ও অস্বচ্ছল, তাঁদের নেই কোনো আক্ষেপবোধ ও অপ্রাপ্তির বেদনা, 'আরো' অর্জনের ব্যতিব্যস্ততা ও হা-হুতাশ। জীবন ধারণের ন্যূনতম চাহিদা তাঁরা পূরণ করে নেন ঘামঝরানো শ্রম দিয়ে। শ্রমের ময়দানেও তাঁরা কর্মঠ, পরিশ্রমী ও কল্যাণকামী। যাঁরা সম্পদশালী, দানের হাত তাঁদের অবারিত, মুক্ত। খুঁজে ফিরে তাঁদের দৃষ্টি সদা অভাবীকে, মুখাপেক্ষীকে নীরবে.. নিভৃতে.. অন্য মানুষের দৃষ্টির অগোচরে। যাঁরা বসেছেন বিচারকের আসনে, ন্যায়বিচার তাঁদের প্রথম কথা .. ন্যায়বিচার তাঁদের শেষ কথা। আর যাঁরা শাসনকর্তা ও গভর্নর, সেবাই তাঁদের লক্ষ্য— সুহৃদ বন্ধুর মতো, সততা ও নিষ্ঠায়। আর যাঁরা নেতা ও সরদার, বিনয় ও দয়া এবং কল্যাণ-কামনা ও হিতাকাঙ্খা ঝরে-ঝরে পড়ে তাঁদের কথা ও কাজে। আর সেবক কিংবা শ্রমিক যাঁরা, কর্মে-উদ্যমে তাঁরা সতেজ, বলীয়ান ও বিশ্বস্ত। আর তাঁদের কারো কাছে যদি আমানতের মাল গচ্ছিত রাখা হয়, তাঁরা তখন বিশ্বস্ত প্রহরী .. সুসংরক্ষণকারী কোষাধ্যক্ষ।

হ্যাঁ.. এ সব সৎ গুণাবলী ও সুকুমারবৃত্তির ইটের উপর ভিত্তি করেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ইসলামী সমাজের অট্টালিকা। অস্তিত্ব লাভ করেছে ইসলামী হুকুমতের স্বর্ণ প্রাসাদ।

সত্যি কথা বলতে কি; সমাজ বলুন আর রাষ্ট্র বলুন তা তো সাধারণ জনগণের আচার-আচরণ ও স্বভাব-প্রকৃতিরই একটা ছবি ও দর্পণ! সুতরাং সাধারণ জনগণ যদি ভালো ও সৎ হয়, সমাজ-রাষ্ট্রও ভালো ও সৎ হবে। তৃণমূলে যদি থাকে সততা, বিশ্বস্ততা, পরকালমুখিতা ও দুনিয়া-বিরাগ এবং বস্তুবাদের দৈত্যের বিরুদ্ধে লড়াই করে বিজয় লাভের সংকল্প ও প্রতীজ্ঞা, তাহলে তাদের নিয়ে গঠিত সমাজ ও রাষ্ট্রও যে হবে জান্নাতেরই একটা ছোট্ট নমুনা— এতে কি সংশয়-সন্দেহ ও দ্বিধা-দ্বন্দ্বের কোনো অবকাশ আছে? .. ব্যক্তি ব্যবসায়ীর সততা ও বিশ্বস্ততা তখন সমাজে প্রতিফলিত হবে। অনুরূপ দারিদ্রপীড়িত মানুষের অল্পতুষ্টিবোধ ও শ্রম-মানস, শ্রমিকের শ্রম ও পরোপকারধর্মিতা, ধনী ও স্বচ্ছল মানুষের দান-দক্ষিণা ও সহমর্মিতাবোধ, কাজি'র ন্যায়বিচার ও সত্যানুসন্ধানের তাড়না, শাসকের সুশাসন ও একনিষ্ঠা, রাষ্ট্রপ্রধানের বিনয় ও দয়া, খাদেমের শক্তি, প্রহরীর বিশ্বস্ত প্রহরা— সবই প্রতিফলিত হবে সমাজ-জীবনের বাঁকে-বাঁকে। আর বলাই বাহুল্য; এমন আদর্শ-প্রেমিক সমাজ-সদস্যদেরকে নিয়ে গঠিত হবে যে রাষ্ট্র, তা হবে নিশ্চিত সুশাসনের সেরা আদর্শ। তা জাতিকে দেবে সঠিক পথের দিশা। ক্ষণস্থায়ী সার্থের উপর প্রাধান্য দেবে পরকালের চিরস্থায়ী সার্থকে। মোট কথা; এই কল্যাণ রাষ্ট্রের সুপরিচালনায় সামগ্রিকভাবেই মানব জীবনে নেমে আসবে সততা, বিশ্বস্ততা, শান্তি, স্বস্তি ও নিরাপত্তা। পারস্পরিক সহযোগিতা ও সহমর্মিতায় সবাই একে অপরের সাথে মিশে যাবে— একান্ত আপনজনের মতো। এর বাইরে নেতিবাচক কোনো কর্ম ও চিন্তা এ রাষ্ট্রের জান্নাতি আবহে বসে কল্পনা করাটাও কষ্টকর'।[১]

শায়খ নদভী এবং হাসানুল বান্না

আমার মনে হয়, সংশোধন ও সংস্কার ভাবনায় শায়খ নদভী এবং শায়খ হাসানুল বান্না'র দর্শন ও দৃষ্টিভঙ্গি অনেকটাই কাছাকাছি। যদিও এ ব্যাপারে অনেকেরই ভিন্নমত রয়েছে। কিন্তু যারা গভীরভাবে শায়খ হাসানুল বান্না'র রচনাবলী পড়েছেন, তারা ভালো করেই উপলব্ধি করতে পারবেন যে, শায়খ নদভী'র মতো শায়খ বান্নাও মনে করতেন যে, প্রথমেই প্রয়োজন

---

[১] শায়খ নদভীর এই কথাগুলো আমি এর আগে الإيمان والحياة (ঈমান ও জীবন) নামে আমার অন্য একটি গ্রন্থে বিবৃত করেছি।

ব্যক্তির সংশোধন। আর ব্যক্তির এ-সংশোধন প্রক্রিয়া শুরু হবে আত্মশুদ্ধির মধ্য দিয়ে। আত্মাকে যাবতীয় ছোট-বড় আবিলতা থেকে পবিত্র করার মধ্য দিয়ে। ইরশাদ হচ্ছে—

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا

'আত্মাকে যে পবিত্র করলো সেই সফলকাম হলো। আর যে কলুষিত করলো সে ব্যর্থ হলো।' -শামস: ৯-১০

দাওয়াত সফল হয় কখন?
পয়গাম বিজয় লাভ করে কোন্ সে কারণে?
তাঁদের হাত ধরেই দাওয়াত সফল হয়, পয়গাম বিজয়ী হয়,
যাঁরা আত্মাকে করেছেন পরিশুদ্ধ।
প্রবৃত্তিকে করেছেন পরাস্ত।
আখেরাত যাঁদের কাছে পণ্য আর দুনিয়া তার মূল্য।
যাঁরা নিতে নয়— ভালোবাসেন শুধুই দিতে।
যাঁরা পেতে নয়— ভালোবাসেন শুধুই বিলাতে।
জিহাদের ময়দানেও 'মালে গনিমত'-এর বদলায় 'মালে হায়াত'ই—
যাঁদের কাছে বেশী লালায়িত।

'মালে গনিমত'-এর পেছনে লড়াই করা আর 'আকিদা'র পেছনে জীবন বাজি রাখা কি এক? কী দুস্তর ফারাক!

إلى أي شيئ ندعو النـــاس (কোন দিকে আমরা মানুষকে ডাকবো?) পুস্তিকায় শায়খ হাসানুল বান্না বলেছেন

'জাতি গঠনের জন্যে, জাতিকে সুপ্রশিক্ষণে প্রশিক্ষিত করে তোলার জন্যে, আশা-আকাঙ্ক্ষা ও স্বপ্ন-সাধ বাস্তবায়নের জন্যে, সর্বোপরি দীনের মৌলিক ভিত্তি ও আদর্শকে সমুন্নত রাখার জন্যে— দরকার এমন উম্মত ও দল, যারা এ-লক্ষ্য অর্জনের জন্যে নিরন্তর চেষ্টা চালাবে, মানুষকেও এ পথের দিকে উদ্বুদ্ধ করবে। সর্বোপরি তাদের মধ্যে আরো থাকবে এইসব জরুরি গুণাবলী—

এক. দৃঢ় প্রত্যয়বোধ ও ইস্পাত-কঠিন মানসিক প্রাচুর্য— দুর্বলতা ও হীনমন্যতা এবং লোভ ও অন্যায্য চাহিদা যেখানে কোনো রকম প্রভাব ফেলতে পারবে না।

দুই. ওফাদারী ও বিশ্বস্ততা, যা কোনোদিন বিপদগ্রস্ত হবে না— রঙ পরিবর্তন করে কিংবা গাদ্দারির পথ ধরে।

তিন. আত্মবিসর্জনের আকুলতা, যেখানে থাকবে না দুনিয়া প্রাপ্তির কোনো আশা ও লোভ।

চার. দীনের বুনিয়াদি আকিদা সম্পর্কে অবগতি অর্জন এবং তার প্রতি গভীর আস্থা ও বিশ্বাস এবং সম্মান ও ভালোবাসা পোষণ, যা বাঁচাবে ভুল-ক্রটি ও স্খলন থেকে এবং দুশমনের প্রতারণা ও ধোকা থেকে আর উদ্বুদ্ধ করবে দীনের পথে জীবন বাজি রাখতে।

এইসব বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলী হলো— হৃদয় জগতকে আলোকিত করার প্রথম ও প্রধান স্তম্ভ। এই বিশাল আধ্যাত্মিক শক্তির উপরই নির্মিত হয় ইসলামের নীতি-আদর্শের সুউচ্চ প্রাসাদ। গড়ে উঠে সচেতন ও জাগ্রত জাতি। জন্ম নেয় জাতিকে স্বপ্ন-দেখানো প্রখর চেতনাদীপ্ত ঝাঁক-ঝাঁক তারুণ্য। দীর্ঘকাল দীর্ঘশ্বাসের উষ্ণতায় জীবনের অর্থ খুঁজে-ফেরা মানুষের জীবনে ফিরে আসে—নতুন স্রোত, নতুন প্রবাহ, নতুন উদ্দীপনা।

সুতরাং উপরিউক্ত বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলী থেকে যে জাতি ও সম্প্রদায় বঞ্চিত হবে, অথবা নিদেন পক্ষে তাদের শাসকশ্রেণীও যদি তা থেকে বঞ্চিত হয়, তাহলে সে জাতি বড়ো অভাগা জাতি! সে সম্প্রদায় বড়ো দুর্ভাগা সম্প্রদায়!! তারা ব্যর্থ!! তারা বয়ে আনতে পারবে না কোনো মঙ্গল ও কল্যাণ। বাস্তবায়ন করতে পারবে না কোনো স্বপ্নসাধ ও আশা-আকাঙ্খা। কেবল দ্বিধা-সংশয়ের ভিতরে.. কেবল কল্পনা বিলাসের মরীচিকায় তারা ঘুরে ফিরবে। ইরশাদ হচ্ছে—

وَإِنَّ الظَّنَّ لا يُغْنِي مِنْ الْحَقِّ شَيْئاً.

'কল্পনা-মোটেই সত্যের স্থান পূরণ করতে পারে না।' -নজম: ২৮

এটাই আল্লাহ্‌র বিধান। এটাই সৃষ্টির জন্যে স্রষ্টার নিয়ম। এই বিধানের ব্যতিক্রম হয় না। ব্যত্যায় ঘটে না। ইরশাদ হচ্ছে—

إِنَّ اللَّهَ لا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ.

'আল্লাহ কোনো জাতির ভাগ্য (সুঅবস্থা) পরিবর্তন করেন না, যতোক্ষণ না তারা নিজেরা নিজেদের (আত্মা ও আমলের) পরিবর্তন ঘটায়।' রা'দ:১১

আর এই অমোঘ বিধানের কথা নবুয়তের ভাষায় উচ্চারিত হয়েছে এভাবে—

يوشك الأمم أن تداعى عليكم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها ' فقال قائل : ومن قلة نحن يومئذ؟ قال : بل أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولينزعن الله من صدور أعدائكم المهابة منكم، وليقذفن في قلوبكم الوهن '. فقال قائل : يــا رسول الله ! وما الوهن؟ قال : حب الدنيا وكراهية الموت

'অচিরেই শত্রু সম্প্রদায় একত্রিত হয়ে তোমাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়বে, যেমন ঝাঁপিয়ে পড়ে ক্ষুধার্তরা খাবারের পাত্রে'। তখন একজন বললেন : আমরা কি তবে সেদিন সংখ্যায় অল্প হবো? তিনি বললেন : 'বরং তোমাদের সংখ্যা সেদিন অনেক বেশি হবে। কিন্তু তোমাদের অবস্থা হবে স্রোতে-ভাসা খড়কুটোর ন্যায়। আল্লাহ তোমাদের দুশমনের হৃদয় থেকে তোমাদের ভয় উঠিয়ে দেবেন। আর তোমাদের হৃদয়ে ঢেলে দেবেন 'ওহ্‌ন'।' তখন একজন আরজ করলেন : 'ওহ্‌ন' কী হে আল্লাহ্‌র রাসূল? তিনি বললেন: '(ওহ্‌ন হলো) দুনিয়াপ্রীতি ও মৃত্যুভয়'।

এই হাদীস থেকে কী প্রমাণিত হয়? ..আল্লাহ্‌র রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছেন যে, উম্মতের দুর্বলতা ও লাঞ্ছনার কারণ হলো— তাদের মন দুর্বল ও হীনবল হয়ে পড়েছে। সুকুমারবৃত্তি ও বীরোচিত গুণাবলী অর্জনে ব্যর্থ হয়ে পড়েছে। যদিও বর্তমানে সংখ্যায় তারা বিপুল। সম্পদ ও প্রাচুর্যেও নেই কোনো অভাব ও শূন্যতা।

উম্মত যখন বিলাসিতায় গা ভাসিয়ে দেয়, আরাম-আয়েশের বনে আটকা পড়ে যায়, ডুবে যায় পার্থিব ইন্দ্রজালের মোহময়তায় আর পাশাপাশি বিস্মৃত হয়ে পড়ে বিপদ ও দুর্দিনের মুখোমুখি হতে, নাজুক ও অনাকাঙ্ক্ষিত পরিস্থিতিকে মুকাবিলা করতে, আল্লাহ্‌র পথে জানবাজি রেখে লড়াই করতে— তখন তাদের পতন কেউ ঠেকাতে পারে না! তাদের ধস কেউ রুখতে পারে না!

জামায়াতে ইসলামী এবং ইখওয়ানুল মুসলিমীন-এর লক্ষ্য-উদ্দেশ্য এবং শায়খ নদভী'র অবস্থান

ভারত-পাকিস্তানে 'জামায়াতে ইসলামী' এবং মিসরে 'ইখওয়ানুল মুসলিমীন'— বড় দু'টি ইসলামী দল। তাদের উল্লেখযোগ্য যে সব লক্ষ্য-উদ্দেশ্যের সাথে শায়খ নদভীর কোনো মতবিরোধ ছিলো না, তা হলো— ইসলামের হৃত গৌরব ফিরিয়ে আনা, রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে ইসলামী অনুশাসন প্রতিষ্ঠা, পাশ্চাত্যের ধর্মনিরপেক্ষ চিন্তাধারা ও দর্শন থেকে মুক্তি —যা অনেক মুসলিম দেশেও জেঁকে বসেছে— এবং তৎস্থলে ইসলামী চিন্তা-দর্শন ও মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠা। এ-ধরনের ইত্যাদি বিষয়ের সাথে শায়খ নদভী সম্পূর্ণ একমত। এ-সবের কোনো কিছুরই বিরোধী ছিলেন না তিনি। তিনি মোটেই ইসলামী রাষ্ট্র ও অনুশাসন প্রতিষ্ঠার বিরোধী ছিলেন না। ইসলামী সমাজ বিনির্মাণের বিরোধী ছিলেন না। এমন জীবনধারা কে না চায়— যা বাস্তবভিত্তিক ও পরিপূর্ণ? ভারসাম্যপূর্ণ ও সামঞ্জস্যপূর্ণ? ইসলামী আকিদা-বিশ্বাস ও ভাবধারায় পরিপুষ্ট এবং নীতি-নৈতিকতা ও আদর্শে পরিচালিত? শায়খ নদভীও এমন চাওয়া থেকে মোটেই পিছিয়ে ছিলেন না। ইসলামী অনুশাসনের সবুজ ছায়ায় এমন আদর্শ সমাজ ও জাতির স্বপ্ন দেখেছেন তিনি জীবনভরই— তাঁর কথায়, লেখায়, অনুভবে। এ নিয়েই তো আবর্তিত ছিলো তাঁর মূল লেখালেখি?! ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين (মুসলমানদের পতনে বিশ্ব কী হারালো) -এর শব্দে-শব্দে, বাক্যে-বাক্যে এবং الصراع بين الفكرة الإسلامية والفكرة الغربية في الأقطار الإسلامية (মুসলিম বিশ্বে ইসলামী সভ্যতা ও পাশ্চাত্য সভ্যতার সংঘাত) -এর পাতায় পাতায় এবং তাঁর অসংখ্য ছোট বড় গ্রন্থে-পুস্তকে তাঁর এ-স্বপ্নসাধের মূর্ত অভিব্যক্তি কি ধ্বনিত হয় নি? ... তাহলে তাঁর সঠিক অবস্থানকে বিকৃত করে কেনো দ্বিধা-দ্বন্দ্ব ও সংশয়-সন্দেহের ধুম্রজাল ছড়ানো হবে? কেনো তাঁকে এমন লোকদের কাতারে নিয়ে যাওয়ার এই অশুভ মানসিকতা— যারা বলে : ধর্ম ও রাজনীতি আলাদা? ধর্মের সাথে রাজনীতির এবং রাজনীতির সাথে ধর্মের কোনো সম্পর্ক নেই?! ... এ বড়ো অন্যায়! বড়ো অবিচার!!

জামায়াতে ইসলামী'র যে চিন্তাধারার ঘোর বিরোধী তিনি

জামায়াতে ইসলামী'র যে সব চিন্তাধারা ও বিশ্বাসের সাথে শায়খ নদভী একমত হতে পারেন নি, তা স্ববিস্তারে তিনি বিবৃত করেছেন তাঁর التفسير السياسي للإسلام (ইসলামের রাজনৈতিক ব্যাখ্যা) গ্রন্থে। সে মতবিরোধপূর্ণ বিষয়সমূহের একটি বিষয়ের মধ্যেই এখানে আমরা আমাদের আলোচনা সীমাবদ্ধ রাখবো। সে বিষয়টি হলো এই যে, জামায়াতে ইসলামী রাষ্ট্রক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হওয়াকে এতো বেশি জোর দেয় যে, যেনো এটিই ইসলাম এবং দাওয়াতের একমাত্র লক্ষ্য-উদ্দেশ্য ও কেন্দ্রবিন্দু। এমনকি এ-দিকটিকে দলটি এমন বাড়াবাড়ি পর্যায়ে 'হাইলাইট' করেছে যে, যেনো পূর্ণ ইসলামটা 'এইখানেই' লুকিয়ে আছে। ফলে ইসলামের দাওয়াতের সাথে সম্পৃক্ত ব্যক্তিবর্গ, যারা এ-দিকটিতে সক্রিয় নন বা অনুপস্থিত, তারা যেনো ইসলাম ও ইসলামী দাওয়াতের সাথে সম্পর্কহীন। এমনকি তাদের ইলম ও জ্ঞানও যেনো তখন পরিণত হয় ইসলামের সাথে যোগাযোগহীন বাড়তি কোনো খেলো জিনিসে! তাদের বেঁচে থাকারও যেনো কোনো অধিকার নেই, সার্থকতা নেই!

ইখওয়ানুল মুসলিমীন -এর প্রতি শায়খ নদভী'র নসীহত

অনেক দিন আগে এ-কথাটাই শায়খ নদভী ইখওয়ান নেতৃবৃন্দ ও কর্মীদেরকে স্পষ্ট ভাষায় বলে দিয়েছিলেন, যখন ১৯৫১ সালে তিনি মিসর-সফরকালে ইখওয়ানুল মুসলিমীন নেতৃবৃন্দের সাথে মিলিত হয়েছিলেন। সেই স্পন্দিত, প্রাণময়, বাঙ্ময় এবং আবেগ ও নিষ্ঠার উত্তাপে উষ্ণ ও দ্যুতিত পংক্তিমালার আংশিক এখানে উল্লেখ না করে পারছি না। শায়খ নদভী'র ভাষায়—

'বন্ধুগণ! দীনি দাওয়াত ও ইসলামী সংস্কার কাজ বড়ো একটা সহজ নয়। অনেক গভীরে প্রোথিত এর মূল। শুধু কোনো শাসন ব্যবস্থাকে বদলে দেয়াই ইসলামী দাওয়াত ও মিশনের কাজ বা লক্ষ্য নয়, হতে পারে না। কোনো রাজনৈতিক পরিস্থিতি ও প্রেক্ষাপটের অদলবদলও নয়। অর্থনৈতিক ব্যবস্থার পরিবর্তনও নয়। সংস্কৃতি ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রচার-প্রসারও নয়। নিরক্ষরতা ও অজ্ঞতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করাও নয়। অচলাবস্থা ও বেকারত্বের বিরুদ্ধে লড়াই করাও নয়। শুধু নৈতিক অবক্ষয় ও সামাজিক ত্রুটি-বিচ্যুতি থেকে মুক্তিলাভ করাও নয়। বরং ইসলামী দাওয়াতের ব্যাপ্তি

ও বিস্তৃতির পরিধি— আরো ব্যাপক বিস্তৃত। আরো গভীরে প্রোথিত। আরো বহুদিগন্ত-প্রসারিত। ইসলামী দাওয়াত একটি 'মহা সমন্বয়কে' কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়েছে :

ইসলামী দাওয়াত হলো— আকিদা-বিশ্বাস ও চরিত্র-সুষমা।

ইসলামী দাওয়াত হলো— গুচ্ছ গুচ্ছ কর্ম ..

স্তরে স্তরে বিন্যস্ত রাজনীতি।

ইসলামী দাওয়াত হলো— ইবাদত-বন্দেগী'র মধ্য দিয়ে আল্লাহ্‌র কাছে বিনয়মাখা আত্মসমর্পণ।

ইসলামী দাওয়াত হলো— ব্যক্তিক ও সামাজিক আচার-আচরণে পবিত্রতা ও পরিশুদ্ধতা।

ইসলামী দাওয়াত হলো— বুদ্ধি ও যুক্তিকে স্বাগত জানানো হৃদয়-মন ও দেহ-আত্মাকে সাথে নিয়ে।

ইসলামী দাওয়াত হলো— মন-মানসের.. আকিদা-বিশ্বাসের.. বিবেক-বুদ্ধির গভীর পরিবর্তন।

ইসলামী দাওয়াত—
দাঈ'র কলম নয়,
কিতাবের পাতা নয়,
বক্তৃতার মঞ্চও নয়—
বরং হৃদয়োৎসারিত বোধ-বিশ্বাস
এবং সমাজের আগে নিজের বাস্তব জীবনে তার পূর্ণ বাস্তবায়ন।
ইসলামী দাওয়াত ওৎপ্রোতভাবে জড়িত নবী-রাসূলগণের সাথে,
তাঁদের ঈমান ও জিহাদের সাথে,
তাঁদের শিক্ষা ও দীক্ষার সাথে,
তাঁদের হিকমত ও প্রজ্ঞার সাথে,
তাঁদের দৃঢ়তা ও অবিচলতার সাথে,
তাঁদের ইখলাস ও নিষ্ঠার সাথে।

তবে, যেহেতু এই দাওয়াত শুধুমাত্র নবী-রাসূলগণের যুগ-মানসের সাথেই সম্পৃক্ত নয়, বরং সর্বযুগের সকল মানুষের জন্যেই এই দাওয়াত, তাই যুগ-চাহিদা এখানে প্রতিফলিত হতেই পারে। দাওয়াতের পদ্ধতিগত পরিবর্তন ও সংস্কার আসতেই পারে। কিন্তু তাই বলে কোনো অবস্থাতেই

নবী-রাসূলগণের দাওয়াতের ভিত্তি থেকে সরে পড়া যাবে না। আলো গ্রহণ করতে হবে তাঁদের প্রদীপ থেকেই। ফিরে যেতে হবে সেই মূল উৎসধারাতেই। যে-কোনো মূল্যে .. যে-কোনো ত্যাগ ও সাধনায়।'

একটু পরে এসে শায়খ নদভী রহ. বলছেন :

'নবী-রাসূলগণের আরেকটি বুনিয়াদি বৈশিষ্ট্য ছিলো এই যে, তাঁদের দাওয়াত ও মেহনত ছিলো যাবতীয় সার্থচিন্তা ও দ্রুত ফলাফল লাভের ব্যাকুলতা থেকে মুক্ত। তাঁদের দাওয়াত, মেহনত ও জিহাদের একমাত্র লক্ষ্য ছিলো— আল্লাহ্‌র রেযামন্দি ও সন্তুষ্টি, তাঁর নির্দেশ পালন করে যাওয়া। দুনিয়ার জন্যে কিছু করা, মর্যাদা লাভের জন্যে কিছু করা, পরিবার-পরিজন ও অনুসারীদের জন্যে বা রাষ্ট্র ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হওয়ার জন্যে কিছু করা— তাঁদের ব্যাপারে এ একেবারেই অকল্পনীয়। আর নবী-রাসূলগণের সময়কালে তাঁদের নেতৃত্বে যে হুকুমত ও রাষ্ট্রক্ষমতা লাভ হয়েছিলো, তা ছিলো আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে একটি 'স্বাভাবিক' পুরস্কার। সুতরাং এই রাষ্ট্রক্ষমতা হলো— দীনের মূল লক্ষ্য-উদ্দেশ্য অর্থাৎ সমাজ ব্যবস্থায় শরীয়া বিধি-বিধান বাস্তবায়নপূর্বক ইতিবাচক পরিবর্তন এনে সমাজকে সঠিক দিক-নির্দেশনা প্রদানের একটি ওসিলা বা মাধ্যম। ইরশাদ হচ্ছে—

الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلاَةَ وَآتَوْا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنْ الْمُنْكَرِ.

'যদি আমি তাঁদেরকে জমিনে প্রতিষ্ঠা দিই, তাহলে তাঁরা সালাত কায়েম করবে, যাকাত আদায় করবে, সৎ কাজের নির্দেশ দেবে এবং অন্যায় কাজ থেকে নিষেধ করবে।' -হজ্ব: ৪১

সুতরাং রাষ্ট্রক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হওয়া কখনোই নবী-রাসূলগণের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য ছিলো না। আলোচনার বিষয়ও ছিলো না। এমনকি এর জন্যে তাঁরা কোনোদিন স্বপ্নও দেখেন নি। গভীর অভিনিবেশ সহকারে তাঁরা কেবল দাওয়াত ও জিহাদেই মশগুল ছিলেন। আর এরই স্বাভাবিক পরিণতি হিসাবে রাষ্ট্রক্ষমতাও হাসিল হয়েছে। ঠিক যেমন বৃক্ষচারা বড় হলে.. ফলদানের উপযুক্ত হলে স্বাভাবিক নিয়মেই তাতে ফল ধরে। ফুল ফোটে।

আমি আমার অন্য একটি পুস্তিকা بين الجباية والهداية তে-এ প্রসঙ্গে বলেছিলাম :

'আল্লাহ মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে পাঠালেন। তিনি এসে মানুষকে আল্লাহ্‌র দিকে ডাকলেন। মানুষ সাড়া দিলো তাঁর ডাকে। জড়ো হলো তাঁর পাশে।

إِنَّهُمْ فِتْيَةٌ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ وَزِدْنَاهُمْ هُدًى. وَرَبَطْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ لَنْ نَدْعُوَ مِن دُونِهِ إِلَهاً لَقَدْ قُلْنَا إِذاً شَطَطاً. هَـؤُلاءِ قَوْمُنَا اتَّخَذوا مِن دُونِهِ آلِهَةً لَوْلا يَأْتُون عَلَيْهِمْ بِسُلْطَانٍ بَيِّنٍ فمنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِباً.

'তারা কয়েকজন যুবক ঈমান এনেছিলো তাদের প্রতিপালকের প্রতি আর আমি তাদের হিদায়াতের উপর পথ-চলার শক্তিকে বাড়িয়ে দিয়েছিলাম। তাদের মনোবলকে সুদৃঢ় করে দিয়েছিলাম, যখন তারা দাঁড়িয়ে বলেছিলো : আমাদের রব হলেন আকাশমণ্ডলী ও জমিনের রব। তাঁর পরিবর্তে অন্য কোনো ইলাহকে আমরা ডাকবো না। এ ভিন্ন অন্য কোনো কথা বললে তা হবে গর্হিত উক্তি। এরা আমাদেরই স্বজাতি। এরা তাঁর পরিবর্তে অনেক উপাস্য গ্রহণ করেছে। কেনো এরা তাদের ইবাদতের পক্ষে সুস্পষ্ট প্রমাণ পেশ করছে না? যে আল্লাহ্‌র উপর মিথ্যা আরোপ করে তারচে' অধিক জালিম আর কে আছে?' -(কাহফ: ১৩-১৫)

এই যুব সম্প্রদায়ই জুলুম-নিপীড়ন ও নিষ্ঠুরতার শিকার হয় যুগে-যুগে। এদের উদ্দেশ্যেই ইতিপূর্বে বলা হয়েছিলো—

أَحَسبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لا يُفْتَنُون. وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِين مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِين صَدَقُوا وَلَيَعْلَمنَّ الْكَاذِبِين.

'লোকেরা কি ভেবে বসেছে যে, তারা এ-কথা বলেই অব্যাহতি পেয়ে যাবে যে, আমরা ঈমান এনেছি এবং তাদেরকে (বিপদ আপদ দিয়ে) পরীক্ষা করা হবে না? তাদের পূর্ববর্তী সম্প্রদায়কেও আমি পরীক্ষা করেছি। অবশ্যই আল্লাহ জেনে নেবেন (এই পরীক্ষার ভিতর দিয়ে) কে সত্যবাদী, আর কে মিথ্যাবাদী।' -আনকাবুত: ২-৩

ফলে কী দেখা গেলো? এ-পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার জন্যে তাঁরা প্রতিটি মুহূর্তে অবিচলতার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করলেন পাহাড়ের ন্যায়।

قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ ورسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلاَّ إِيمَاناً وَتَسْلِيماً.

'তারা বললো যে, এই হলো সেই প্রতিশ্রুতি, যা আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল আমাদেরকে দিয়েছিলেন। আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল সত্য বলেছেন।'

-আহযাব: ২২

শেষ পর্যন্ত হিজরতের অনুমতি মিললো। দাওয়াতের কাজ এগিয়ে চললো নিজস্ব গতিতে। পথে পথে আসতে লাগলো তার ফল ও স্বাভাবিক পরিণতি। শেষ পর্যন্ত আল্লাহ্‌র ইচ্ছায় আল্লাহর পথের এ-দাঈরাই বিশ্ব শাসন করলেন। ন্যায়-নীতি ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করলেন। মানুষকে উদ্ধার করলেন কুফুরীর আঁধার থেকে ঈমানের আলোর দিকে। মানুষের 'ইবাদত' থেকে স্রষ্টার ইবাদতের দিকে। পৃথিবীর সংকীর্ণতা থেকে বিস্তৃতির দিকে। এ ভাবে আল্লাহ তাঁদেরকে এমন অবস্থায় উন্নীত করলেন যে, এখন তাঁদের হাতে রাষ্ট্রক্ষমতা তুলে দেয়া হলেও أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ (তাঁরা সালাত কায়েম করবে, যাকাত আদায় করবে, সৎ কাজের নির্দেশ দেবে এবং অন্যায় কাজ থেকে নিষেধ করবে।' (হজ্ব: ৪১) আর এটাই তাঁদের মূল দায়িত্ব।

হ্যাঁ .. এ ভাবেই দাওয়াতের কাজ প্রবাহিত হয়েছে নিজস্ব গতি পথে। হিকমত ও প্রজ্ঞা সহযোগে .. ত্যাগ ও সাধনা সহযোগে। ফলে স্বাভাবিক পরিণতি হিসাবেই এসেছে হুকুমত ও রাষ্ট্রক্ষমতা। যেমন বৃষ্টি হলে হেসে উঠে আঁধার বসুন্ধরা— সবুজ-শ্যামলিমায় .. ক্ষেত-খামারের উর্বরতায়। যেমন আজকের ছোট্ট এই সবুজ চারাটা, 'কালকেই' বেড়ে উঠে অদ্ভুত ফলন ক্ষমতায়, লকলকিয়ে। ফলভারে একদিন নুয়ে পড়ে তার ডালপালা। সুতরাং এ-শাসন ক্ষমতাও সন্দেহাতীতভাবে ইসলামী দাওয়াতের অসংখ্য ফলের একটিমাত্র ফল। শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হওয়ার এ-গৌরব ও সম্মান এবং এ-নেয়ামত ও পুরস্কার হলো— সেই কষ্টঘেরা .. দুঃখঘেরা .. রক্তঝরা দিনগুলোরই একটি স্বাভাবিক পরিণতি। যে কষ্ট .. যে দুঃখ .. যে রক্ত সইতে হয়েছে, বইতে হয়েছে এবং ঝরাতে হয়েছে মক্কার কালো দিনগুলোতে। তায়েফের নিষ্ঠুর দিনগুলোতে।

বন্ধুগণ! কোনো কিছুকে 'টার্গেট' বানিয়ে তার পেছনে ছুটে-চলা এবং স্বাভাবিক পরিণতি হিসাবে কোনো কিছুর ফল প্রকাশ পাওয়া— দু'টি দু' জিনিস, মোটেই এক নয়। এর মাঝে রয়েছে দুস্তর ফারাক। সুতরাং যার 'টার্গেট' রাষ্ট্র ক্ষমতা, তার এ 'টার্গেট' পূর্ণ না হলে সে হতোদ্যম হয়ে

পড়বে.. ভেঙে পড়বে। নিরাশার অন্ধকারে হারিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনাও প্রবল। তখন এ-কারণে সে দাওয়াতের কাজ থেকে হাত গুটিয়ে নিতে পারে। অপরদিকে তার 'টার্গেট' যদি পূরণ হয়ে যায়, রাষ্ট্র ক্ষমতায় যদি সে অধিষ্ঠিত হয়েই পড়ে, তখন সে স্বেচ্ছাচারী হয়ে উঠে। এই দৃষ্টিকোণ থেকে যে-কোনো দলের ও জামাতের জন্যে বড়ো বিপজ্জনক হবে, যতি তা রাষ্ট্র ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হওয়ার উদগ্র বাসনায় পরিচালিত হয়। তাহলে নিশ্চিতভাবেই বলা যায় তারা নিজেদের 'এই লক্ষ্য' ছুঁইতে গিয়ে দাওয়াতের পথে ত্যাগ ও কুরবানী পেশ করতে ব্যর্থ হবে। কিংবা দাওয়াতের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য থেকে দূরে সরে পড়বে। কেননা, রাষ্ট্র ক্ষমতায় পৌঁছার জন্যে যে পথ ও পন্থা এবং ধাপ ও সিঁড়ি ব্যবহার করতে হয়, তা দাওয়াতের পথ ও পন্থা এবং ধাপ ও সিঁড়ি থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। একটির সাথে আরেকটির আদর্শগত কোনো মিল নেই। চেতনাগতভাবেও কোনো মিল নেই।

সুতরাং আমাদের জন্যে জরুরী হলো, আমাদের আকল-বুদ্ধি ও মন-মানসকে অন্য সব চিন্তা থেকে দূরে সরিয়ে শুধু, শুধু এবং শুধু দাওয়াতের জন্যে, খিদমতের জন্যে, আত্মত্যাগ ও আত্মবিসর্জনের জন্যে, মানুষকে আঁধার থেকে আলোয় নিয়ে আসার জন্যে, জাহিলিয়াতের সকল রূপ ও ধরন থেকে মুক্ত করে পরিপূর্ণ ইসলামের দিকে নিয়ে আসার জন্যে, পৃথিবীর অবিস্তৃতি ও সংকীর্ণতা থেকে বিস্তৃতি ও প্রশস্ততার দিকে নিয়ে আসার জন্যে, বিকৃত ও ভেজাল ধর্মের অবিচার ও বেইনসাফী থেকে .. অত্যাচারী শাসন ব্যবস্থার কবল থেকে মুক্ত করে ইসলামের শাশ্বত ন্যায়-নীতি, সুবিচার ও সর্বোত্তম আদর্শের সুশীতল ছায়াতলে নিয়ে আসার জন্যে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালানো। কর্ম ও জিহাদের ময়দানে আমাদের প্রেরণার একমাত্র উৎসস্থল হবে— আল্লাহ্‌র বিধি-বিধান ও হুকুম-আহকাম। পরকালের মুক্তি ও সাফল্যের অভিলাষ। আল্লাহ্‌র পুণ্যবান বান্দাগণের জন্যে বরাদ্দকৃত জান্নাতের অফুরন্ত নায-নেয়ামত। সৃষ্টিলোকের প্রতি মায়া-মমতা ও ভালোবাসা। নিপীড়িত মানবতাকে উদ্ধারের সহজাত দায়বদ্ধতা।

তবে এমন যদি হয় যে, রাষ্ট্র ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হওয়া ছাড়া দাওয়াতের সংগ্রাম ও সাধনামুখর এবং ত্যাগ-তিতিক্ষা ও কুরবানীময় কোনো ধাপে বা কোনো সময়কালে যদি পূর্ব-বিবৃত শরীয়তের মূল লক্ষ্য

অর্জিত না হয়, তাহলে দাঈ'র মন-মানসে দাওয়াতের মাহাত্ম্য ও মাহিত্য এবং বুনিয়াদি নীতিমালা ও তাৎপর্য দৃঢ়মূল হওয়ার পরই শুধু দাওয়াত ও দীনের সার্থে .. সততা ও পবিত্রতার সার্থে .. সত্যবাদিতা ও আমানতদারির সার্থে .. আল্লাহ ও রাসূলের সর্বানুগত্যের সার্থে এই 'রাষ্ট্র ক্ষমতা'র জন্যে চেষ্টা-সাধনা করা যেতে পারে। কিন্তু মুহূর্তের জন্যেও মূল লক্ষ্য থেকে বিচ্যুত হলে চলবে না। অবশ্যই পূর্ণরূপে অব্যাহত থাকবে অন্যান্য ইবাদতসমূহ পালন করে যাওয়ার নিরন্তর চেষ্টা সাধনা ও সংকল্প। কেননা, মু'মিনের জীবনে হুকুমত এবং ইবাদতের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই, যদি থাকে ইখলাস ও নিষ্ঠা এবং সততা ও বিশুদ্ধতা। আল্লাহ্র রিযা ও সন্তুষ্টির ভিতরেই রয়েছে মু'মিনের কামিয়াবি ও সাফল্য। তখন মু'মিনের সব কাজই সৎ কাজ হিসাবে গণ্য হবে। তা তাকে পৌঁছে দেবে আল্লাহ্র সকাশে, তাঁর একান্ত সান্নিধ্যে।

শায়খ নদভী এবং রাজনৈতিক পরিবর্তন

অনুরূপ মৌলিকভাবে রাজনৈতিক পরিবর্তনের চেয়ে শায়খ নদভী অধিক জোর দিতেন ঈমানী ও নৈতিক পরিবর্তনের উপর। পক্ষান্তরে মাওলানা মওদূদী এবং শহীদ সায়্যিদ কুতব রাজনৈতিক পরিবর্তনের উপর বেশি জোর দিতেন। এ জন্যে শায়খ তাদের কঠোর সমালোচনা করেছেন। বিশেষত মওদূদী সাহেব المصطلحات الأربعة في القرآن (কুরআনের চার পরিভাষা) গ্রন্থে 'রব', 'ইলাহ', 'দীন' ও 'ইবাদত' সম্পর্কে যে ব্যাখ্যা মাওলানা মওদূদী সাহেব দিয়েছেন, শায়খ নদভী তার তীব্র সমালোচনা করেছেন التفسير السياسي للإسلام (ইসলামের রাজনৈতিক ব্যাখ্যা) গ্রন্থে। এ ক্ষেত্রে শহীদ সায়্যিদ কুতবও মাওলানা মওদূদী সাহেবের লেখা ও ভাবধারায় যথেষ্ট প্রভাবিত হয়েছেন। التفسير السياسي للإسلام (ইসলামের রাজনৈতিক ব্যাখ্যা) গ্রন্থটি মওদূদী সাহেবের অনুসারীদের ভিতরে তীব্র ক্ষোভের সঞ্চার করে। তারা বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় এর বিরুদ্ধে নিজেদের ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করে। অনেকে আবার এইসব লেখার সংকলনকে التفسير الحقيقي للإسلام (ইসলামের প্রকৃত ব্যাখ্যা) নাম দিয়েছেন।

কিন্তু মাওলানা মওদূদী সাহেব নিজে শায়খ নদভী'র এই সমালোচনার কোনো জবাব দেন নি। সম্ভবত তিনি তা ইতিবাচকভাবেই নিয়েছিলেন। যাইহোক; ইতিহাস বলে— নেতৃবৃন্দ যা করতে পারেন অতি উদারতায়, তাদের অনুসারীরা তা-ই প্রত্যাখ্যান করেন অতি অবিবেচনায়।

এখানে মাওলানা মওদূদী এবং শায়খ নদভী'র মাঝে কোনো বিভাজনভিত্তিক কোনো আলোচনার অবতারণা আমাদের প্রতিপাদ্য নয়, ইসলাহ ও সংশোধন-সংস্কারের ক্ষেত্রে শায়খ নদভী'র দর্শন ও চিন্তাধারা তুলে ধরাই আমাদের মূল উদ্দেশ্য।

সংস্কার পদ্ধতিতে শায়খ নদভী'র চিন্তা-দর্শন

শায়খ নদভী'র মতে সংস্কারের ক্ষেত্রে চিন্তা-দর্শনের একটি বিরাট ভূমিকা ও প্রভাব রয়েছে। এজন্যেই শায়খ নদভী বড়ো গুরুত্ব সহকারে তাঁর বিভিন্ন লেখায়-বক্তৃতায় ইসলাম সম্পর্কে, ইসলামের শাশ্বত পয়গাম সম্পর্কে এবং ইসলামের সভ্যতা-সংস্কৃতি সম্পর্কে আরোপিত বিভিন্ন ভুল ও অপব্যাখ্যা সম্পর্কে মুসলিম উম্মাহকে সতর্ক করেছেন। পাশাপাশি তিনি বাতিল ফেরকা ও চিন্তাধারার বিরুদ্ধে সতর্কতার সাথে প্রতিরোধ গড়ে তোলার আহ্বান জানিয়েছেন। যা মুসলিম উম্মাহকে বিভ্রান্ত করে ইসলামের সরল রেখা বা 'সিরাতাল মুস্তাকিম' থেকে দূরে সরিয়ে দেয়। ইসলামের এই পরিশুদ্ধ ও পরিচ্ছন্ন এবং অনাবিল চিন্তাধারা ও দর্শনের উপর ভিত্তি করেই উম্মতে মুসলিমা জাহিলিয়াতের বুদ্ধিবৃত্তিক ও মনোবৃত্তিক অক্টোপাশ থেকে বেরিয়ে আসতে সক্ষম হয়। মুক্তি লাভ করতে পারে বাতিল মতবাদ ও তাগুতি শক্তির হাত থেকে— তা যে নামেই হোক, যে রূপেই আবির্ভূত হোক এবং যে শিরোনামেই প্রকাশ লাভ করুক।

পবিত্র কুরআনেও বিষয়টি সবিশেষ গুরত্ব সহকারে উল্লেখিত হয়েছে। বাতিল ও তাগুতকে প্রত্যাখ্যান করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولاً أَنْ اُعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ

'আমি প্রতিটি সম্প্রদায়ের নিকট এই আহ্বানসহ একজন রাসূল পাঠিয়েছি যে, তোমরা আল্লাহ্‌র ইবাদত করো এবং তাগুত (গায়রুল্লাহ)কে বর্জন করো।' -নাহল:৩৬

وَالَّذِين اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ أَنْ يَعْبُدُوهَا وَأَنَابُوا إِلَى اللهِ لَهُمْ الْبُشْرَى.

'যারা তাগুতকে বর্জন করলো— তার পূজা-অর্চনা প্রত্যাখ্যান করে এবং আল্লাহ্‌র দিকে প্রত্যাবর্তন করলো, অবশ্যই তাদের জন্যে রয়েছে সুসংবাদ।' -যুমার:১৭

فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فقدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لا انفِصَامَ لَهَا.

'যে তাগুতকে প্রত্যাখ্যান করবে এবং আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমান আনবে অবশ্যই সে সুদৃঢ় হাতলকে ধারণ করলো, যা বিচ্ছিন্ন হবার নয়।'
-বাকারা:২৫৬

আয়াতে সর্বাগ্রে গুরুত্ব দেয়া হয়েছে তাগুত ও শয়তানি শক্তিকে প্রত্যাখ্যানের উপর তারপর আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমান আনার উপর। যেমন প্রাধান্য দেয়া হয় অলংকরণের পূর্বে শূন্যকরণকে এবং নির্মাণের পূর্বে পুরাতন ধ্বংসাবশেষ ও ক্ষতিকর বস্তুর অপসারনকে।

শায়খ নদভী'র এ চিন্তা-দর্শন (হক ও বাতিলের এবং সত্য ও মিথ্যার সংঘাত চিহ্নিতকরণ এবং হক ও সত্যের পক্ষে দৃঢ় অবস্থান গ্রহণ) বড়ো মনোগ্রাহ্য করে তত্ত্ব ও তথ্যের বৈচিত্রে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে তার আরেকটি অমর গ্রন্থ الصراع بين الفكرة الإسلامية والفكرة الغربيــة في الأقطــار الإســلامية (মুসলিম বিশ্বে ইসলামী সভ্যতা ও পাশ্চাত্য সভ্যতার সংঘাত)-এর পাতায় পাতায়।

ঠিক একই কারণে কাদিয়ানি মতবাদের বিরুদ্ধেও তিনি কলম ধরেছেন। যারা খতমে নবুয়তের আকিদার সাথে চরম ধৃষ্টতা প্রদর্শন করেছে। অনুরূপভাবে কট্টরপন্থী জাতীয়তাবাদ —যা মুসলিম উম্মাহর ঐক্যে ফাটল ধরায়—বিভেদ-প্রাচীর দাঁড় করায়—এর বিরুদ্ধেও শায়খের অবস্থান বড়ো দৃঢ় ছিলো। তিনি তাঁর লেখনি ও বক্তৃতায় এ ব্যাপারে সুস্পষ্ট অবস্থান ব্যাখ্যা করে বলেছেন: মুসলিম উম্মাহ— জাতীয়তাবাদ-বর্ণবাদ-গোত্রবাদ থেকে চিরপবিত্র। মুসলিম উম্মাহ— এক জাতি, এক সম্প্রদায়। জাতীয়তাবাদের নামে.. গোত্রপ্রীতির নামে.. কিংবা বর্ণবাদের নামে তাদের ভিতরে কোনো বিভাজন রেখা টানা যাবে না।

এ জন্যেই তিনি শক্ত অবস্থান নিয়েছিলেন কট্টরপন্থী আরব জাতীয়তাবাদের বিরুদ্ধে। অনেকে নবুয়তে মুহাম্মদী'র মুকাবিলায় একে

আরেক নয়া নবুয়ত বলেও আখ্যা দিয়েছিলেন। আমরা দেখতে পাই যে, শায়খ নদভী'র এই ইসলাহী মেহনত ও সংস্কার-কর্ম দেশ-জাতি-বর্ণ-ভাষা নির্বিশেষে সমগ্র মুসলিম উম্মাহকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়েছে। তাঁর বিভিন্ন লেখা ও বক্তৃতায় এ বিষয়টি ফুটে উঠেছে। তাঁর কয়েকটি লেখার শিরোনাম লক্ষ্য করুন— مسئولية الأمة الإسلامية (মুসলিম উম্মাহর দায়িত্ব), قيمة الأمة الإسلامية ورسالتها (মুসলিম উম্মাহর গুরুত্ব এবং তাদের পয়গাম), المسلمون على مفرق الطــرق (সঙ্কটের ঘূর্ণাবর্তে মুসলমানরা)। এ-সব লেখা শায়খ নদভীর অনেক আগের সম্বোধন, যখন তিনি টগবগে তরুণ। إلى ممثلي البلاد الإســلامية (মুসলিম জাহানের প্রতিনিধিদের সমীপে)ও সে সময়কারই সম্বোধন।

তবে শায়খ নদভী মনে করতেন যে, বিশ্ব মুসলিম উম্মাহর মধ্যে এ ক্ষেত্রে আরব মুসলমানদের দায়-দায়িত্ব সবচে' বেশি। কেননা, তারা ইসলামের সূতিকাগারের মানুষ। আল্লাহ্র রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পরিবারের সম্মানিত সদস্য। তাদের ভাষায়ই নাযিল হয়েছে পবিত্র কুরআন। তাদের ভূ-খণ্ড থেকেই ইসলামের আলো ছড়িয়েছে সারা বিশ্বে। মসজিদে হারাম, মসজিদে নববী ও মসজিদে আকসা তো তাদের ভূ-খণ্ডেই অবস্থিত! যেখানে দলে দলে ছুটে যাওয়া পুণ্যের কাজ! প্রথম সারির সাহাবায়ে কেরাম তো এ-মহান আরবদেরই সারজমিনে বেড়ে-ওঠা কীর্তিপুরুষ! যাঁরা ইসলামের পয়গাম নিয়ে ছড়িয়ে পড়েছিলেন বিশ্বের দিকে দিকে! মানুষকে মানুষের 'ইবাদত' থেকে মুক্ত করে মানুষের রব-এর ইবাদতের দিকে ডাকতে!

আমরা অনেক দিন থেকেই লক্ষ্য করে এসেছি যে, শায়খ নদভী রহ. যে সমস্ত পুস্তিকা লিখেছেন, তা অলংকারপূর্ণ, সাহিত্যের সৌরভে সুরভিত, ঈমানী চেতনায় উজ্জীবিত। তা যেনো আরব ও মুসলিম বিশ্বের মাঝে এক অপূর্ব সংলাপ। কিছু কিছু পুস্তিকায় তা এতোই শিল্পিত রূপ লাভ করেছে যে, তা হৃদয় ছুঁয়ে যায়। বিবেকের পর্দায় দোল ওঠায়। অনুভবের গতিপ্রবাহে সঞ্চারিত হয় নতুন গতি। বড়ো আবেগভরে তিনি আরবদেরকে সম্বোধন করেছেন এ-সব পুস্তিকায়। তুলে ধরেছেন আরবদেরকে ঘিরে তাঁর মনের একান্ত কথা। শিরোনাম আমি আগেও উল্লেখ করেছি, আবার লক্ষ্য করুন—

إسمعي يا مصرُ! (শোনো হে মিশর!),

إسمعي يا سورية! (শোনো হে সিরিয়া!),

إسمعي يا زهرة الصحراء! (শোনো হে মরুফুল!),

إسمعي يا إيران! (শোনো হে ইরান!)।

সবই স্বচ্ছ ও উচ্ছল সাহিত্যের মুক্তোময় ফোঁটা ফোঁটা বিন্দু!!

কিন্তু শিরোনামে নিবেদিত দেশগুলিই শুধু তাঁর আবেগের সাথে কথা বলে নি, সব দেশকেই তিনি সম্বোধন করেছেন। লিখেছেনঃ اسمعوها مني صريحة أيها العرب (আরব বন্ধুরা! আমার কাছ থেকে স্পষ্ট ভাষায় শুনে রাখো!) শেষোক্ত পুস্তিকাতেই তিনি বলেছেন তাঁর এই অমর পঙতিমালা—

'আমি যদি সমস্ত আরব বন্ধুকে একসঙ্গে পেতাম এবং তাদেরকে লক্ষ্য করে কিছু বলার সুযোগ পেতাম এবং তারাও আমার কথা হৃদয়ের কান দিয়ে শুনতেন, তাহলে আমি বলতাম : বন্ধুগণ! রাসূলে আরাবী'র প্রচার করা ইসলাম ধর্মই আপনাদের জীবনের উৎস। ইসলামের রক্তরাগ-দিগন্ত থেকেই উদিত হয়েছে আপনাদের সুবহি সাদিকের সূর্য। রাসূলে আরবীই হলেন আপনাদের মর্যাদার উৎস এবং খ্যাতির কারণ। আপনাদের তাবৎ মঙ্গল ও কল্যাণের বরং পৃথিবীর তাবৎ মঙ্গল ও কল্যাণের ঠিকানা ও আধার শুধু তিনিই। তাঁর সাথে সম্পর্ক না- রাখলে .. তাঁর আদর্শের রশি মজবুত করে না- ধরলে .. তাঁর পয়গামের প্রতি হৃদয়-মন সমর্পণ করে ধাবিত না- হলে এবং তাঁর আদর্শের পথে জীবন বিলিয়ে দেবার প্রতিজ্ঞা না- করলে বিশ্বাস করুন, আল্লাহ আপনাদের সম্মান ও মর্যাদা এবং মঙ্গল ও কল্যাণের সকল প্রাপ্তি ছিনিয়ে নেবেন। নেবেনই। এটা আল্লাহ্‌র ফায়সালা। আল্লাহ্‌র ফায়সালা রোধ করার সাধ্য কারো নেই।

আরব বিশ্বের এই পানিবিহীন বিশাল সমুদ্রের নেতা, ইমাম ও সিপাহসালার বানিয়েছেন আল্লাহ মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে। এখন আরব দুনিয়ার দায়িত্ব— ইসলামের পয়গাম নিয়ে দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়া। আরব দুনিয়াকেই এখন নেতৃত্ব দিতে হবে মুসলিম উম্মাহর। শপথ নিতে হবে ইউরোপের হিংস্রতা ও নিপীড়ন থেকে বিশ্বকে উদ্ধার করার। এ-ইউরোপীয়রা সভ্যতার কবর রচনা করতে চায়। মানবতাকে গলা টিপে হত্যা করতে চায়। দম্ভ, অহংকার ও অজ্ঞতা দিয়ে।

সুতরাং অবিলম্বে আরব দুনিয়াকে এগিয়ে আসতে হবে। বিশ্বকে উদ্ধার করতে হবে অবনতি ও অধঃগতি থেকে। বলে দিতে হবে ঠিকানা অগ্রগতি ও সমৃদ্ধির। উদ্ধার করতে হবে ধ্বংস ও বরবাদি এবং অরাজকতা ও অস্থিরতা থেকে। পথ দেখাতে হবে প্রগতি ও প্রশান্তির। স্বস্তি ও শান্তির। শৃঙ্খলা ও ঐক্যের। উদ্ধার করতে হবে কুফরী ও সীমালংঘন থেকে। ধন্য করতে হবে ঈমানের দৌলত লাভে। এটা আরব দুনিয়ার দায়িত্ব। মহা দায়িত্ব। এ-দায়িত্ব এড়ানোর কোনো পথ নেই। এ দায়িত্ব বিস্মৃত হওয়ারও কোনো অবকাশ নেই। অবশ্যই এ-দায়িত্ব সম্পর্কে আল্লাহ্ কেয়ামতের দিন আরবদেরকে জিজ্ঞাসা করবেন। তখন কী জবাব হবে— যদি এ দায়িত্ব পালনে গাফিলতি প্রদর্শন করা হয়?'

দল গঠনের মাধ্যমে পরিবর্তন সাধন ঃ শায়খ নদভী'র দৃষ্টিভঙ্গি

কোনো দল গঠনের মধ্য দিয়ে, অথবা কোনো সুসংগঠিত ইসলামী সংস্থা প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে সমাজ সংস্কারের ব্যাপারে শায়খ নদভী রহ. এর মত ও দৃষ্টিভঙ্গি কী ছিলো? যে দল বা সংস্থা সম্মিলিত প্রয়াস নিয়ে অগ্রসর হবে এবং সমাজের চিন্তাধারা ও রাজনীতি এবং শিক্ষা ও সভ্যতা-সংস্কৃতি পরিবর্তনের জন্যে ব্যাপক প্রস্তুতি গ্রহণ করবে? কী ছিলো এ ব্যাপারে শায়খ নদভী রহ. এর অবস্থান? .. এ প্রশ্নের উত্তরে বলতে চাই— এ ব্যাপারে শায়খ নদভীর নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি ও অবস্থান ছিলো।

মাওলানা মওদূদী সাহেব 'জামায়াতে ইসলামী' নামে ভারত উপমহাদেশে যে দলটি গঠন করেছিলেন, সে সময় দলটি যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করেছিলো। দেশ বিভাগের পরও হিন্দুস্তান, পাকিস্তান ও বাংলাদেশে এবং পাশ্চাত্যের কিছু কিছু দেশে এ-দলটির প্রভাব ছিলো লক্ষণীয়।

অনুরূপভাবে শহীদ হাসানুল বান্না মিসরের বুকে 'ইখওয়ানুল মুসলিমীন' নামে যে দলটি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, তার ঢেউ-ও মিসরের 'সমুদ্র' পেরিয়ে অন্যান্য আরব ও মুসলিম দেশে আছড়ে পড়েছিলো। বর্তমানে ধারণা করা হয় যে সত্তরের চাইতেও অধিক দেশে এই দলটি সক্রিয় রয়েছে।

আমাদের বলার উদ্দেশ্য হলো— শায়খ নদভী এ-ধরনের দল গঠনের বিপক্ষে ছিলেন না। কিছুদিন তিনি জামায়াতে ইসলামী'র পক্ষে কাজও

করেছেন। তাঁকে কাছে পেয়ে মাওলানা মওদূদী সাহেবও বেশ খুশি হয়েছিলেন। কিন্তু কিছুদিনের ভিতরেই তাঁকে এ-দলটির সাথে বিভিন্ন কারণে সম্পর্ক ছিন্ন করতে হয়। এ বিষয়ে আমরা অন্যত্র বিস্তারিত আলোচনার আশা রাখি।

অনুরূপভাবে শায়খ নদভী ইখওয়ানুল মুসলিমীন-এর কর্মসূচী ও লক্ষ্য-উদ্দেশ্যেরও উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছেন। দলটির প্রতিষ্ঠাতা শায়খ হাসানুল বান্না রহ. সম্পর্কে লিখেছেন তিনি নিজের অভিব্যক্তি— বড়ো আবেগঘন ভাষায়। ইখওয়ানুল মুসলিমীন-এর শীর্ষ সারির নেতৃবৃন্দের সাথে তিনি গভীরভাবে মিশেছেন এবং তাদেরকে প্রয়োজনীয় উপদেশ দানে ধন্যও করেছেন।

আর 'তাবলীগ জামাত'-এর সাথে তাঁর সম্পর্ক ছিলো অনেক গভীর। এ-জামাতের একজন গুরুত্বপূর্ণ সদস্য হিসাবেও তিনি স্বীকৃত। এর প্রতিষ্ঠাতা হযরত মাওলানা ইলিয়াস রহ. তাঁকে বড়ো স্নেহ করতেন। তাঁর সাথে তিনি দিনের পর দিন, মাসের পর মাস কাটিয়েছেন তাবলীগের সফরে। মাওলানা ইলিয়াস রহ. এবং তাঁর দাওয়াত ও তাবলীগ নিয়ে শায়খ নদভী গুরুত্বপূর্ণ কিতাবও লিখেছেন।

উপরের আলোচনা থেকে প্রমাণিত হলো যে, শায়খ নদভী একটি ইসলামী দল হিসাবে জামায়াতে ইসলামী'র বিরোধিতা করেন নি। তবে দলটির কোনো কোনো মৌলিক নীতি-আদর্শের প্রশ্নে তিনি আপোষ করতে না-পেরে দলীয় সম্পর্ক ছিন্ন করে দূরে সরে এসেছিলেন। এ বিষয়েও আমরা পরবর্তীতে আলোচনা করবো।

অনুরূপভাবে তিনি ইখওয়ানুল মুসলিমীন-এরও বিরোধিতা করেন নি। বরং ১৯৫১ সালে যখন তিনি মিসর সফর করেন, তখন দলটিকে সম্বোধন করেছেন বক্তৃতার ভাষায় এই শিরোনামে— أريد أن اتحدث إلى الإخوان (ইখওয়ানকে কিছু বলতে চাই)।

যারা শায়খ নদভীর বিভিন্ন গ্রন্থ গভীরভাবে পড়েছেন এবং তাঁর কথা ও বক্তব্য শুনেছেন, তাদের কাছে সুবিদিত যে, শায়খ নদভী রহ. 'জামায়াতে ইসলামী' ও 'ইখওয়ানুল মুসলিমীন'-এর পথ ধরে উম্মতের সংস্কার সাধনকে মোটেই জরুরী কোনো বিষয় মনে করতেন না। তিনি কখনোই বলেন নি (যেমনটা অনেকেই বলেছেন) যে, দাওয়াত ও

ইসলাহের ক্ষেত্রে ('জামায়াতে ইসলামী' ও 'ইখওয়ানুল মুসলিমীন'-এর মতো) কোনো দল গঠন আবশ্যকীয় ও জরুরী। দীনি কর্তব্য ও সামাজিক প্রয়োজন।

শায়খের দৃষ্টিতে ইসলাহ ও সংস্কারের শ্রেষ্ঠ পথ ও পন্থা

এ ক্ষেত্রে বরং শায়খ নদভী'র অবস্থান বড়ো স্পষ্ট। তিনি মনে করেন যে, ইসলাহ ও সংস্কার সাধনের জন্যে এবং উম্মতের ভিতরে তা সঠিকভাবে কার্যকর করার জন্যে একটি শ্রেষ্ঠ পথ ও পন্থা রয়েছে। এ-পথ— ও-পথের চাইতে অধিক নিকটবর্তী ও সহজ। কেননা ও-পথের শুরুতে যেমন রয়েছে রক্ত ঝরানো কাঁটা, শেষেও তার অসংখ্য কাঁটাবন। কাঁটাবন-এড়ানো এ-পথের কথাই বিশদভাবে তিনি তুলে ধরেছেন তাঁর এ কিতাবে— منهج أفضل للإصلاح والتجديد (ইসলাহ ও সংস্কারের সর্বোত্তম পন্থা)। এ-কিতাবের এক জায়গায় তিনি লিখেছেন—

'হিন্দুস্তানের ইতিহাসে সবচে' প্রতাপশালী বাদশা ছিলেন মোগল সম্রাট জালালুদ্দীন আকবর। তিনি ছিলেন সম্রাট হুমায়ূনের ছেলে। আর হুমায়ূন ছিলেন মোগল সাম্রাজ্যের স্থপতি সম্রাট বাবরের ছেলে। সম্রাট আকবর ইসলাম-বিরোধী-প্রবণতায় আক্রান্ত হয়েছিলেন। এ-প্রবণতা সীমালংঘন করেছিলো। ইসলাম ও ইসলামের নবীর বিরুদ্ধে বিদ্বেষপূর্ণ ছিলো তার মন। অপরদিকে ব্রাহ্মণ সম্প্রদায় ও তাদের আচার-অনুষ্ঠান ছিলো তার ভীষণ পছন্দ।

জাহিলী যুগের চাইতেও এ এক নাজুক পরিস্থিতি, মহা সঙ্কটকাল। এমন দেশ যদি হতো, ইসলামের সাথে যার কোনো সম্পর্ক নেই, তাহলে বিষয়টি মোটেই জটিল ছিলো না। কিন্তু ইসলামকে কেন্দ্র করেই যদি হয় তার পরিচয় ও আবর্তন, তাহলে অবশ্যই সে-ইসলামকে হতে হবে খাঁটি ও নির্ভেজাল। কিন্তু ইসলাম নিয়ে গর্ব-করা-দেশের রাজা-বাদশারাই যদি হঠাৎ ইসলামের বিরুদ্ধে ফুঁসে উঠেন এবং সত্যের পথ থেকে দূরে সরে যান—মুরতাদ হয়ে যান, অথবা ইসলামের বিরোধিতায় কোমর বেঁধে মাঠে নেমে আসেন তাহলেই সমস্যা। কঠিন ও জটিল সমস্যা।

সম্রাট আকবর প্রথম দিকে ধর্মের প্রতি দারুণ আসক্ত ছিলেন। তার দুর্ভাগ্যই বলতে হবে যে, তিনি নিরক্ষর বা প্রায় নিরক্ষর ছিলেন। পড়ালেখা

ও সভ্যতার সুন্দর আবহে বেড়ে ওঠার কোনো সুযোগই তার জীবনধারায় সৃষ্টি হয় নি। এতদ্বসত্ত্বেও বিভিন্ন ধর্মের ব্যাপারে তিনি ছিলেন বেশ কৌতূহলী। সব সময় যে চিন্তাটা তাকে ভাবাতো, তা হলো, কোন্ ধর্ম ভালো? এ-ধর্ম না সে-ধর্ম? মানুষ যখন অজ্ঞ ও নিরক্ষর হয়, যখন তার মধ্যে না থাকে ভালো-মন্দ 'তুলনা-জ্ঞান' এবং সঠিক সিদ্ধান্ত ও পরিণতিতে উপনীত হওয়ার যোগ্যতা, তাহলে এ বড়ো ভয়ঙ্কর, বড়ো বিপজ্জনক! দুই বিপরীতমুখী স্বভাবের এ-লোকটিও ছিলেন মূর্খ। কিন্তু ভীষণ প্রতিভাবান। আবেগে-উচ্ছ্বাসে মুহূর্তেই উথাল-পাতাল হয়ে যেতেন। মেতে উঠতেন বিভিন্ন ধর্ম নিয়ে 'গবেষণা'য়। ধর্মের ভিতরে এ-সব তুলনায় আলোচনায় পর্যালোচনায় আপ্লুত হতেন তিনি। হ্যাঁ .. এ উদ্দেশ্যেই তিনি রাজ দরবারে জড়ো করতেন বিভিন্ন ফেরকার, বিভিন্ন ধর্মের এবং বিভিন্ন মতাদর্শের আলেম ও পণ্ডিতদেরকে। কেউ সুন্নী, কেউ শিয়া, কেউ ব্রাহ্মণ, কেউ বৌদ্ধ, কেউ খৃষ্টান, কেউ অগ্নীপূজক। সবাই এসে জড়ো হতো নিজের মতের ও নিজের ধর্মের পতাকাটা আকাশে ধরে। প্রতিপক্ষকে কোণঠাসা করার মানস-তাড়িত দৃষ্টিগুলি কেবল তাকাতো একে অপরের দিকে। ঠিক এমন অবস্থায়ই দৃশ্যপটে অবতীর্ণ হতেন সম্রাট আকবর। সবার ভিতরে উস্কে দিতেন কোনো বিতর্কিত বিষয়। মতবিরোধপূর্ণ বিষয়। তখন শুরু হয়ে যেতো পক্ষে বিপক্ষে তুমুল আলোচনা ও বিতর্ক। যুক্তি প্রদর্শন ও যুক্তি খণ্ডন। দেখতে দেখতেই পক্ষ বিপক্ষ উত্তপ্ত হয়ে উঠতো। যেনো মোরগে মোরগে 'ঠোকর-লড়াই'। ছাগলে ছাগলে 'গুতো-যুদ্ধ'। সম্রাট অদূরে বসে এ-সব দেখতেন, শুনতেন আর মজা লুটতেন— মোরগ ও ছাগলের লড়াই দেখে প্রাচীন কালের রাজা-বাদশারা যেমন মজা লুটতেন। হাঁ ধর্ম নিয়ে এ-সব শাখা-ছড়ানো অহেতুক বিতর্ক আকবরের মনে প্রভাব ফেললো। সংশয়-সন্দেহ ও দ্বিধা-দ্বন্দ্বের বিষবৃক্ষ রোপন করলো। ফলে তিনি ক্রমে ক্রমে ইসলাম থেকে দূরে সরে পড়লেন।

ইসলাম থেকে দূরে সরে পড়ার এ ছিলো প্রথম কারণ। দ্বিতীয় কারণটি হলো— আলেমদের অতিরিক্ত দুনিয়াপ্রীতি—সম্পদ ও ক্ষমতা লিপ্সা। পদ ও পদবীর জন্যে.. মাল ও মর্যাদার জন্যে তারা উৎকট প্রতিযোগিতায় মেতে উঠেছিলো। আকবরের দরবারের সাথে সংশ্লিষ্ট আলেমদেরকে সে সময়ের শীর্ষস্থানীয় আলেম হিসাবেই গণ্য করা হতো। অথচ দুঃখজনক হলো, এই এরাই সম্পদ ও ক্ষমতার জন্যে ছিলেন

লোভাতুরে। উম্মত্ত প্রতিযোগিয়ে।[১] প্রত্যেকেই চাইতেন সম্রাটকে নিজের বলয়ে আবদ্ধ করে রাখতে। একান্ত ও নিবিড় ঘনিষ্ঠতায় কাছে পেতে। এদের কেউ কেউ এ-ভাবে গড়ে তুলেছিলেন বিপুল ঐশ্বর্য ভাণ্ডার। আর কেউ কেউ তো পূর্ব পুরুষের সমাধীস্থল থেকে স্বর্ণের ইট পর্যন্ত খোলে-খোলে নিয়ে সঞ্চয়-ভাণ্ডারে জমা করেছিলো। সম্পদ হাতানোর কী এক উৎকট প্রতিযোগিতায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিলো তাদের বিবেকবোধ। অজ্ঞ সম্রাট শীর্ষস্থানীয় আলেমদের এই বল্গাহারা ধর্ম-বিতর্ক এবং সম্পদ-লিপ্সা থেকে জেনে ফেললেন তাদের সকল দুর্বলতা। অথচ তাদের ভিতরে ছিলেন সবচে' বড় মুহাদ্দিস, বিচারক ও মুফতি। কিন্তু সম্রাটের সামনে এই 'মহান পরিচয়' ছাপিয়ে ফুটে উঠলো সেই কালো পরিচয় : 'হায়! এরা যে দুনিয়া-লোভী! এরা যে দুনিয়ার-চোর!' নইলে দুনিয়ার ধন-সম্পদ ও প্রভাব-প্রতিপত্তির জন্যে কেনো এই নগ্ন কাড়াকাড়ি?...

এ ভাবেই ইসলামের ধারক বাহকদের এ-সব দুনিয়ামুখী আচরণে অজ্ঞ সম্রাটের অস্থির মনটা ইসলামের বিরুদ্ধেই বিদ্রোহী হয়ে উঠলো। বিদ্বেষ-বিতৃষ্ণায় ভরে গেলো। আর এ ভাবেই তিনি ইসলাম থেকে ছিটকে পড়লেন দূরে .. বহু দূরে, অনেকটা তাদেরই কারণে, যারা তাকে ইসলামের কাছে টানতে পারতেন।

প্রিয় পাঠক! নিজের সঞ্চিত অভিজ্ঞতা থেকে আপনাকে বলতে চাই— ইসলামের ভিতর থেকে— যে ইসলামের বাইরে চলে যায়, সে ইসলামের সবচে' বড় দুশমনে পরিণত হয়। ইসলামের গন্ডির বাইরের মানুষের চাইতে এবং ইসলামের সাথে সম্পর্কহীন মানুষের চাইতেও সে বহুগুণ ভয়ঙ্কর রূপে আবির্ভূত হয়। এমন কি অন্যান্য যে কোনো ধর্মের অনুসারীদের —ইহুদী হোক বা খৃষ্টান— চাইতেও বেশি বিদ্বেষী হয়। যেমনটা বর্তমানে আপনারা প্রত্যক্ষ করছেন কিছু কিছু আরব ও মুসলিম দেশে। এ-সব দেশের শাসকরা মুসলিম পরিচয়ে জন্ম গ্রহণ করেছে ঠিকই, মুসলিম পরিবারেও বেড়ে উঠেছে, মুসলিম দেশের পরিবেশ-প্রতিবেশেও বড় হয়েছে, কিন্তু ভিতর তাদের আঁধারঘেরা। অভ্যন্তর তাদের বিদ্বেষভরা। ইসলামকে তারা প্রচণ্ড ঘৃণা করে। বহিরাগত প্রভাব কিংবা সংস্কৃতি ও দর্শনের কারণে। তাই নির্দ্বিধায় বলা যায়— এ-সব মুসলিম নামধারী শাসক– হিন্দু, অগ্নিপূজারী ও

---

১. প্রতিযোগিতা-লিপ্ত

ইহুদী-নাসারাদের চাইতেও ইসলামের জন্যে বেশি ক্ষতিকর ও ভয়ঙ্কর। কেননা তাদের চাইতেও এরা ইসলামের বিরুদ্ধে বেশি বিদ্বেষ পোষণ করে।

মূল কথায় ফিরে আসি। সুতরাং সম্রাট আকবরও ইসলামের ভয়ঙ্কর দুশমনরূপে আবির্ভূত হলেন। ইসলাম-বিদ্বেষের আগুনে জ্বলতে-জ্বলতে তিনি এমন সব কাজ করে বসলেন, যা আজো মুসলিম-হৃদয়ে রক্ত ঝরিয়ে চলেছে। ইতিহাসে এও পাওয়া যায় যে, তিনি 'মুহাম্মদ' (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এই নামটিই বরদাশত করতে পারতেন না। এ-নাম কানে আসার সাথে সাথে তিনি ভীষণ উত্তেজিত হয়ে পড়তেন। ক্ষোভ ও ঘৃণায় ফুঁসতে থাকতেন। তিনি রাজ্যে এ-মর্মে নির্দেশ জারি করেছিলেন যে, যে ব্যক্তি গরু জবাই করবে, তাকে হত্যা করা হবে। অথচ অপরদিকে তিনি শূকরের 'গোশত' খাওয়াকে 'হালাল' করে দিয়েছিলেন। দরবারের সবাইকে তিনি কড়া ভাষায় নিষেধ করে দিয়েছিলেন যে, কেউ যেনো তার সন্তানের নাম 'মুহাম্মদ' না-রাখে।

কী নাজুক অবস্থা!

কী সঙ্কটকাল!

বদলে যাবে কি হিন্দুস্তানের ভাগ্য?

কোন্ সে করুণ পরিণতি অপেক্ষা করছে—

'রক্তঋণ'-এ আযাদ করা এ-হিন্দুস্তানের?

যে-দেশের জন্যে তারা এককালের মাতৃভূমিকেও ত্যাগ করে এসেছে?

যে-দেশে ইসলামের শ্যামল ছায়ায় .. বিমল হাওয়ায়—

প্রজন্মের পর প্রজন্ম বসবাস করেছে?

সে-দেশের মুসলমানরা কি এখন ধর্মহারা হয়ে যাবে?

ইসলাম কি সত্যি এ-দেশে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করবে?!

হারিয়ে যাবে কি ইসলাম- হিন্দুস্তানের মানচিত্র থেকে? ....

হ্যাঁ .. এ-সব উদ্বেগমাখা প্রশ্ন যখন হিন্দুস্তানের মর্দে মু'মিনদের হৃদয়ে রক্তক্ষরণ ঘটাচ্ছিলো ঠিক তখনই উদয়ন হলো এক সূর্য-পুরুষের। তিনি আর কেউ নন —মুজাদ্দিদে আলফে সানী খ্যাত— শায়খ আহমদ ইবনে আবদুল আহাদ আল-আমরী আল-সারহান্দি রহ.। তিনি শীর্ষস্থানীয় আলেম। বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী। তিনি চাইলেই সম্রাট আকবরের দরবারের শীর্ষ আসনটিতে অনায়াসে আসীন হতে পারতেন। কেননা রাজ

দরবারে ইলমে যোগ্যতায় তাঁরচে' বড় আলেম আর কেউ ছিলেন না। তিনি সবার শ্রদ্ধার্হ, প্রশংসার্হ। কিন্তু তিনি সে দিকে গেলেন না, যেতে চাইলেন না। রাজদরবারের আসন অলংকৃত করা— তাঁর কাছে কোনো প্রাপ্তিই ছিলো না। তিনি অস্থির ও উদ্বিগ্ন আরো বড় চিন্তায়। হিন্দুস্তানের ভাগ্যে-চিন্তায়। মুসলমানদের ভবিষ্যত-চিন্তায়। তাঁর মনের আকাশে স্পষ্ট ফুটে উঠেছে প্রলয়ঙ্করী ঝড়ের পূর্বাভাস। এখন এ-ঝড়ের কবল থেকে দেশকে.. দেশের মুসলমানদেরকে বাঁচানোর চিন্তায় তিনি অস্থির বেলা কাটাচ্ছেন। তাঁর বিবেকসত্ত্বা বারবার ফুঁসে উঠছে একরাশ প্রশ্ন নিয়ে—

অসম্ভব! এ-দেশ ইসলামকে ত্যাগ করতে পারে না!

এ-দেশ মুসলমানদের!

এখানে মুসলমানরা অবশ্যই থাকবে—

তাদের স্বকীয়তা ও ধর্মীয় বৈশিষ্ট্য নিয়ে!

ধর্মীয় অধিকার থেকে কোনোভাবেই তারা বঞ্চিত হতে পারে না!

মুসলমানদের এ-দেশে ইসলামের বিধি-বিধান ..

হুকুম-আহকাম পালনে বাধা আসবে, প্রতিবন্ধকতা আসবে—

এ হতেই পারে না, অকল্পনীয়!

তিনি আর বসে থাকতে পারলেন না। আল্লাহ্‌র নাম নিয়ে নেমে গেলেন ময়দানে। ইসলামের মহিমা উদ্ধারে ওয়াক্‌ফ করলেন নিজের ধ্যান-জ্ঞান-সাধনা—সবকিছু।

আমার প্রিয় পাঠক!

যখনই আপনি পড়বেন তাঁর রচনাবলী, দেখবেন ইসলাম ও মুসলমানদের জন্যে কতো ছিলো তাঁর দয়া ও দরদ! কতো ছিলো তাঁর জ্বলন ও অশ্রুবর্ষণ! পড়তে পড়তে মনে হবে— ইসলামের জন্যে .. মুসলমানদের জন্যে এতোটাই কেঁদেছেন তিনি! এমন করে বুক ভাসিয়েছেন!

সত্যি; তাঁর রচনাবলী তখন মৃতপুরীতে বইয়ে দিয়েছিলো জীবনের হাওয়া। আঁধারপুরীতে জ্বেলে দিয়েছিলো আলোর শত-শত মশাল। তাঁর সে সময়কার প্রতিটি চিঠি ও রচনা যেনো ঈমানী চেতনার আগুনে ছিলো ঠাসা। সাম্রাজ্যের এক নেতৃস্থানীয় ব্যক্তির কাছে লেখা এক পত্রের ভাষা একটু লক্ষ্য করুন—

واويلاه واحزناه وامصيبته إن أتباع محمد عليه الصلاة والسلام الذي هــو رب العالمين بهذا الذل والهوان، والكفار والمشركون والوثنيون يتنعمون بالحرية، وهــذا في عهد رجل يتسمى بالإسلام.

'হায়! আফসোসের যে কোনো সীমা নেই!
দুঃখের যে কোনো শেষ নেই!
বিপদের যে কোনো অন্ত নেই!

রাব্বুল আলামীনের প্রিয় বন্ধু মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অনুসারীদের আজ এই অপমান ও লাঞ্ছনা? অথচ কাফের-মুশরিক-পৌত্তলিকেরা আছে— কী সুখে ও ভোগে! তাও আবার এমন এক 'লোকের' শাসনকালে, নামটা যার মুসলমানের!'

রাজ দরবার ও প্রশাসনকেন্দ্র থেকে তিনি দূরে অবস্থান করলেও রাজ দরবারের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গের সাথে তাঁর গভীর পত্র-যোগাযোগ অব্যাহত থাকলো। তাদের কাছে পাঠাতে লাগলেন তিনি একের পর এক চিঠি। বড়ো আবেগঘন ভাষায়। বড়ো হৃদয়ছোঁয়া উপস্থাপনায়। বড়ো জ্বালাময়ী ধারায়। এ-পত্রাবলী প্রশাসনের সর্বোচ্চ স্তরের অনেকের 'ঈমানী গায়রত' এর নিস্তরঙ্গ সমুদ্রে ঢেউ তুললো। তাদের ঘুমন্ত ও শীতল চেতনায় ঈমানের আগুন জ্বালিয়ে দিলো। যে আগুন এতোদিন ছিলো ছাইচাপা। তিনি শুধু ছাইটুকু সরিয়ে দিলেন।

তাঁর এ-পত্রাবলীকে দাওয়াত ও সংস্কারধর্মী পত্রাবলীর মধ্যে সবচে' শক্তিশালী পত্রাবলী হিসাবে গণ্য করা হয়। একটি পত্রের ভাষ্য ছিলো এমন

أنت مسلم، والحياة عارضة، والملك لايعيش دائما، وهذا الحكم لايدوم، اتق الله في نفسك، اتق الله في الله، اتق اللها الامة بلادك.

'ভুলে যেয়ো না (বন্ধু!)— তুমি একজন মুসলমান! জীবন ক্ষণস্থায়ী— বিলীয়মান ছায়া। রাজত্ব কি চিরকালীন? ক'দিন আছে এ-বাদশাহী? তাই ভয় করো আল্লাহকে— নিজের ব্যাপারে, উম্মতের ব্যাপারে এবং দেশের ব্যাপারে।'

এভাবে এক সময় তাঁর প্রচেষ্টা সফল হতে শুরু করলো। শাসকবর্গ ও মন্ত্রীদের অনেককেই তিনি তাঁর মনের কথা বুঝাতে সক্ষম হলেন। কিন্তু সামনে বাড়তে হচ্ছিলো খুবই সতর্কতার সাথে। পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করে করে। কেননা দেশ তখন এক মহা সঙ্কটকাল অতিক্রম করছিলো। ইসলাম

থেকে দূরে চলে-যাওয়া এ-প্রতাপশালী সম্রাটের প্রকাশ্য-বিরোধিতা সম্ভব ছিলো না। তার প্রকাশ্য-বিরোধিতা করার অর্থ হলো— তাকে আরো বিগড়ে দেয়া। ইসলাম-বিদ্বেষের পথকে তার সামনে আরো প্রশস্ত করে দেয়া। পরিণতিতে তার ক্ষোভ ও রোষে পড়ে মুসলমানদের অবস্থা আরো নাজুক থেকে নাজুকতর হয়ে উঠতো। দেশ তখন অবধারিতভাবেই চলে যেতো হিন্দু পৌত্তলিকদের নিয়ন্ত্রণে। তারাই জেঁকে বসতো প্রশাসনের সর্বত্র। এমন সুযোগের অপেক্ষায়-ই তো ওরা ওঁৎ পেতে বসে আছে! তাই 'মুজাদ্দিদে আলফে সানী' হিকমত ও প্রজ্ঞার সাথে সামনে বাড়তে লাগলেন। হুকুমতের বিরোধিতায় তলোয়ার ব্যবহারের তিনি বিরোধী ছিলেন। এটাই ছিলো সময়ের দাবি। পরিস্থিতির দাবি। রাজনীতির দাবি। হুকুমতকে এখন সঠিক পথে আনতে হবে হিকমত ও প্রজ্ঞার আলো জ্বেলে-জ্বেলে। উদারতার পাপড়ি ছড়িয়ে-ছড়িয়ে। তবেই অক্ষুণ্ন থাকবে মুসলমানদের শক্তি। বলিষ্ঠ হবে অর্থনীতি। সমরশক্তি।

সময়ের ধারায় ইন্তেকাল করলেন সম্রাট আকবর। মসনদে অধিষ্ঠিত হলেন নূরুদ্দীন জাহাঙ্গির। পিতার চেয়ে তিনি ছিলেন ব্যতিক্রম। চরিত্রে-মানসিকতায়-চিন্তায়-চেতনায়-আকিদায়-বিশ্বাসে পিতার সাথে তার কোনো মিল ছিলো না। শায়খ তাকে কাছে টানলেন। দাওয়াত দিলেন। চিঠির পর চিঠি লিখলেন। তার সামনে আলোর দিগন্ত উন্মোচিত করে যেতে লাগলেন। উদ্ভাসিত হতে লাগলো প্রজ্ঞার আলো। প্রমাণিত হতে লাগলো কলমের ধার।

একবার সম্রাট জাহাঙ্গির 'ধর্ম বিষয়ক উপদেষ্টা' হিসাবে কিছু সংখ্যক উলামায়ে কেরামকে নিযুক্ত করার জন্যে মন্ত্রী পরিষদকে নির্দেশ দিলেন। কিন্তু শায়খ জানতে পেরে তার প্রচণ্ড বিরোধিতা করলেন। বললেন : 'না! এর কোনো প্রয়োজন নেই। এ লক্ষ্যে উলামায়ে কেরাম জমা হলে আসল কাজের চেয়ে নিজেদের মতামত প্রতিষ্ঠা ও নৈপুণ্য প্রদর্শনের জন্যে বিবাদ-বিতর্কই বেশি হবে, এতে সম্রাট ভীষণ অস্বস্তিতে পড়বেন। তার মন-মানস বিগড়ে যাবে। যেমনটা পূর্ববর্তী সম্রাটের বেলায় ঘটেছিলো। যা ইসলামের জন্যে বিপর্যয় ডেকে এনেছিলো। সুতরাং উলামায়ে কেরামের কোনো জামাত নয়— এর জন্যে একজন আল্লাহওয়ালা, যোগ্য, প্রাজ্ঞ ও দুনিয়াবিমুখ আলেমকে নির্বাচন করুন, তিনি একাই যথেষ্ট হবেন।'

শেষ পর্যন্ত শায়খের মতই গৃহীত হয়েছিলো। আর এর ফলাফলও বড়ো ইতিবাচক প্রমাণিত হয়েছিলো। ইসলামের সাথে সম্রাট জাহাঙ্গিরের সম্পর্ক ও ভালোবাসা ধীরে ধীরে গভীর থেকে গভীরতর হলো। এমনকি শেষ পর্যন্ত তিনি পিতার ইসলাম বিরোধী সকল রায় ও সিদ্ধান্ত বাতিল বলে ঘোষণা জারি করলেন।

এরপর মসনদে আসীন হলেন সম্রাট জাহাঙ্গিরের ছেলে শাহজাহান। বড়ো আল্লাহভীরু সম্রাট ছিলেন তিনি। মহা মূল্যবান ময়ূর সিংহাসনে আরোহনকালে গর্বে-দম্ভে ফুলে যান নি তিনি, বরং এক আল্লাহওয়ালা আবেদ যাহেদের মতো সেই সিংহাসন থেকে নেমে তিনি লুটিয়ে পড়লেন সেজদায়। এ ভাবেই তিনি ঘোষণা দিলেন নিজের দাসত্ব ও ইসলাম প্রীতির। রাজত্বের মতো মহা সম্মান লাভ করার জন্যে পেশ করলেন তিনি আল্লাহ্র সকাশে অযুত নিযুত কৃতজ্ঞতা। শায়খ (মুজাদ্দিদে আলফে সানী) তার পাশেও এসে দাঁড়ালেন কুশলী দাঈ'র ভূমিকা নিয়ে। সক্ষম হলেন সম্রাটের আস্থা অর্জন করতে। সম্রাটের উপর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতে। তিনি 'হ্যাঁ' বললে সম্রাটও 'হ্যাঁ' বলেন আর তিনি 'না' বললে সম্রাটও 'না' বলেন। নিয়ন্ত্রণের লাগামটাই এখন তাঁর হাতে। ইসলাম ও দেশের সার্থে টান দিতে হলে টান দেন, আবার ঢিল দিতে হলে ঢিল দেন।

শায়খ আহমদ (মুজাদ্দিদে আলফে সানী রহ.) -এর ওফাতের পর তাঁর অসমাপ্ত কাজের দায়িত্ব নিলেন তাঁরই সুযোগ্য সন্তান শায়খ মাসুম ইবনে আহমদ। শাহজাদা আওরঙ্গজেবকে শিক্ষা-দীক্ষায় তিনিই মনের মতো করে গড়ে তোলেন। যাঁকে অন্যতম শ্রেষ্ঠ মুসলিম সম্রাট হিসাবে গণ্য করা হয়। শুধু হিন্দুস্তানের ইতিহাসেই নয় বরং পুরো ইসলামের ইতিহাসে। অর্থাৎ নুরুদ্দীন ও সালাহুদ্দীন আইয়ূবী এবং হাতে গোনা আর কয়েকজন মুসলিম বাদশার পরই তাঁর মাকাম ও অবস্থান। তিনিই সংকলন করেছিলেন কালজয়ী ফতওয়া-গ্রন্থ الفتاوى الهندية বা ফতওয়ায়ে আলমগিরী এবং তাকে হিন্দুস্তানের কানুন ও আইন হিসাবে ঘোষণা দেন। তিনিই ইসলামী নীতিমালা ও বিধি-বিধানকে অতি দক্ষতা ও নৈপুণ্যের সাথে .. অতি যত্নের সাথে সুবিন্যস্ত করেন। তিনি কুরআনের হাফেজও ছিলেন। আল্লাহ্র নবীর চল্লিশটি হাদীস ব্যাখ্যাসহ সংকলন করেন তিনি। এ ছাড়া তিনি নিয়মিত পালন করতেন বিভিন্ন ওযীফা ও আমল, যা পালন করতে সক্ষম হন না উলামায়ে কেরাম, আবেদ-যাহেদরাও। রাজা-বাদশাদের তো প্রশ্নই আসে

না। এই মহান ব্যক্তিটি পরবর্তীতে তাঁর পিতার আসনে বসে হিন্দুস্তানের জীবন-চিত্রই বদলে দেন। ইসলামের ভিত্তিকে আরো দৃঢ় ও মজবুত করেন। ফলে হিন্দুস্তানের বুকে নতুন চেতনায়.. নতুন উদ্দীপনায় মুসলমানরা ইসলামের সাথে, ইলমের সাথে গভীর সম্পর্কে আবদ্ধ হয়। অপসারিত হয় ইসলাম ও মুসলমানদের জন্যে অকল্যাণকর ও বিপজ্জনক সকল কাঁটা ও বাধা। বিদূরিত হয় হিন্দুস্তানের বুক থেকে ইসলামের নির্বাসিত হওয়ার শংকা এবং মুসলমানদের বিতাড়িত হওয়ার ঝুঁকি। যেমনটা ঘটেছিলো দু'শতাব্দীকাল আগে 'মুসলিম স্পেন' বা আন্দালুসে।

এই হলো শায়খ আহমদ রহ. এর জিহাদ ও সংস্কার কর্মের একটি দিক। আরেকটি দিক হলো এই যে, তিনি সকল রকমের বিদআত, বাতিল মতবাদ ও চিন্তাধারা এবং অজ্ঞতাপূর্ণ শিরকী কর্মকাণ্ড এবং গ্রীক দর্শনের বিরুদ্ধে শক্তিশালী অবস্থান গ্রহণ করেন। وحدة الوجود (বিভ্রান্ত সুফীদের একটি পরিভাষা) এর মতো আকিদা বিধ্বংসী চিন্তার বিরুদ্ধেও তিনি যুদ্ধ ঘোষণা করেন, যা তখন মানুষের মন-মানস ও আকিদা-বিশ্বাসকে যাদুর মতো বিস্ময়করভাবে মোহাচ্ছন্ন করে রেখেছিলো। এমনকি জ্ঞান-বিজ্ঞান ও সাহিত্য-সংস্কৃতিকেও গ্রাস করার উপক্রম করেছিলো। وحدة الوجود-এর এই শক্তিশালী শিবিরের বিরুদ্ধে গড়ে তোলেন আরো শক্তিশালী শিবির ও দূর্গ। এ-দূর্গে বসে তিনি আপোষহীনভাবে এর বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়ে যান। এ যুদ্ধের একটা খণ্ডিত চিত্র এমন—

'তাঁর এক ছাত্র তাঁকে চিঠি লিখে জানালেন যে, শায়খ আবদুল করিম আলজিলী আর আলইয়ামানী মনে করেন যে, আল্লাহ শুধু 'কুল্লিয়্যাত' বা সামগ্রিকতা জানেন, 'জুযইয়্যাত' বা আংশিকতা জানেন না।' আর এ বিশ্বাসের মূল হলো 'গ্রীক দর্শন'। তখন শায়খ তাঁর ছাত্রকে জবাব লিখে পাঠালেন এ ভাবে :

يا أخي! إني لا استطيع أن اصبر على سماع هذه الخرافات، وإن عرقي العُمَريَّ ينبض، وإن الدم الفاروقي الذي يجري فيه يفور، كائن قائل هذا عبد الكريم الجيلي اليمني أو الشيخ ابن عربي الطائي، إن الفتوحات المدنية أغنتنا عن الفتوحات المكية، نحن نريد محمد العربي لا الشيخ ابن عربي، إننا من أتباع النصوص لا الفصوص

'আমার প্রিয় ভাই! এ-সব কল্পকাহিনী ও বাজে কথা শোনার ধৈর্য আমার নেই। আমার 'উমরি শিরা' স্পন্দিত হচ্ছে। আমার 'ফারূকী রক্ত' টগবগ করছে। যেই বলুক এ কথা —শায়খ আবদুল করিম আলজিলী আর আলইয়ামানী হোন তিনি কিংবা শায়খ ইবনে আরাবী হোন— আমি পরিস্কার ভাষায় বলতে চাই— 'মাদানী বিজয়ধারা' (অর্থাৎ নববী শিক্ষা ও হাদীস) আর 'মক্কা বিজয়ধারা' (শায়খ ইবনে আরাবী লিখিত একটি কিতাবের দিকে ইশারা করা হচ্ছে) এক নয়। আমাদের মঞ্জিলে মাকসুদ ইবনে আরাবী নন– মুহাম্মদে আরাবী। আমরা 'ফুসূস' (ইবনে আরাবী'র লিখা فصوص الحكم -এর দিকে ইঙ্গিত করা হচ্ছে) নয়— নুসূস (কুরআন-সুন্নাহর) অনুসারী।'

শায়খ আহমদ রহ. এর সংস্কার আন্দোলন ও রেনেঁসার এই হলো অ-নেক দৃষ্টান্তের একটি দৃষ্টান্ত। এ ভাবেই তিনি হিন্দুস্তানের বুকে ইসলামের কেন্দ্রকে পুনরুদ্ধার করে দৃঢ়তা দান করলেন। হৃদয়ে-হৃদয়ে সৃষ্টি হলো কুরআন-সুন্নাহর প্রতি সম্মান, ভালোবাসা ও আস্থা। ইসলামের বরাতগ্রন্থের প্রতি বিশ্বাস ও আস্থা।

এই দীর্ঘ উদ্ধৃতি থেকে প্রতীয়মান হচ্ছে— ইসলাহ ও সংস্কার-সংশোধনের ব্যাপারে শায়খ নদভী রহ. এর কাছে গ্রহণযোগ্য ও মনোনীত কর্মপন্থা বা দিক দর্শন তা-ই, যা তিনি পেশ করেছেন যুগের আলেম-উলামা ও দাঈগণের উদ্দেশ্যে, সে অনুযায়ী তারা যেনো বর্তমানে বিগড়ে-যাওয়া পরিস্থিতি সংশোধনকল্পে সামনে পথ চলার কর্মপন্থা গ্রহণ করতে পারেন এবং ইসলামী জীবনধারায় সঠিক প্রবহমানতা ফিরিয়ে আনতে পারেন।

শায়খ নদভী রহ.এর এই সংস্কার পদ্ধতির মূল কথা হলো— উম্মতের ইসলাহ ও সংশোধনের জন্যে প্রথমে জোর দিতে হবে প্রশাসনের শীর্ষস্থানে অধিষ্ঠিত— রাজা-বাদশা ও আমির-উমারার ইসলাহ ও সংশোধনের উপর। কেননা, জনগণ রাজা-বাদশাদের অনুগামী ও অধীন হয়ে থাকে। রাজা-বাদশারা সৎ হলে প্রজাকুলও সৎ হয়ে যায় আর রাজা-বাদশারা নষ্ট হয়ে গেলে প্রজারাও নষ্ট হয়ে যায়। আল্লাহ্র নবী বলেছেন :

إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة

'আমানতদারী যখন নষ্ট হয়ে যাবে তখন কেয়ামতের অপেক্ষা করো।'[১]

আল্লাহর রাসূল এরপর এ কথার ব্যাখ্যায় বলেন:

إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة

'যখন অযোগ্য লোকের কাছে শাসন ক্ষমতা অর্পিত হবে, তখন কেয়ামতের অপেক্ষা করো।'

এই হাদীস থেকে পরিস্কার ফুটে উঠে যে, উম্মতের সংশোধন ও শুদ্ধতা রাজা-বাদশা ও শাসকবর্গের সংশোধন ও শুদ্ধতার উপরই নির্ভর করছে। এ জন্যেই হযরত হাসান বসরী রহ. বলেছেন:

لَوْكَانَتْ لِيْ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ لَدَعَوْتُـهَا لِلسُّلْطَانِ، بِأَنَّ اللهَ تَعَالى يُصْلِحُ بِصَلَاحِهِ خَلْقًا كَثِيْرًا.

'আমার কোনো দু'আ যদি আল্লাহ্র কাছে গৃহীত হতো, তাহলে আমি সে দু'আটি করতাম সুলতানের জন্যে। কেননা, আল্লাহ সুলতানের সততার বরকতে অনেক মানুষকেই সৎ বানিয়ে দেন।'

* * *

তবে এখানে একটু বলে রাখি যে, শায়খ আবুল হাসান আলী নদভী রহ. এর সংস্কারচিন্তা বর্তমান প্রেক্ষাপটে প্রয়োগ হওয়া একটু কঠিন। কারণ:

১- শায়খ নদভী রহ. যে মনে করেন প্রজারা নিয়ন্ত্রিত হবে রাজা-বাদশা বা শাসকদের ইচ্ছায়, সুতরাং সুশাসক নির্বাচন করে কুশাসকের যাবতীয় অপকর্ম মুছে ফেলতে হবে, কিন্তু প্রশ্ন হলো বর্তমান গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় তা কতোটুকু সম্ভব? .. এ পদ্ধতিতে প্রজারা যাকে নির্বাচিত করবে তিনিই তো নির্বাচিত হয়ে আসবেন। প্রজারা ভালো হলে ভালো আর প্রজারা মন্দ হলে মন্দ। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, জনগণের ইচ্ছা-অনিচ্ছার উপর এবং তাদের মন-মানসিকতা ও চিন্তা-চেতনার উপর শাসক নির্বাচন নির্ভর করছে। তাহলে সব মিলিয়ে এখানে কি জনগণই নিয়ন্ত্রকের ভূমিকায় অবতীর্ন হচ্ছে না? ... তা ছাড়া যে সব দেশে রাজতন্ত্র চালু আছে সেখানে পরিস্থিতি আরো জটিল। রাজ্য বা সিংহাসনের ভাবী

[১]। বুখারী

উত্তরাধীকারী বছরের পর বছর অপেক্ষা করতে থাকেন। প্রতীক্ষার প্রহর দীর্ঘ হতে-হতে অনেক সময় ৩০/৪০ বছরও গড়ায়। তারপরও যুবরাজকে থাকতে হয় সব সময় শঙ্কা-আশঙ্কায়, কখন আবার বিগড়ে যায় রাজনৈতিক পরিস্থিতি! এই সুযোগে কে আবার তাকে টপকে মসনদে বসে যায়!

মোটকথা; শায়খ নদভীর সংস্কার চিন্তা অনুযায়ী এখানে বাদশা বা শাসক নির্বাচিত হচ্ছেন না— দাঈ ও উলামায়ে কেরামের মাধ্যমে, বরং নির্বাচিত হচ্ছেন আম জনতার মাধ্যমে। যাদের ভালো মন্দের এবং কল্যাণ অকল্যাণের কোনো বিচারবোধ নেই।

২- শায়খ নদভী রহ. মনে করেন যে, বিশৃঙ্খলা ও অরাজকতার মূল গোড়া হলো, প্রশাসন। প্রশাসন ঠিক হলে সব ঠিক। সুতরাং বাদশা বা শাসনকর্তাকে সংশোধন করা মানেই আম জনতাকে সংশোধন করা। সমাজকে সংশোধন করা। কিন্তু বাস্তবতা হলো ফাসাদের জড় ও শিকড় শুধুমাত্র রাজা-বাদশা ও শাসক শ্রেণীর ভিতরেই যে সীমাবদ্ধ, তা নয়। বরং শিক্ষিত 'এলিট' শ্রেণীটিও এ-ফাসাদ ও অরাজকতা-ভাইরাসে কঠিনভাবে আক্রান্ত। পাশ্চাত্যের সভ্যতা-সাংস্কৃতিক আগ্রাসন ভীষণভাবে তাদেরকে বিগড়ে দিয়েছে। নষ্ট করে দিয়েছে। শরীয়তের হুকুম-আহকাম ও বিধি-বিধান প্রতিষ্ঠায় তাই এরাই প্রধান বাধা ও অন্তরায়, বোঝে কিংবা না-বোঝে। সুতরাং শুধুমাত্র বাদশা বা প্রেসিডেন্ট-প্রধানমন্ত্রীকে ঠিক হলেই চলবে না, বরং পাশাপাশি এই তথাকথিত শিক্ষিত 'এলিট' শ্রেণীর ঘাড় থেকেও পাশ্চাত্য-প্রীতির ভুত তাড়াতে হবে। কেননা বর্তমানে এই শ্রেণীটিই আম জনতাকে সবচে' বেশি প্রভাবিত করে চলেছে। এরা সমাজ-জীবনের চিন্তায়-চেতনায়-আচারে-আচরণে গভীরভাবে জেঁকে বসে আছে। এদেরকে প্রতিহত করার জন্যে, মুকাবিলা করার জন্যে একক কোনো ব্যক্তিত্ব যথেষ্ট নয়, এর জন্যে প্রয়োজন সংঘবদ্ধ প্রয়াস ও আন্দোলন। তখন চিন্তার মুকাবিলা হবে চিন্তার সাথে, যুক্তির মুকাবিলা হবে যুক্তির সাথে। কলমের মুকাবিলা হবে কলমের সাথে। এই মহান জিহাদের দিকেই আল্লাহ রাসূলকে নির্দেশ দিয়েছিলেন এই বলে ঃ

فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا.

'কাফেরদের আনুগত্য কিন্তু করবেন না। ওদের সঙ্গে তা দ্বারা (কুরআন দ্বারা) জিহাদ করে যান কোমর বেঁধে।' -ফুরক্বান: ৫২

৩- শায়খ নদভী মনে করেন রাজা-বাদশা ও শাসকবর্গকে বদলে দেয়ার জন্যে .. সঠিক পথে আনার জন্যে একজন আল্লাহওয়ালা আলেমই যথেষ্ট। তাঁর হিকমত ও প্রজ্ঞার সামনে এবং দূরদর্শিতা ও আল্লাহভীরুতার সামনে রাজা-বাদশারা মোমের মতো গলে যাবেন। কাঁদতে-কাঁদতে বেরিয়ে আসবেন অন্ধকার অতীত থেকে আর হাসতে-হাসতে প্রবেশ করবেন আলোকিত বর্তমানে। যেমনটা ঘটেছিলো শায়খ আহমদ রহ. এর ক্ষেত্রে। কিন্তু আমাদের কথা হলো, যুগে-যুগে কি মুজাদ্দিদে আলফে সানীদের জন্ম হয়? ... এটা বরং আল্লাহ্‌র নে'আমত ও পুরস্কার। এই নে'আমত ও পুরস্কার সব যুগ বা সব সমাজের ভাগ্যে আসে না। ধরে নিলাম আসলো, কিন্তু রাজা-বাদশা আর প্রেসিডেন্ট-প্রধানমন্ত্রীকে 'নিজের ইচ্ছেমত' প্রভাবিত করার ক্ষমতা ও মানসিক প্রাচুর্য ক'জনের আছে? এবং ক'জন রাজা-বাদশা-প্রেসিডেন্ট-প্রধানমন্ত্রীই বা তাঁর কথায় প্রভাবিত হওয়ার মানসিকতা-যোগ্যতা-সদিচ্ছা রাখেন?

সুতরাং শায়খ নদভী কি নিজের অবস্থান থেকে কিছুটা সরে এসে বিংশ শতাব্দীর অন্য এক দাঈ'র কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়ে এখানে একটু বলবেন : إما أن ينتقل الإيمان إلى قلوب الحاكمين وإما أن ينتقل الحكم إلى أيدي المؤمنين (হয়ত ঈমান 'স্থানান্তরিত' হবে প্রশাসকদের কাছে অথবা প্রশাসন স্থানান্তরিত হবে মু'মিনদের কাছে।') নাকি শায়খ মনে করেন যে, পরিবর্তনের পথ একটাই, তার কোনো বিকল্প নেই! অর্থাৎ إما أن ينتقل الإيمان إلى قلوب الحاكمين أو ينتقل ينتقل الإيمان إلى قلوب الحاكمين! (হয়ত ঈমান স্থানান্তরিত হবে প্রশাসকদের কাছে অথবা ঈমান স্থানান্তরিত হবে প্রশাসকদের কাছে।' অর্থাৎ শায়খের মতে কি এই যে, সমাজ সংস্কারের একমাত্র পথ ও পন্থা এই একটিই?! ......

তবে আমার মনে হয়; শায়খ নদভী রহ. তাঁর পেশকৃত প্রস্তাবের যৌক্তিকতা ও উপযুক্ততা সত্ত্বেও প্রশাসকদেরকে ঈমান ও দীনের দিকে জোরালোভাবে আহ্বান জানানোর পাশাপাশি বর্তমান প্রেক্ষাপটকে সামনে রেখে সমাজ সংস্কারের জন্যে অন্যান্য পথ ও পন্থা গ্রহণের ব্যাপারেও তাঁর কোনো দ্বিমত পোষন করেন নি। যদি তাই হয়, তাহলে শায়খের সাথে আমার কোনো দ্বিমত নেই। দূরদৃষ্টি সম্পন্ন কোনো দাঈ'রই দ্বিমত থাকতে পারে না।

চতুর্থ অধ্যায়

সায়্যিদ আবুল হাসান আলী নদভী
আরব দুনিয়ার কাছে অনারব দুনিয়ার দূত

> যে সকল বিবেচনায় আরব দুনিয়ার কাছে শায়খ নদভী'র এই মহিমান্বিত অবস্থান

> বিভিন্ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান ও ইসলামী সংস্থা কর্তৃক তাঁর সম্মাননা

> আরব দুনিয়ার সাথে তাঁর সম্পর্ক ঃ সূচনা ইতিহাস

> দেশে দেশে আমন্ত্রণ ঃ সেমিনারে বৈঠকে বক্তৃতায়

> লখনৌ'তে নদওয়াতুল উলামা'র ঐতিহাসিক পঁচাশিসালা সম্মেলন

চতুর্থ অধ্যায়

আবুল হাসান আলী নদভী

আরব দুনিয়ার কাছে অনারব দুনিয়ার দূত

শায়খ আবুল হাসান আলী নদভী অসংখ্য গুণের আধার এক ঐশ্বর্যময় ব্যক্তিত্ব। বহুমুখী তাঁর প্রতিভা ও অবদান। দাওয়াতি ময়দানের বিশিষ্ট ইমাম ও দিক দিশারী যারা, তিনি তাঁদেরই এক গর্বিত সদস্য। ইসলাহ্ ও সংস্কারের ময়দানে যাঁরা এঁকে দিয়েছেন অমরত্বের চিহ্ন, সেই পুণ্য কাফেলারও তিনি এক নন্দিত সদস্য। হিদায়াতের জ্যোতির্ময় তারকা যাঁরা, তাঁদের আকাশেও জ্বলজ্বল করে জ্বলছেন তিনি। ইলম ও জ্ঞানের শীর্ষ চূড়ায় যাঁরা অধিষ্ঠিত— সগৌরবে.. সমহিমায়, সেখানেও তাঁকে চোখে পড়ে— হাজার মাইলের দূরত্ব থেকে। আল্লাহ্ ওয়ালাদের ঐ যে নূরানি কাফেলা, সেখানেও তিনি শামিল রয়েছেন সসম্মানে। দুর্যোগে দুঃসময়ে নিজেদের কাঁধে তুলে নিয়েছেন যাঁরা ইসলামের সিপাহসালারের পতাকা, সেই বীর কাফেলারও একজন সদস্য তিনি।

সত্যিই তিনি আল্লাহ্‌র ওলী। আল্লাহ্‌ওয়ালাদের মুবারক জামাতের এক অন্যতম সদস্য। যাঁদেরকে দেখলে আল্লাহ্‌র কথা মনে পড়ে। হৃদয়ে প্লাবন সৃষ্টি হয়। যাঁদের কথা মানলে আল্লাহ্‌র পথের ঠিকানা মিলে। যাঁদের চরিত্র সুষমা ও বর্ণিল আচার-আচরণ মানুষকে দুনিয়ার মোহময় ইন্দ্রজাল ছিন্ন করে আখেরাতের দিকে ধাবিত করে। আরবদের বিখ্যাত প্রবাদে তাই বলা হয়েছেঃ

لسان الحال أبلغُ من لسان المقال.

'মুখের ভাষার চেয়ে অবস্থার ভাষা অনেক বেশি
প্রভাবপূর্ণ—অলঙ্কারমণ্ডিত।'

তাসাওউফের ইমামগণ বলেছেনঃ

حَالُ رَجُلٍ فِي رجُلٍ أَبْلَغُ تَأْثِيْرًا مِن مَقَال أَلْفِ رجُلٍ فِي رجُلٍ.

'এক হাজার মানুষের কথা মাত্র একজন মানুষের মাঝে যে প্রভাব ফেলে, একজন মানুষের অবস্থা এক হাজার মানুষের মাঝে তারচে' বেশি প্রভাব ফেলে।'

সালফে সালেহীনের ভাষায়—

الرَّبَّانِي هُوَ الَّذِيْ يَعْلَمُ وَيَعْمَلُ وَيُعَلِّمُ.

'আল্লাহওয়ালা হলেন তিনিই. যিনি জানেন তারপর আমল করেন তারপর জানান (অন্যকে শিক্ষা দেন)'

এ দিকে ইশারা করেই আল্লাহ বলেছেন :

وَلَكِنْ كُونُوا رَبَّانِيِّين بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُون الْكِتَابَ وَبِمَا كُنتُمْ تَدْرُسُونَ.

'তোমরা আল্লাহওয়ালা হয়ে যাও। সে শিক্ষা অনুসরণ করে, যা তোমরা শেখাতে নিজেরা শেখে।' -আলে ইমরান:৭৯

তিনি ছিলেন তাঁদের একজন, যাঁরা মানুষকে ইলম শিক্ষা দেন, দীন শিক্ষা দেন। যাঁদের জন্যে আসমানের ফেরেশতারাও দু'আ করে আর জমিনে দু'আ করে— কুল মাখলুকাত। গর্তের ঐ পিপীলিকাও। সমুদ্রের পানিতে ছুটে-চলা ঐ মৎসও।

ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বলের ভাষায় তাঁদের আরেকটি পারচয় হলো :

كَالشَّمْسِ لِلدُّنْيَا وَالْعَافِيَةِ لِلنَّاسِ.

'পৃথিবীর জন্যে এঁরা সূর্য .. মানুষের জন্যে এরা আরোগ্য।'

হ্যাঁ.. শায়খ নদভী সেই কম সংখ্যক নির্বাচিত মহানদের একজন, সময়ে-সময়ে যাঁদেরকে পাঠিয়ে আল্লাহ মানবতার মৃত হৃদয়ে নব-প্রাণের সঞ্চার করেন। দীনের হারিয়ে-যাওয়া ঐতিহ্য ও শান-শওকত ফিরিয়ে আনেন— মানবতার প্রতি মমতায় আর্দ্র হয়ে .. দয়ায় সিক্ত হয়ে।

তিনি ইলমে নবুয়তের উত্তরাধিকারীদের একজন, যাঁরা ইলমে নবুয়তের ধারক-বাহক— প্রজন্মের পর প্রজন্ম-ধরে তা পৌঁছে দেয়ার জন্যে। সীমালংঘনকারীদের বিকৃতি থেকে, বাতিলপন্থীদের চুরি থেকে এবং অজ্ঞদের অপব্যাখ্যা থেকে।

আমি আরো বিশ্বাস করি যে, শায়খ নদভী রহ. সেই পুণ্য কাফেলার একজন, হাদীসের ভাষ্য ও সাহাবায়ে কেরামের উক্তি অনুযায়ী যাঁদের বিজয় লাভ সুনিশ্চিত—

لا تزال طائفة من هذه الأمة قائمة بالحق ظاهرة عليه حتى يأتي أمر الله وهم كذالك.

'এই উম্মতের একটি জামাত সব সময় সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে। সত্যের উপর প্রবল থাকবে। তাঁদের এ অবস্থা চলতে থাকবে একেবারে আল্লাহ্‌র চূড়ান্ত নির্দেশ (অর্থাৎ কেয়ামতের পূর্ব পর্যন্ত) আসা পর্যন্ত।'

নিঃসন্দেহে তিনি তাঁদেরও একজন, কুরআনে কারীম যাঁদের দিকে ইশারা করে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছে—

وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ.

'আর যাদেরকে আমি সৃষ্টি করেছি, তাদের মধ্যে এমন একটি দল রয়েছে যারা সত্যের পথ দেখায় এবং সে অনুযায়ী ন্যায় বিচার করে।'

-আরাফ:১৮১

যাঁদের সম্পর্কে হযরত আলী রা. এর উক্তি হলো:

لا تخلوالأرض من قائم لله بالحجة

'আল্লাহকে প্রমাণ করার জন্যে তাঁর পক্ষে একটি দল সর্বদাই এই পৃথিবীতে থাকবে।'

আবুল হাসান আলী নদভী রহ. সম্পর্কে লেখক ও কলম-সৈনিকদের জন্যে অসংখ্য ক্ষেত্র রয়েছে। আমি নিজেও তাঁকে নিয়ে অনেক লিখেছি। কিন্তু তবুও মনে হয় যেনো কিছুই লিখি নি, কিছুই লেখা হয় নি। আরো অনেক কিছুই লেখার ছিলো।

আন্তর্জাতিক ইসলামী সাহিত্য সংস্থা —যিনি এর প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি ছিলেন— তুরস্কের ইস্তাম্বুল নগরীতে তাঁর উদ্দেশ্যে এক সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিলো। সেখানে বিশ্বের খ্যাতনামা উলামায়ে কেরাম কবি-সাহিত্যিক ও লেখক-সাংবাদিকেরা উপস্থিত হয়েছিলেন তাঁকে শ্রদ্ধা জানাতে। আমারও সৌভাগ্য হয়েছিলো সেখানে উপস্থিত থাকার। সেখানে পেশ করার জন্যে আমি তাঁর 'দাওয়াতি দর্শন ও তত্ত্বকথা' নিয়ে একটি লেখা তৈরী করি— বিশটি স্তম্ভে বিভক্ত করে। প্রতিটি স্তম্ভ নিয়েই আলোচনা করেছি অতি সংক্ষেপে শুধু একটি স্তম্ভ ছাড়া। 'আকল-বুদ্ধি ও যুক্তির উপর ওহীর সমুচ্চতা'- স্তম্ভটি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছিলাম। (যার আলোচনা দ্বিতীয় অধ্যায়ে গিয়েছে)

এ ছাড়া কাতারের ধর্ম মন্ত্রণালয়ের আমন্ত্রণে তিনি مهمة الأمة الإسلامية في العالم (বিশ্বে মুসলিম উম্মাহর গুরুত্ব ও অপরিহার্যতা) বিষয়ে যে মূল্যবান লিখিত বক্তৃতা করেছিলেন, তার সাথে আমার বক্তব্যও প্রকাশিত হয়েছিলো, যা আমি তাঁকে নিয়ে লিখেছিলাম। তাঁর ওফাতের খবর পেয়েও আমি তাঁর সুমহান ব্যক্তিত্ব নিয়ে লিখতে বাধ্য হয়েছিলাম। আমার বেদনাঘেরা মনকে সান্ত্বনা দেয়ার চেষ্টা করেছিলাম। ইংল্যাণ্ডের বুকে যে বিশ্ববিদ্যালয়টি গর্ব নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে বহুকাল থেকে, সেই অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক ষ্টাডিজ সেন্টরের বন্ধুরা আমাকে অনুরোধ জানিয়েছিলো শায়খ নদভী'র ওফাতের পর অনুষ্ঠিতব্য শোকসভায় তাঁকে নিয়ে কথা বলতে, আরব বিশ্বের সাথে তাঁর সম্পর্ক নিয়ে কথা বলতে, তখন নিজেকে বড়ো ধন্য মনে হয়েছিলো। হ্যাঁ .. আরব বিশ্বের সাথে তাঁর সম্পর্ক অনেক গভীর ও সুদৃঢ় ছিলো। এ ক্ষেত্রে তিনি সত্যিই তুলনাহীন ও প্রশংসার্হ।

আর হ্যাঁ .. এই বিশ্ববিদ্যালয়ের বুকে ইসলামিক ষ্টাডিজ সেন্টারটি তিনিই প্রতিষ্ঠা করেছিলেন এবং তিনিই ছিলেন আমৃত্যু এর কার্য নির্বাহি পরিষদ-এর সভাপতি। আমিও সে বোর্ডের সদস্য ছিলাম। সে সুবাদে এখানে তাঁর সাথে মিলিত হওয়ার একটা সুযোগ লাভ করতাম। সে সুযোগে আমি ধন্য হতাম— তাঁর রাব্বানিয়াতের উচ্ছল ধারায় অবগাহন করে এবং তাঁর রূহানিয়াতের শীতল পরশে আমার তৃষিত আত্মাকে তৃপ্ত করে।

আরব দুনিয়ার কাছে শায়খের অবস্থান

সত্যি কথা বলতে কি; আবুল হাসান আলী নদভী ছিলেন হিন্দুস্তানের মুসলমানদের পক্ষ থেকে বরং সারা অনারব দুনিয়ার মুসলমানদের পক্ষ থেকে আরব দুনিয়ার কাছে দূত। তাঁকে দূত হিসাবে স্বাগত জানাতে পেরে ধন্য হয়েছিলো আরব দুনিয়ার উলামা, দাঈ ও ইসলামী চিন্তাবিদরা। বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, দাওয়াতি সংস্থা এবং ধর্মীয় সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানগুলি।

যে সকল বিবেচনায় আরব দুনিয়ার কাছে শায়খ নদভী'র এই মহিমান্বিত অবস্থান

এই যে আরব দুনিয়ার উলামায়ে কেরাম ও বিভিন্ন সংস্থা ও একাডেমি অবিসংবাদিতভাবে তাঁকে —বিশেষভাবে হিন্দুস্তানের এবং ব্যাপকভাবে

সারা অনারব দুনিয়ার— দূত হিসাবে সতত সতস্ফূর্ততায় বরণ করে নিলেন— এর পেছনে আসলে কিছু কারণ আছে। আমরা এখন অতি সংক্ষেপে তা এখানে পেশ করছি :

১- তাঁর আরব শিকড়

কয়েক শতাব্দীকাল থেকে তাঁর পূর্বপুরুষেরা হিন্দুস্তানে বসবাস করলেও তাঁর বংশ-পরম্পরা গিয়ে মিলিত হয়েছে— খাঁটি আরব রক্তের সাথে, ইসলামের সাথে রয়েছে যাঁদের নাড়ির টান। ইলমে নববী'র প্রচার প্রসারে, ইসলামের নানামুখী খিদমতে এবং মুসলিম উম্মাহর কল্যাণ কামনায় যাঁরা ছিলেন সদা তৎপর ও নিবেদিতপ্রাণ।

শুধু খাঁটি আরব রক্তের কথা বলছি কেনো? তাঁর বংশের পুণ্যধারা বরং মিলিত হয়েছে একেবারে হযরত আলী রা. পর্যন্ত গিয়ে! এ জন্যেই তাঁর বংশের সবাই 'হাসানী' হিসাবে প্রসিদ্ধি লাভ করেছেন। তাঁর পূর্বপুরুষের মধ্যে সর্ব প্রথম হিন্দুস্তানে আগমন করেন আমির সায়্যিদ কুতবুদ্দীন মুহাম্মদ আল-মাদানী (৫৮১-৬৭৭ হিজরী)। সুতরাং তিনি 'আরাবী'। তিনি 'হাশেমী'। তিনি 'হাসানী'। এই আরব শিকড়ই মূলত তাঁকে আরবদের কাছে টেনে এনেছে। হাশেমী খান্দানের এক সন্তান যদি আরবদের কাছে ছুটে আসেন এবং আরবরাও যদি তাঁকে একান্তভাবে বরণ করে নেয়— তাহলে অবাক হওয়ার তো কিছু নেই! ...

২- আরবী ভাষা ও সাহিত্যে তাঁর অগাধ পাণ্ডিত্য

একেবারে শৈশব থেকেই আরবী ভাষা ও সাহিত্যের বিভিন্ন শাখা-প্রশাখায় তিনি বিচরণ করতে শুরু করেন। আরবী ভাষা ও সাহিত্যের জন্যে নিবেদিত—সে ছিলো এক বর্ণাঢ্য সাধনা!। পড়া হয়ে যেতে থাকে তাঁর একের পর এক গুরুত্বপূর্ণ কিতাব। বরাতগ্রন্থ। মুখস্থ হয়ে যায় বিভিন্ন আরবী কবিতা ও হৃদয়-মাতানো গদ্যাংশ। যা প্রতিফলিত হতে থাকে তাঁর কথায়-বলায়-লেখায়। যেনো তিনি আরব পরিবেশে আরবদের মাঝেই বেড়ে উঠছেন। আরব দেশের শীর্ষসারির কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেই পাঠ নিচ্ছেন। এভাবেই তৈরী হয়ে যায় তাঁর আরবী ভাষা ও সাহিত্যের শক্ত বুনিয়াদটা।

আরবী ভাষায় অতি সাবলীলভাবে তিনি বক্তৃতা করতেন। লিখতেন সবকিছু—কিতাব, চিঠি ইত্যাদি। লেখার ক্ষেত্রে তাঁর প্রধান ভাষা-ই ছিলো আরবী। পরবর্তীতে তা উর্দূ ও অন্যান্য ভাষায় অনূদিত হতো। সামান্য ব্যতিক্রম ছাড়া। ঠিক বিপরীত অবস্থা আমরা লক্ষ্য করি মাওলানা মওদূদী সাহেবের বেলায়। তিনি সবই লিখতেন উর্দূতে। পরবর্তীতে তা অনূদিত হতো আরবীতে। আরবী ভাষার সাথে এমন গভীর পরিচয় ও সম্পর্ক থাকার কারণেই শায়খ আবুল হাসান আলী নদভী রহ. আরবী ভাষা ও সাহিত্যের জন্যে বড়ো দরদ ও ভালোবাসা অনুভব করতেন। এই ভাষাকে শিশুদের কাছেও তিনি প্রিয় করে তুলেছেন— কালজয়ী কিছু শিশুতোষ সিরিজ ও কিতাব লিখে। আর আরবী সাহিত্যের আকাশকে তিনি সুশোভিত করেছেন সেখানে ইসলামী সাহিত্যের তারায়-তারায় *'আন্তর্জাতিক ইসলামী সাহিত্য সংস্থা'* প্রতিষ্ঠা করার মধ্য দিয়ে। মৃত্যু পর্যন্ত যিনি তারকাখচিত সে আকাশে সভাপতিত্বের আলো ছড়িয়েছেন।

৩- তাঁর বিস্তৃত সংস্কৃতি জ্ঞান

এ-বিস্তৃত সংস্কৃতি জ্ঞানের উপর ভর করে তিনি সমন্বয় করতে সক্ষম হয়েছেন 'কাদীম' (পুরাতন) ও 'হাদিস' (নতুন) এর মাঝে। প্রাচ্যধারার আরবী ইসলামী সংস্কৃতির সাথে তিনি সার্থকভাবে সমন্বিত করেছেন পাশ্চাত্যধারার আধুনিক সংস্কৃতিকে। আর এ ব্যাপারে তাঁকে সবচে' বেশি সহযোগিতা করেছে তাঁর একাধিক ভাষাজ্ঞান—বহুভাষা-পারদর্শিতা। যা বিভিন্ন সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে প্রবেশের সেঁতু-বন্ধন হিসাবে কাজ করে। তিনি একাধারে জানতেন— আরবী, উর্দূ, ফারসী, হিন্দি ও ইংরেজি। এই ব্যাপকভিত্তিক সংস্কৃতি জ্ঞানের খুব সুন্দর প্রভাব পড়েছে তাঁর লেখায়-কথায়-চিন্তায়।

৪- তাঁর সংস্কৃতি ও চিন্তা-দর্শন উপস্থাপনকারী কিছু গুরুত্বপূর্ণ কিতাব

হ্যাঁ .. তাঁর লেখা এ-সব কিতাব আরব দুনিয়ায় ব্যাপক সাড়া জাগিয়েছিলো। এমনকি তিনি আরবদের ভিতরে পরিচিত হয়েছেন এ-সব কিতাবের মাধ্যমে। এ-সব কিতাবে কী ছিলো? .. এ-সব কিতাবে আরবরা খুঁজে পেয়েছিলো ইসলামের সঠিক ব্যাখ্যা। ইতিহাসের সঠিক ধারা। বর্তমান প্রেক্ষাপটের সঠিক বিশ্লেষণ। এ-সব কিতাবের ছত্রে-ছত্রে ঝরে

পড়েছে ইসলামের জন্যে লেখকের 'গায়রত' বা আত্মসম্মানবোধ এবং মুসলিম উম্মাহর জন্যে অপরিসীম দয়া ও দরদ। এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ হলো তাঁর অমর গ্রন্থ ماذا خسر العالم بانحطاط المســـلمين (মুসলমানদের অধঃপতনে বিশ্ব কী হারালো)।

৫- আরব জাতির প্রতি তাঁর সীমাহীন গুরুত্ব প্রদান এবং তাদের চিন্তা-চেতনা ও আবেগ-অনুভূতির সাথে তাঁর গভীর সম্পর্ক

শায়খ আবুল হাসান আলী নদভী রহ. আরবদের প্রতি সীমাহীন গুরুত্ব প্রদান করেছেন।

ভেবেছেন তাদের সঙ্কট ও সমস্যা নিয়ে।
তাদের বর্তমান ও ভবিষ্যত নিয়ে।
তাদের জাগরণ ও উত্তরণ নিয়ে।
তাদের আন্দোলন ও আলোড়ন নিয়ে।
তাদের অতীত ও ঐতিহ্য নিয়ে।
ভাবতেই হয়!
তারা যে ইসলামের আত্মীয়!
নিকটাত্মীয়! পরমাত্মীয়!
তারা যে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পরিবার!
মহান সাহাবায়ে কেরামের বংশধর!
তাদেরকেই যে অতীতের মতো আগামী দিনেও দিতে হবে—
মুসলমানদের নেতৃত্ব!
যদিও এখন চলছে তাদের মধ্যে নেতৃত্ব-শূন্যতা।
প্রজ্ঞা-সঙ্কট। একদল পাশ্চাত্য-ঘেঁষা শাসকের দুঃশাসন।
এ-সব থাকবে না। আরব দেশ আবার সেরা হবে।
আরবরা আবার শাসক হবে।
আরবরা আবার বিশ্ব শাসন করবে।
ইসলামের জয়-পতাকা উড়াবে।
আদর্শের ময়দানে সবাইকে ছাড়িয়ে যাবে।

তাঁর যে সকল কিতাবে পুস্তিকায় আমরা আরবদের জয়গান এবং তাদের জন্যে তাঁর ব্যথা, দরদ, জ্বলন ও দিক নির্দেশনা খুঁজে পাই, সে গুলি হলো এই—

১. من العالم إلي جزيرة العرب (বিশ্বের পক্ষ থেকে আরব-বদ্বীপের কাছে বার্তা)

২. من جزيرة العرب إلي العالم (আরব-বদ্বীপের পক্ষ থেকে বিশ্বের কাছে বার্তা)।

৩. إسمعي يا مصرُ! (শোনো হে মিশর!),

৪. إسمعي يا سورية! (শোনো হে সিরিয়া!),

৫. إسمعي يا زهرة الصحراء! (শোনো হে মরুফুল!),

৬. اسمعوها مني صريحة أيها العرب (হে আরব জাতি! তোমাদেরকে স্পষ্ট ভাষায় বলতে চাই!)

৭. العرب والإسلام (আরব ও ইসলাম)

৮. العرب يكتشفون أنفسهم (আরবরা আত্মপরিচয়ের সন্ধানে)

৯. الفتح للعرب المسلمين (মুসলিম আরবদের বিজয়ধারা)

১০. نفحات الإيمان بين صنعاء وعمان (সান‘আ ও আম্মানে ঈমানের হাওয়া)

১১. مذكرات سائح في الشرق الأوسط (মধ্যপ্রাচ্য ঘুরে-আসা এক পরিব্রাজকের ডায়রী)

১২. كارثة العالم العربي الحقيقة وأسبابها (আরব বিশ্বের বিপর্যয় ও তার কারণ)

১৩. مستقبل العرب بعد حرب الخليج (উপসাগরীয় যুদ্ধের পর আরব জাহানের ভবিষ্যত)

এ ছাড়া আছে আরো কিছু পুস্তিকা।

আর ফিলিস্তিন নিয়ে তো তিনি অনেক ভেবেছেন, অনেক লিখেছেন, অনেক বক্তৃতা করেছেন। যেমন: العوامل الأساسية في كارثة فلسطين (ফিলিস্তিন ট্র্যাজেডি’র মূল কারণসমূহ), إزالة أسباب الخذلان أهم من إزالة آثار العدوان (দুশমনের চিহ্নসমূহ নয়— সবচে’ গুরুত্বপূর্ণ হলো অসহযোগিতার কারণসমূহ দূর করা)। মূলত শায়খ নদভী’র ইলমী ঐতিহ্যের ব্যাপক অংশই ব্যাপকভাবে আরবদেরকে ঘিরে এবং বিশেষভাবে ফিলিস্তিনকে ঘিরে আবর্তিত হয়েছে। তিনি মনে করতেন যে, ফিলিস্তিন চায় এমন এক মহান

নেতাকে, যিনি মুসলিম উম্মাহর নেতৃত্ব দেবেন ঈমানের বলে বলীয়ান হয়ে। উম্মতকে জাগিয়ে তুলবেন ঈমান ও জিহাদের অবিনাশী চেতনায়। তাদেরকে ফিরিয়ে নিয়ে যাবেন বীর সালাহুদ্দীন আইয়ূবী'র সোনালী যুগের ত্যাগ ও সাধনায় এবং বিজয় ও সাফল্যে।

৬- তাঁর উদারতা, তাঁর মহানুভবতা, তাঁর মধ্যপন্থা

উদারতা ও মহানুভবতা মিশে আছে তাঁর রক্তের কণায় কণায়।
মধ্যপন্থা ও নরমপন্থা জড়িয়ে ছিলো তাঁর সকল অনুভব-অনুভূতিতে।
চিন্তা-চেতনায় তিনি ছিলেন মধ্যপন্থী।
মতবিরোধপূর্ণ বিষয়াবলীতে তিনি ছিলেন মধ্যপন্থী।
স্পর্শকাতর ও নাজুক বিষয়াবলীতে তিনি ছিলেন মধ্যপন্থী।
অতি নাজুক ও স্পর্শকাতর কোনো বিষয়ে মতামত ব্যক্ত করতেন—
তখন বড়ো নম্রতা ও কোমলতার সাথে।
বড়ো প্রজ্ঞা ও স্থৈর্যের সাথে তিনি তার পক্ষে-বিপক্ষে কথা বলতেন।
এমন তো হওয়ারই কথা!
তিনি যে কখনো ভাঙতে চান নি—
সব সময় চেয়েছেন শুধু জুড়তে!
তিনি যে কখনো চান নি বিভেদ-বিভাজন—
সব সময় চেয়েছেন শুধু ঐক্য ও একতা!
অনৈক্যের সকল বিভেদরেখা মুছে দিয়ে তিনি খোঁজেন—
শুধু ঐক্যের সূত্র।
তিনি যেনো এক অভিজ্ঞ ডাক্তার,
অস্ত্রোপচার কক্ষে রোগীকে পর্যবেক্ষণকারী—
অভিজ্ঞতাপূর্ণ দৃষ্টিতে, অস্ত্রোপচারের পূর্বক্ষণে।
না, অবশ্যই তিনি নন সেই কসাই,
যে ছুরি হাতে অপেক্ষা করে নির্দয়ভাবে কচকচ করে মাংস কাটার!

হ্যাঁ .. এমনই ছিলো শায়খ নদভী'র পন্থা। তাসাওউফ নিয়ে কতো পথ, কতো মত। কতো বিতর্ক, কতো মতবিরোধ। কিন্তু তাসাওউফ আসলে কী? .. এর সঠিক উত্তর পেশ করেছেন তিনি তাঁর এই ছোট্ট কিতাবে: ربانية لا رهبانية (বৈরাগ্য নয়— চাই রাব্বানিয়াত)।

আর ইসলাহ ও সংস্কারের ময়দানে যাঁরা বিপ্লবী অবদান রেখে গেছেন ইতিহাসের বাঁকে-বাঁকে .. মোড়ে-মোড়ে, তাঁদের কথা জানা যাবে তাঁর رجال الفكر والدعوة في الإسلام (ইসলামের চিন্তানায়ক ও দাঈগণ) গ্রন্থ সিরিজে। এ-সিরিজে তিনি শায়খুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমিয়া, মুজাদ্দিদে আলফে সানী ও শাহ ওয়ালীউল্লাহ দেহলভী রহ.-এর জীবন ও কর্ম এবং কীর্তি ও অবদান সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বলেছেন : মুসলিম উম্মাহর বিগত দিনের ইতিহাস ও ঘটনা পরম্পরা থেকে পরিস্কার ফুটে উঠে যে, সংশোধন ও সংস্কার আন্দোলন হলো— একটি অবিচ্ছিন্ন ও বিরতিহীন ধারা। ফলে এক যুগের অস্তয়নে আরেক যুগের উদয়ন ঘটবেই। এক তারকার তিরোধানে আরেক তারকার আবির্ভাব ঘটবেই। এ-ধারা সব সময় চলমান। এটি ইতিহাসের একটি অমোঘ নিয়ম। তাই বলা যায়; ইতিহাস চলে ইতিহাসের নিজস্ব নিয়মে ও গতিতে। এ-নিয়ম ও গতিতে কোনো ত্রুটি বা অসম্পূর্ণতা নেই, তা থাকলে আছে ইতিহাস সংকলনের ধারা-পদ্ধতিতে ও বিন্যাস-গাঁথুনিতে।

৭- নদওয়াতুল উলামা'র মতো একটি শিক্ষায়তন ও ব্যতিক্রমী গবেষণা প্রতিষ্ঠানের সাথে তাঁর সম্পৃক্ততা

নদওয়াতুল উলামা— এক গর্বিত ইসলামী বিদ্যাপীঠের নাম। এ বিদ্যাপীঠের সুনাম ও সুখ্যাতি বিশ্বময়। আর সেঁতু বন্ধন ছিলো আল্লামা মুহাম্মদ আলী মোঙ্গেরী, আল্লামা শিবলী নু'মানী ও সায়্যিদ সোলায়মান নদভী রহ. এর বিশ্ব-পরিচিতি। এ-প্রতিষ্ঠানের সবচে' বড় বৈশিষ্ট্য হলো এই যে, তা সালফে সালেহীন ও আকাবির কাফেলার ইলমী খাযানা এবং উত্তরসুরীদের জ্ঞান সম্ভারের মাঝে, স্বচ্ছ ও অবিকৃত আকিদা এবং আত্মার বাগানে সৌরভ ছড়ানো খাঁটি ও নির্ভেজাল তাসাওউফের মাঝে, ইলমে ওহী ও আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের মাঝে— পাহাড় টলিয়ে-দেয়া ঈমান ও আল্লাহভীতির মাঝে সু সমন্বয় সাধন করেছে।

যে কোনো 'নতুন'— তা যদি হয় ভালো ও কল্যাণমুখী,

যে কোনো 'পুরাতন'— তা যদি হয় ভালো ও দিক দিশারী,

তাহলে এ-প্রতিষ্ঠান তা লুফে নিতে মোটেই দ্বিধাগ্রস্ত হয় না, অহেতুক কালক্ষেপন করে না। সাবলীল ও পরিচ্ছন্ন ঐতিহ্যকে এ-প্রতিষ্ঠান গ্রহণ করে সতত গভীর ভালোবাসায়। আর যা কিছু আবীল ও কূটিল তা

প্রত্যাখ্যান করে স্তূপীকৃত ঘৃণায়। গৌরবময় ইতিহাস-ঐতিহ্য ও অবিচ্ছিন্ন শাশ্বত মূলনীতির উপর এ-প্রতিষ্ঠান যেমন অটল অবিচল, যুগ চাহিদার প্রেক্ষাপটে আবিস্কৃত আধুনিক উপায়-উপকরণকেও বিনা কারণে উপেক্ষা করে না। তাই স্থান-কাল-পাত্র ভেদে যারাই চান উম্মতের ইসলাহ ও সংশোধন এবং চেতনা-বিশ্বাসের শাণিত নবায়ন ও সংস্করণ, তারাই ভালোবাসেন এ-প্রতিষ্ঠানকে, গর্ব করেন এ-প্রতিষ্ঠানের অস্তিত্ব নিয়ে।

৮- তাঁর সর্বজন-প্রিয় ব্যক্তিত্ব

হ্যাঁ .. যারাই তাঁকে চিনেছে, বুঝেছে, তারাই তাঁকে হৃদয় খুলে ভালোবেসেছে। শ্রদ্ধা করেছে। আর যারা তাঁকে দেখেছে কাছে বসে একান্ত সান্নিধ্যে, জেনেছে গভীর করে, তাদের কাছে তাঁর পরিচয়টা এ রকম:

ঈমান তাঁর অটল অবিচল পাহাড় যেনো,
ইয়াকিন তাঁর সুদৃঢ়, শীসাঢালা প্রাচীর যেনো।
আল্লাহভীতি তাঁর প্রচণ্ড, যেনো অনির্বাণ অগ্নিশিখা,
হৃদয় তাঁর সদা আবাদ— আল্লাহ্‌র প্রেম-ভালোবাসায়,
যেনো মৃদু সমীরণের তালে-তালে দোল খায়—
বসন্ত বিরাজিত উদ্যানের বৃক্ষশাখা।
প্রচণ্ড দুনিয়া-বিমুখ ছিলেন তিনি,
পরকাল চিন্তায় সারাক্ষণ মগ্ন থাকতেন তিনি।
তাঁর চরিত্র-সুষমা মানুষের মন কাড়তো,
ভালোবাসা কাড়তো, অচেনা-অজানাকেও কাছে নিয়ে আসতো।
তাঁর সুকুমারবৃত্তি ও মহানুভবতা 'আখেরাতের ইয়াদ' কাড়তো।
ছিলেন তিনি স্বল্পভাষী, তবে ভীষণ স্পষ্টভাষী।
দীন ছিলো তাঁর গর্বের ধন,
উম্মতের চিন্তা ছিলো তাঁর নিত্য ধ্যান।
নেই নিজের কথা, নিজের সার্থের কথা,
সারাক্ষণ শুধু উম্মতের কথা, উম্মতের সার্থের কথা।
তাঁর সান্নিধ্যধন্য মানুষের কাছে তিনি ছিলেন বিস্ময়,
কাছে এসে তাঁকে দেখে-দেখে সবাই অবাক তাকিয়ে রইতো!
তিনি যেনো ইসলামের সোনালী যুগের সেই সোনার মানুষ—
আমাদের ঝঞ্ঝা-বিক্ষুব্ধ বিংশ শতাব্দীতে যাঁর বসবাস।
সুতরাং তিনি যে সালফে সালেহীনের উজ্জ্বল নমুনা,

এতে আমি বিস্ময়ের কিছুই দেখি না।
তিনি উত্তরসুরীদের জন্যে শ্রেষ্ঠ ও অনন্য উপহার,
সত্যিই তিনি উম্মতের ভিতরে বসবাসকারী প্রিয় ওলী-আল্লাহ্।
যদিও বসবাস তাঁর এই দুনিয়ায়,
কিন্তু বারবার মনে হয়— প্রাণময় তিনি আখেরাতের সত্ত্বায়।
যদিও পদচারণা তাঁর দুনিয়ার মাঝে,
কিন্তু দৃষ্টি তাঁর প্রসারিত নিঃসীম নীল আকাশের মাঝে।
তাঁর এমন সব মহৎ গুণাবলী যদি মানুষকে তাঁর কাছে টানে,
তাহলে তাকে আল্লাহ্র দিকেই টানে।
এ-টানে আমি ভাসিয়েছি আমার তরী,
আশা একটাই— আল্লাহ্র কাছে ভিড়বেই এ-তরী!

পাঠক! তাঁর গুণের কথা বলে শেষ করা যাবে না। বললে শুধু বলতেই ইচ্ছে করে। তাঁর গুণ যে অসীম, অগণন! তাঁর গুণের সংখ্যা যে অফুরন্ত— উদয়নে আর ঝলকে শুধু জ্বলে আর জ্বলে! অযুত নিযুত বে-হিসাব ঐ যে তারার মেলা, তা গোনে গোনে শেষ করে— এমন সাহস ও হিম্মত কার? তিনি ছিলেন বড়ো সহজ সরল। সাদাসিধে তাঁর চাল-চলন। নিঃসীম আকাশের উদারতা ও মহত্ত্বে বিস্তৃত ছিলো তাঁর মহান ব্যক্তিত্ব। হাসানী খান্দানের চরিত্র-সুষমা তাঁকে দিয়েছে আলো ও ব্যাপ্তি এবং সুকুমার্য ও দীপ্তি। তাঁর বিনয় নম্র আখেরাতমুখিতা বারবার ঘোষণা করে: 'অবাক হচ্ছো কেনো বন্ধু! জানো না, তিনি হাসানী বংশের! মুহাম্মদী নসবের!!

* * *

আমার মনে পড়ে, শায়খ সফরে বিশেষ করে মক্কা-মদীনায় অবস্থানকালে বিলাসবহুল পাঁচতারা হোটেল এড়িয়ে ছাত্র বা বন্ধুদের বাসাতেই থাকতে পছন্দ করতেন। খুবই সাধারণ পরিবেশে। আর এই সাধারণ পরিবেশই অধিক সঙ্গতিপূর্ণ ছিলো তাঁর মন-মানস, জীবনাচার এবং জীবনঘনিষ্ঠ সবকিছুর সাথে— পাঁচতারা হোটেল নয়।

৯- তাঁর প্রতি স্বজাতির আস্থা ও ঐকমত্য

তাঁর জাতি —যাদের হয়ে তিনি আরব দুনিয়ায় দূতিয়ালি ও প্রতিনিধিত্ব করেছেন— তাঁর ব্যাপারে ছিলো একমত। দল-মত সবাই।

আমার মনে হয়; এমন দু'জন মানুষও সেখানে খুঁজে পাওয়া মুশকিল, যারা তাঁর ব্যাপারে মতবিরোধে লিপ্ত। আহলে হাদীস বলুন আর তাসাউফপন্থী (পীর-আওলিয়া) বলুন, মাযহাবি বলুন আর লা-মাযহাবি বলুন— সবাই তাঁর ব্যাপারে একমত। ঐতিহ্যময় ইসলামী সভ্যতা-সংস্কৃতির ধারক-বাহকরা যেমন একমত, আধুনিক সভ্যতা-সংস্কৃতির ধারক-বাহকরাও তেমনি একমত। অর্থাৎ এদের সবার কাছেই তিনি ঐক্যের প্রতীক। সবাই তাঁকে ভালোবেসেছেন। শ্রদ্ধার আসনে বসিয়েছেন। তাঁর ইখলাস (একনিষ্ঠতা) ও লিল্লাহিয়াত (আল্লাহমুখিতা)-এর জন্যে, ব্যক্তিসার্থ ও আত্মচিন্তা থেকে দূরে থাকার জন্যে, অন্ধ গোত্রপ্রীতি ও স্বজনপ্রীতি থেকে দূরে থাকার কারণে এবং শুধুমাত্র আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আদর্শের পথে নিজেকে ব্যাপৃত রাখার জন্যে। এ জন্যেই সেখানকার বিভিন্ন সংস্থা ও একাডেমি'র তিনি ছিলেন মধ্যমণি। যেমন *'মুসলিম পার্সোনাল ল' বোর্ড*, *'দীনি শিক্ষা কাউন্সিল'*, *'দারুল মুসান্নিফীন'* ইত্যাদি। আমি বরং আরেকটু সামনে বেড়ে বলছি, হিন্দুস্তানের অমুসলিম সম্প্রদায়ের কাছেও তিনি ছিলেন শ্রদ্ধার্হ, প্রশংসার্হ। এদের ভিতরে যেমন ছিলেন প্রশাসনের শীর্ষ সারির কর্তাব্যক্তিরা তেমনি ছিলেন সাধারণ মানুষও।

সুতরাং সর্বজন শ্রদ্ধেয় এবং সর্বজনপ্রিয় এ-মহান ব্যক্তি *'রাবেতায়ে আলমে ইসলামী'* (বিশ্ব মুসলিম মৈত্রী সংঘ)-এর প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই যদি প্রতিষ্ঠাতা সদস্যদের শীর্ষভাগে থাকেন, তাহলে মোটেই অবাক হওয়ার কিছু নেই। অবাক হওয়ার কিছু নেই— যদি মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের মজলিসে শূরায়ও তাঁর নাম ধ্রুবতারার মতো জ্বলজ্বল করে। অবাক হওয়ার কিছু নেই— যদি *'রাবেতায়ে আলমে ইসলামী'*র অঙ্গ সংগঠন *'মসজিদ বিষয়ক আন্তর্জাতিক উচ্চ পরিষদ'*-এর একেবারে সূচনালগ্ন থেকেই তাঁর নাম শোভা পায়।

অনুরূপভাবে *'রাবেতায়ে আলমে ইসলামী'*র *'ফিকাহ একাডেমি'*রও যদি তিনি সদস্য নির্বাচিত হন এবং দামেস্কভিত্তিক *'আরবী গবেষণা পরিষদ'*-এর সদস্য নির্বাচিত হন, কায়রোভিত্তিক *'আরবী ভাষা ফাউণ্ডেশন'*-এরও সদস্য নির্বাচিত হন এবং এ সব ছাড়াও আরো অসংখ্য প্রতিষ্ঠান ও সংস্থার সম্মানিত সদস্য হিসাবে নির্বাচিত হন— তাহলে সত্যিই অবাক হওয়ার কিছু নেই। এ-প্রাপ্তি..তাঁর পাওনার চেয়ে অনেক কম, অ-নেক অপ্রতুল।

আরব দুনিয়ার সাথে তাঁর সম্পর্কের গোড়ার কথা

আত্ম জীবনীতে শায়খ নদভী লিখেছেন যে, আরব দুনিয়ার সাথে তাঁর সম্পর্কের যখন সূচনা হয়, তখন তিনি টগবগে তরুণ যুবা। ভূমিকা অংশে আমি বলে এসেছি যে, শায়খ প্রথম যখন মিসরে এসেছিলেন তখন ছিলেন পূর্ণ যৌবনে। দাড়ি ছিলো ঘন কালো। চেহারায় ছিলো যৌবন-সজিবতার প্রোজ্জ্বল আভা। মনে ছিলো তারুণ্যদীপ্ত সংকল্পের ঝাঁঝ, লক্ষ্যভেদী প্রাণময়তা। দৃষ্টি ছিলো আত্মসম্ভ্রমবোধে জ্বলে-জ্বলে ওঠা। একদিকে যেমন ছিলেন তিনি এ-যৌবনের প্রাণময় বাঙ্ময় দীপ্তিতে দেদীপ্যমান অপরদিকে ছিলেন প্রবীন প্রাজ্ঞজনের প্রজ্ঞালোকে ধ্রুব তারার মতো জ্বলজ্বলে।

তখন ১৯৪৮ সাল। এ সালেই প্রথম তিনি আরব দেশ সফর করেন। এটি ছিলো মূলত হজ্বের সফর। এরপর অসংখ্যবার তিনি আরব দুনিয়ায় ছুটে এসেছেন— দাঈ হয়ে .. দূত হিসাবে। ১৯৫১ সালটা ছিলো একটা ঐতিহাসিক বছর। এ-সালে তিনি মিসর সফর করেন। এ সফরে আরব দুনিয়ার সাথে তিনি যেমন গভীরভাবে সম্পর্কিত হন, আরব দুনিয়াও তাঁকে সতত স্বত:স্ফূর্ততায় স্বাগত জানায়, কাছে টেনে নেয় আপন করে। এই সফরে তিনি আরব দুনিয়ার খ্যাতনামা উলামায়ে কেরাম, দাঈ, মুবাল্লিগ, কবি-সাহিত্যিক, চিন্তাবিদদের সঙ্গে মিলিত হন, মত বিনিময় করেন এবং বিভিন্ন শিক্ষা-গবেষণা-দাওয়াতি সংস্থার সাথে পরিচিত হন। বিভিন্ন সভা-সেমিনারে বক্তব্য প্রদান করেন। কখনো শহরের কোলাহলে, কখনো পল্লীগ্রামের শ্যামল পরিবেশে। এ ধারা অব্যাহত ছিলো দীর্ঘ ছয় মাস।

'ইখওয়ানুল মুসলিমীন' -এর কেন্দ্রিয় নেতৃবৃন্দের সাথেও তাঁর সাক্ষাত ও বৈঠক হয়। যাঁদের শীর্ষে ছিলেন অধ্যাপক সালেহ ইশমাভী, অধ্যাপক আবদুল হাকীম আবেদীন, অধ্যাপক আবদুল আযিয কামেলসহ প্রমুখ। তখনই তাঁর أريـد أن أتحـدث إلى الإخـوان ('ইখওয়ানুল মুসলিমীন'-এর বন্ধুদেরকে বলতে চাই) পুস্তিকাটি প্রকাশিত হয়। এই সফরে ইসলামের জান-কুরবান-দাঈ মুহাম্মদ আল-গাযালী'র সাথেও শায়খ নদভী'র একাধিক বৈঠক হয়েছে। আমাদের বিশিষ্ট শিক্ষক শায়খ বাহী আল-খাওলী'র সাথেও শায়খ নদভী দেখা করে একান্তে বসে মতবিনিময় করেছেন। খ্যাতিমান লেখক ও ইসলামী চিন্তাবিদ শহীদ সায়্যিদ কুতবের সাথে শায়খ নদভীর সাক্ষাত, পরিচয় ও ঘনিষ্ঠতা ছিলো এ-সফরের একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা।

আরো দেখা হয়েছে আমার শিক্ষক ডক্টর মুহাম্মদ ইউসুফ মূসা'র সঙ্গে। ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين এর জন্যে তিনি একটি চমৎকার ভূমিকাও লিখেন, বইটির দ্বিতীয় সংস্করণ ছাপার সময়। আরো দেখা হয়েছে বিশিষ্ট সাহিত্যিক ও কথাশিল্পী ডক্টর আহমদ আশ শিরবাসী'র সাথে। ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين এর দ্বিতীয় সংস্করণে ডক্টর শিরবাসী'র লেখা শায়খ নদভী'র একটি সংক্ষিপ্ত জীবনালেখ্যও সংযোজিত হয়, যা তিনি তৈরী করেছিলেন শায়খ নদভী'র সাথে একটি প্রাণবন্ত সাক্ষাতকারের উপর ভিত্তি করে। দেখা হয়েছে ড. আহমদ আমীনের সাথেও। যিনি প্রথম বের করেন তাঁর কালজয়ী গ্রন্থ ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين (মুসলমানদের অধঃপতনে বিশ্ব কী হারালো) ।

আমার মনে আছে, একদিন আযহারে পড়তে আসা কয়েকজন হিন্দুস্ত ানী বন্ধু এসে আমাকে জিজ্ঞাসা করলো:

-'আবুল হাসান আলী নদভীকে চেনেন?'

-'হ্যাঁ! ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين-এর লেখক!'

-'ঠিক বলেছেন!'

-'কিন্তু তাঁর কথা জানতে চাওয়ার কারণ?'

-'তিনি সহসাই মিসরে আসছেন!'

-'তাই! আসার সাথে সাথে আমাকে জানাবে। আমি তাঁর সাথে সাক্ষাত করার জন্যে উদগ্রীব।'

কিছুদিন পরই শায়খ নদভী'র আগমন বার্তা পেয়ে গেলাম। তাঁর সাথে এসেছেন আরো দু'জন। একজন মুঈনুদ্দীন নদভী আর অপরজনের নাম এই মুহূর্তে মনে করতে পারছি না। বিলাসবহুল হোটেল এড়িয়ে আযহারের গলিপথে অবস্থিত অতি সাধারণ একটি বাড়িতে সঙ্গীদ্বয়সহ শায়খ উঠলেন। হোটেল এবং হোটেলের পারিপার্শ্বিকতা ছিলো তাঁর স্বভাব ও প্রকৃতি বিরুদ্ধ। ভীষণ অপছন্দ। আমার মনে পড়ে; *'রাবেতায়ে আলমে ইসলামী'*র একটি সেমিনারে অংশগ্রহণের জন্যে শায়খ সৌদি আরব এসেছেন। আমন্ত্রিত অতিথিদের সবাই হোটেলে উঠলেও শায়খ গিয়ে উঠলেন তাঁর এক ভক্তের বাসায়, অথচ হোটেল ছিলো প্রথম শ্রেণীর।

আমির-উমারা ও বিত্তবানদের সুরম্য বাসভবনে থাকতেও তিনি মোটেই স্বাচ্ছন্দবোধ করতেন না। এর কারণ কী? সম্ভবত এর প্রথম কারণ

হবে— এ-সব প্রাসাদ ও বিলাসবহুল বাসভবনে অবস্থান করাটা তাঁর স্বভাব-প্রকৃতি ও রুচির সাথে একদমই খাপ খেতো না। দ্বিতীয়ত তাদের সঞ্চিত অর্থবিত্ত সংশয়মুক্ত ও পরিচ্ছন্ন কি না, এ নিয়েও হয়তো তিনি দ্বিধায় ভুগতেন।

আমি আমার বন্ধু মুহাম্মদ আদ্‌দামিরদাশ মুরাদ (الدمرداش مـــراد) কে নিয়ে তাঁর সাক্ষাতে গিয়ে হাজির হলাম অবস্থান স্থলে। বন্ধুবর মুরাদের কথা এখানে একটু বলে রাখি। তিনি আজ পৃথিবীতে নেই। তিনি ছিলেন আমার ঘনিষ্ঠ সহপাঠি। আমরা একসঙ্গে পড়েছি, একসঙ্গে দাওয়াতের কাজ করেছি, একসঙ্গে কষ্টভোগ করেছি, একসঙ্গে এক ছাদের নীচে থেকেছি। আমরা তাঁর সাথে দেখা করে বিনয়ের সাথে তাঁকে 'শিবরা'য় অবস্থিত আমাদের বাসায় পদার্পণের দাওয়াত দিলাম। সেখানে আযহারের একঝাঁক তরুণ তাঁর জন্যে বসে বসে অপেক্ষা করছিলো। এরা সবাই 'ইখওয়ানুল মুসলিমীন'এর দাওয়াতি হালকা 'কোতাইবা'র সদস্য ছিলো। কোতাইবা হলো শবগুযারী। ইলম, ইবাদত ও আধ্যাত্মিক সাধনার রাতব্যাপী বিশেষ আমল। অবশ্য কিছুটা ঘুমেরও ব্যবস্থা থাকতো। শায়খ আমাদের কথা বিস্ত ারিত জানতে ও শুনতে বেশ আগ্রহ প্রকাশ করলেন। তখন শায়খকে একান্ত কাছে পেতে এবং তাঁর কথা শুনতে আমাদের আগ্রহের কোনো সীমাই রইলো না। কথার ফাঁকে-ফাঁকে শায়খ আমাদেরকে জিজ্ঞাসা করছিলেন শায়খ হাসানুল বান্না'র কথা, তাঁর চিন্তাধারা ও কর্ম-পদ্ধতির কথা। মতবিরোধপূর্ণ বিষয়ে তাঁর অবস্থানের কথা। তা সে বিষয় ছোটই হোক আর বড়ই হোক। এভাবেই শায়খ নদভী আমাদের কাছ থেকে হাসানুল বান্না সম্পর্কে একটা মোটামুটি ধারণা নিয়ে নিলেন। হাসানুল বান্না রহ. ছিলেন সত্যিকার অর্থেই ইমামে রাব্বানী। ইসলামী শাসন প্রতিষ্ঠায় সংগ্রামরত নিছক এক নেতাই ছিলেন না তিনি, বরং তাঁর সবচে' বড় পরিচয় হলো এই যে, তিনি ছিলেন এমন এক আদর্শ রাহনুমা ও মুরুব্বী, যাঁর আজীবন স্বপ্ন ছিলো— ইসলামকে সঠিকভাবে অনুভব ও অনুসরণকারী এমন এক আদর্শ প্রজন্ম গড়ে তোলা, ঈমান হবে যাদের দৃঢ় ও মজবুত, শিক্ষা হবে যাদের কুরআন-সুন্নাহর চেতনা ও আলোকে স্নাত ও প্লাবিত, মিশন হবে যাদের মানুষকে ইসলামের দিকে .. ইসলামের সার্বজনীন ও চিরন্তন আদর্শের দিকে আহ্বান ও আকর্ষণ করা এবং আল্লাহ্‌র জমিনে

আল্লাহ্‌র শাসন কায়েমের দৃঢ় প্রত্যয়ে বলীয়ান হয়ে নিরন্তর সাধনা ও সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়া। এরপর শায়খ যতোদিন মিসরে ছিলেন বারবার তাঁর সান্নিধ্য পরশে আমরা ধন্য হয়েছি। বিশেষ করে যাদের মিশন ছিলো ইসলামের দাওয়াত– আমি, আহমদ উসসাল, দামিরদাশ মুরাদ, আবদুল্লাহ আকিল এবং আরো অনেকেই।

মিসরে শায়খ নদভীর দিনগুলি ছিলো বড়োই চমৎকার ও বরকতময়– ক্রমবর্ধমান প্রোগ্রামের ব্যস্ততায় ঠাসা। প্রায় প্রতিদিনই তাঁকে ছুটে যেতে হচ্ছিলো এখানে-সেখানে। কখনো বক্তৃতা প্রদানের জন্যে, কখনো নির্ধারিত বিশেষ পাঠদানের জন্যে, কখনো উলামা-মাশায়েখের সাথে সাক্ষাত করার জন্যে।

একদিন তিনি 'দারুশ শুব্বান আল-মুসলিমীন' মিলনায়তনে এক হৃদয়স্পর্শী ভাষণ দিলেন। বিষয় ছিলো : المسلمون على مفرق الطرق (সঙ্কটের ঘূর্ণাবর্তে মুসলামানরা)। পাশাপাশি আরেকটি বিখ্যাত ভাষণের কথাও এ মুহূর্তে আমার মনে পড়ছে। সেটি ছিলো ইসলামের কবি ও দার্শনিক মুহাম্মদ ইকবাল রহ. কে নিয়ে। এই বক্তৃতায় শ্রোতাদের ভিতরে আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছিলো। শায়খ নদভী ইকবালের কবিতার বড়ো ভক্ত ছিলেন। মুগ্ধ বিস্ময়ে তিনি তাঁর কবিতা পড়তেন। তার মাঝে ডুবে যেতেন। ইকবালের কবিতার অসংখ্য শ্লোকও তাঁর মুখস্থ ছিলো। এই মহান কবি ও দার্শনিককে নিয়ে শায়খ নদভী روائع إقبال (Glory of Iqbal—ইকবাল সাহিত্যের নন্দনধারা— নামে একটি অনবদ্য গ্রন্থও লিখেছেন।

এ ছাড়া আরো কয়েকটি শহরে তাঁর বক্তৃতা হয়। নাবরূহ শহরে শায়খ এক ঈমান জাগানিয়া বক্তৃতা প্রদান করেন। রাতে সেখানে শায়খের আহ্বানে এক মসজিদে শবগুযারি হয়েছিলো। অনেক মানুষ তাঁর এই আমলে অংশ নিয়েছিলো এবং তিলাওয়াতে-নফল ইবাদতে ও যিকিরে-ফিকিরে স্বর্গীয় আমেজে স্নাত একটি রাত কাটিয়েছিলাম আমরা।

আরব দুনিয়ার বিভিন্ন সভা, সেমিনার ও বক্তৃতা অনুষ্ঠানে শায়খ নদভী'র আমন্ত্রণ ও অংশগ্রহণ

শায়খ আবুল হাসান আলী নদভী রহ.কে অধিকাংশ আরব দেশের পক্ষ থেকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে বিভিন্ন সভা-সেমিনারে, বিশ্ববিদ্যালয়ে

এবং সংস্থা ও সংঘে। এ ছাড়া প্রশাসনের উচ্চ মহল ও বিভিন্ন মন্ত্রণালয় থেকেও তিনি আমন্ত্রিত হয়েছেন বক্তৃতা প্রদানের জন্যে।

তাঁকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিলো দামেস্ক বিশ্ববিদ্যালয়ের শরীয়া অনুষদের পক্ষ থেকে 'ভিজিটর প্রফেসর' হিসাবে। তখন এ অনুষদের ডীন ছিলেন প্রখ্যাত দাঈ ও ফকীহ্ ডক্টর মোস্তফা আস সিবাঈ রহ.। সেখানে ছাত্রদের উদ্দেশ্যে তিনি যে বক্তৃতামালা উপস্থাপন করেছিলেন, তা-ই পরবর্তীতে رجال الفكر والدعوة في الإسلام সিরিজের প্রথম খণ্ড হিসাবে প্রকাশিত হয়। অনুরূপভাবে আলজেরিয়াস্থ ملتقى الفكر الإسلامي -এর পক্ষ থেকেও তাঁকে জোরালোভাবে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। সেখানে বড়ো হৃদয়ছোঁয়া ভাষায় বক্তব্য দিয়েছিলেন তিনি। সৌভাগ্যক্রমে আমারও সেখানে উপস্থিত থাকার সুযোগ ঘটেছিলো। কাতার বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিলো। কাতার ধর্মমন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকেও তাঁর কাছে আমন্ত্রণ পৌঁছেছিলো। অনুরূপভাবে ধর্মমন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে আয়োজিত 'সুন্নাহ ও সীরাত' বিষয়ক সেমিনারেও তাঁকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিলো, যা অনুষ্ঠিত হয়েছিলো হিজরী ১৫০০ শতককে স্বাগত জানানো উপলক্ষে। তখন সর্বসম্মতিক্রমে তাঁকে সেমিনারের সহ-সভাপতি করা হয়েছিলো। সভাপতিত্ব করেছিলেন তাঁরই সুহৃদ বন্ধু শায়খ আবদুল্লাহ বিন ইবরাহিম আল-আনসারী রহ.। অনুরূপভাবে শায়খকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিলো— মরক্কো, কুয়েত, জর্দান, সংযুক্ত আরব আমিরাতেও। শারজা'র শাসনকর্তা শায়খ ড. সুলতান বিন মুহাম্মদ আল-কাসেমী এবং শারজা'র বিশিষ্ট আলেম ও ইসলামী চিন্তাবিদ শায়খ আবদুল্লাহ বিন আলী আল মাহমুদ রহ. এর সাথে শায়খের বড়ো গভীর সম্পর্ক ছিলো।

নদওয়াতুল উলামা'র ঐতিহাসিক পঁচাশিসালা সম্মেলন

নদওয়াতুল উলামা'র পঁচাশি বছর পূর্তি উপলক্ষে যে ঐতিহাসিক মহা সম্মেলনের আয়োজন করা হয়েছিলো, আরব-আজমে তা বিপুল সাড়া জাগিয়েছিলো। আরব বিশ্বের সাথে শায়খ নদভী'র গভীর ও নিবিড় সম্পর্কের সুবাদে আরব দুনিয়ার শীর্ষ সারির উলামায়ে কেরাম শায়খের

ডাকে সাড়া দিয়েছিলেন ব্যাপকভাবে। যাঁদের শীর্ষভাগে ছিলেন শায়খুল আযহার ইমাম আবদুল হালীম মাহমুদ রহ.।

এ ছাড়া আরো উপস্থিত হয়েছিলেন শায়খ আহমদ আবদুল আযিয আল-মোবারক (সংযুক্ত আরব আমিরাতের শরয়ী আদালতের প্রধান), শায়খ আবদুল্লাহ আনসারী (ইসলামী ঐতিহ্য সংরক্ষণ সংস্থা'র প্রধান, কাতার), শায়খ আবদুল মুয়িজ আবদুস সাত্তার (ইসলামী জ্ঞান গবেষণা সেন্টারের পরিচালক, কাতার)সহ আরো অনেকেই।

শায়খ নদভী'র পীড়াপীড়িতে শায়খুল আযহারকেই এ-বিশাল মাহফিলের সভাপতিত্ব গ্রহণ করতে হয়েছিলো। হাজার হাজার মুসলমানের পাশাপাশি সেখানে অনেক অমুসলিমও অংশ নিয়েছিলো। সব মিলিয়ে নদওয়াতুল উলামা'র আঙিনায় সেদিন বিরাজ করছিলো এক স্বর্গীয় আভা। ভেসে বেড়াচ্ছিলো এক মহা মিলনমেলা ও আনন্দোৎসবের ফুরফুরে আমেজ। ইতিপূর্বে হিন্দুস্তানের মুসলমানরা যা কখনো প্রত্যক্ষ করে নি।

শায়খ আবুল হাসান আলী নদভী রহ.কে আরব দুনিয়া জানতে পেরেছিলো তাঁর অসংখ্য সফরের মধ্য দিয়ে। তাঁর অসংখ্য বক্তৃতার মধ্য দিয়ে। তাঁর বিপুল গ্রন্থ সম্ভারের মধ্য দিয়ে। সর্বোপরি তাঁর ঈমানী দৃঢ়তা ও চরিত্র-সুষমা'র মধ্য দিয়ে। তাই দীনের ভালোবাসায় হৃদয় যাদের আবাদ, উম্মতের চিন্তায় বে-কারার, এমন সব আরবই শায়খ নদভীকে ভালোবাসতে.. শ্রদ্ধার আসনে বসাতে বাধ্য হয়েছিলেন। বাধ্য হবেনই! এ-যে শায়খ নদভী'র ন্যায্য পাওনা! তবু হে শায়খ নদভী! আপনি মানুষের কাছে যা পেয়েছেন, তা আল্লাহ্‌র কাছে যা পাবেন সে তুলনায় কিছুই না। জান্নাতুল ফিরদাউসের শ্রেষ্ঠ মাকামে হোক আপনার ঠিকানা— এই আমাদের নিত্য মুনাজাত!

পঞ্চম অধ্যায়

সায়্যিদ আবুল হাসান আলী নদভী রহ. তাঁর লেখা ও সাহিত্য

> তাঁর লেখার ভাষা সাহিত্যের ভাষা

> ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين এর জন্ম কাহিনী

> ইলম ও জ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় তাঁর অংশগ্রহণ ও বুৎপত্তি

> তাঁর লেখা আরবি কিতাবের তালিকা

পঞ্চম অধ্যায়

আবুল হাসান আলী নদভী রহ.ঃ
তাঁর লেখা ও সাহিত্য

সমকালীন ইসলামী লেখক ও সাহিত্যিকদের মধ্যে আল্লামা আবুল হাসান আলী নদভী রহ. এর নাম সবার আগে উচ্চারিত হয়। ইসলামী শিক্ষা-সংস্কৃতিকে গুরুত্ব দেয় অথচ শায়খ নদভী'র কিতাব তাঁর মাতৃভাষা উর্দূতে কিংবা তাঁর প্রিয়ভাষা আরবীতে অথবা ইংরেজীসহ অন্যান্য অনূদিত ভাষায় পড়ে নি— এমন মানুষ খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। বিশ্বের নানা দেশে.. নানা প্রান্তে ছড়িয়ে-থাকা মুসলমানরা তাঁর কিতাব থেকে উপকৃত হয়ে চলেছে নিরন্তর।

অসংখ্য বিষয়বস্তুতে বিন্যস্ত, বহু শাখা-প্রশাখায় বিস্তৃত বিশ্ব মানবতার দিক দিশারী এক বিশাল 'তাত্ত্বিক-উত্তরাধিকার' তিনি আমাদের জন্যে রেখে গেছেন। লেখালেখি শুরু করেছিলেন তিনি একেবারেই তরুণ বয়সে। লিখেছেন উর্দূদে এবং আরবীতে। উভয় ভাষাতেই তাঁর সমান দখল ও পাণ্ডিত্য। উর্দূতে যখন কলম ধরেছেন তিনি, তখন তাঁর কলম থেকে ঝরে পড়েছে শ্রেষ্ঠ উর্দূ সাহিত্যের ঝরঝরে ও শিল্পিত অভিব্যক্তি। আরবীতে যখন কলম ধরেছেন তিনি, তখন কলম থেকে বেরিয়ে এসেছে আরবী সাহিত্যের হীরে-মোতি-পান্না। বন্ধুরা আমাকে জানিয়েছেন যে, তিনি উর্দূ ভাষায় সাত শতাধিক বিষয়ে কলম ধরেছেন। এর মধ্যে রয়েছে ছোট-বড় গ্রন্থ, পুস্তিকা ও প্রবন্ধ-নিবন্ধ। আর আরবীতে তিনি কলম ধরেছেন একশত সত্তরটিরও বেশি বিষয়ে। এর অধিকাংশই ছোট ছোট কিতাব ও পুস্তিকা হলেও ভাব ও অর্থে এবং তাৎপর্য ও শিক্ষায় বড়, অনেক বড়।

এই যে তাঁর এ-সুপরিসর সৃষ্টি .. সুবিস্তৃত বরং দিগন্ত-ছোঁয়া ইলমী অবদান— কী করে সম্ভব হলো তা? দু'টি কারণে তা সম্ভব হয়েছে।

এক. তাঁকে কর্ম জীবনের বিস্তৃত ও বর্ণাঢ্য পরিসরে কখনো প্রশাসনিক ও ব্যবস্থাপনাগত ভারী দায়িত্ব পালন করতে হয় নি। যা পালন করতে গিয়ে অধিকাংশ উলামায়ে কেরাম লেখালেখির এ-ময়দানে সীমাহীন পিছিয়ে রয়েছেন। কিন্তু শায়খ নদভী রহ. কে নদওয়াতুল উলামা এবং তার

অঙ্গ প্রতিষ্ঠানগুলোর পৃষ্ঠপোষকতা ছাড়া ভারী কোনো দায়িত্ব পালন করতে হয় নি। আর এর জন্যে তাঁকে দীর্ঘ সময় ব্যয় করতে হতো না।

দুই. আল্লাহ তাঁকে কোনো সন্তান দান করেন নি। (আল্লাহর কুদরত ও মহিমা বুঝে— কার সাধ্য?) ফলে ছেলেরা মেয়েরা যেমন প্রায় সারাক্ষণই বাবাকে ঘিরে রাখে .. কলকাকলিতে তাঁর সময়কে প্রায়ই মুখর করে রাখে— তাঁর ক্ষেত্রে এমনটি হয় নি। তাঁর কলম থেকে বেরিয়ে আসা গ্রন্থসম্ভারই তাই তাঁর 'ছেলে-মেয়ে'তে পরিণত হয়েছে! এর ভিতর দিয়েই তিনি বেঁচে থাকবেন চিরকাল— মুসলিম হৃদয়ে .. ইতিহাসের সোনালী পাতায়!!

শায়খ নদভী'র লেখার ভাষা

শায়খ নদভী যে ভাষায় লিখতেন এবং বক্তৃতা দিতেন সে ভাষা ছিলো অতি উন্নতমানের সাহিত্যের ভাষা। তাঁর আরবী কিতাব পড়েছেন যারা কিংবা শুনেছেন তাঁর আরবী ভাষার বক্তৃতা, তারা বুঝতেই পারবেন না যে, তিনি হিন্দুস্তানের মাটি ও বাতাসে বেড়ে-ওঠা একজন অনারব। তাঁর আরবী ভাষা ও সাহিত্যের ব্যাপারে এটাই আমার অকপট অনুভূতি। আর উর্দূ! হিন্দুস্তানের বন্ধুদের মুখে আমি শুনেছি, খ্যতনামা উর্দূ সাহিত্যিকদের মধ্যে তিনিও একজন। উর্দূ সাহিত্যের একজন খ্যাতনামা দিকপাল হবেন তিনি— এটা একেরারেই স্বাভাবিক ও প্রত্যাশিত। কিন্তু আরবী ভাষা ও সাহিত্য! এখানেও যে তিনি সেই খ্যাতিমানদের সারিতে দাঁড়িয়ে আছেন, যারা 'ঝড়' তোলেন মানুষের চিন্তায়-চেতনায়-অনুভবে নিজেদের কথার লালিত্য ও ভাষার চমৎকারিত্ব দিয়ে!! কী করে অর্জন করলেন শায়খ নদভী আরবী সাহিত্যে এই উচ্ছল গতিধারা ও চিত্তাকর্ষক অলংকার? প্রাণরস-সিক্ত এই সাবলীলতা?!

তাঁকে স্বীকৃতি দিয়েছেন আরবী ভাষার শীর্ষ সারির সাহিত্যিকরা। সবার সেই অকপট স্বীকৃতির কথা এ-অল্প পরিসরে উল্লেখ করা সম্ভব নয়। শুধু আরব দুনিয়ার সাহিত্য-সূর্য অমর কথাশিল্পী শায়খ আলী তানতাভী'র করাই যথেষ্ট মনে করছি। তিনি শায়খ নদভী'র مختارات من أدب العرب গ্রন্থের ভূমিকায় বলেছেন:

قد يشتغل غير العربي بعلوم العربية حتى يكون إماما فيها، في اللغة والنحو، والصرف والاشتقاق، وفي سعة الرواية، بل إن أكثر علماء العربية كانوا في الواقع من غير العرب، ولكن من النادر أن يكون فيهم من لهم هذا الذوق الأدبي الذي نعرفه لأبي الحسن، فلو لم تثبت عربيته بصحة النسب لثبتت بأصالة الأدب

'কখনো কখনো দেখা যায় অনারবরাও আরবী ভাষাতত্ত্ব অর্থাৎ আরবী ভাষা, বাক্য-বিন্যাস, শব্দতত্ত্ব, শব্দের উৎপত্তি ইত্যাদি নিয়ে কাজ করেন, গবেষণা করেন। বরং আরবী ভাষাতাত্ত্বিকদের মধ্যে অনারবদের সংখ্যাই বেশি। কিন্তু অনারবদের কারো ভিতরে আরবী সাহিত্যের সূক্ষ্ম রুচিবোধ ও বর্ণিল অবয়বও যে পরিলক্ষিত হতে পারে— এমনটা তো সচরাচর লক্ষ্য করা যায় না! দুর্লভ ব্যতিক্রম এ ক্ষেত্রে— আবুল হাসান আলী নদভী! সত্যি কথা বলতে কি, বিশুদ্ধ ও নির্ভেজাল বংশ পরম্পরায় তাঁর 'আরব বংশধারা' প্রমাণিত যদি নাও হতো, তবুও তিনি আরব হিসাবে স্বীকৃতি পেয়ে যেতেন অনায়াসে— আরবী সাহিত্যে তাঁর সাবলীল পদচারণা ও বর্ণিল অবদানের জন্যে!'

এ ক্ষেত্রে তাঁর প্রথম ও শ্রেষ্ঠ অবদান হলো-
তাঁর অনন্য সেই গ্রন্থ,
তাঁর সেই কালজয়ী গ্রন্থ,
তাঁর সেই বর্ণিল কথামালা,
তাঁর সেই সুবিন্যস্ত পঙক্তিমালা,
তাঁর সুসংহত সেই শব্দচিত্র,
তাঁর 'মানবতাকে নিবেদিত' সেই শব্দময় বিলাপগাথা—

ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين.

যাঁর মাধ্যমে আরব দুনিয়া তাঁকে চিনেছে, জেনেছে এবং স্বীকৃতি দিতে বাধ্য হয়েছে। আরব দুনিয়ায় তাঁর আগেই তাঁর দূত হয়ে যা সাড়া জাগিয়েছে, তাঁর সঠিক পরিচয় তুলে ধরেছে। সেখানে তাঁর জন্যে দৃঢ় অবস্থান তৈরী করেছে।

এ কিতাব সম্পর্কে এখানে কিছু বলতেই হয়। জানতেই হয় এই অমর গ্রন্থের জন্ম-কাহিনী। সূচনা-ইতিহাস। জানতে বড়ো ইচ্ছে হয়, কেনো এবং কীভাবে লেখক তাঁর লেখক-জীবনের সূচনাতেই এই 'অমাড়ানো পথে' পথ

চলার সিদ্ধান্ত নিলেন! কিন্তু সে-কথা আমি আমার ভাষায় বলবো না— বলবো লেখকের নিজের ভাষায়! তাঁর শক্তিশালী কলমের বর্ণময় ছন্দোময় ভাষায়!!

ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين

(মুসলমানদের অধঃপতনে বিশ্ব কী হারালো)
শায়খ নদভী'র ভাষায় এ-কিতাবের জন্ম কাহিনী

তিনি বলেন:

'অনেক পাঠকই হয়ত জানেন না যে, এটিই আমার প্রথম বই। আমার লেখালেখির সূচনা-ইতিহাস এখান থেকেই শুরু। এ-বই যখন আমি লিখে শেষ করি, তখন সবেমাত্র আমি ত্রিশ পেরিয়েছি। বয়স যেমন কাঁচা অভিজ্ঞতাও তেমনি কাঁচা। অথচ কাজটা ছিলো বড়োই দুরূহ। তাও আবার নিজের মাতৃভাষা উর্দূতে নয়— আরবীতে, এবং এমন দেশে বসে, যা শুধু ভৌগলিকভাবেই আরব দুনিয়া থেকে দূরে নয়, আরবী ভাষা ও সাহিত্য এবং সভ্যতা ও সংস্কৃতি থেকেও অনেক অনেক দুরে। আমি জন্মেছি হিন্দুস্তানে। বড় হয়েছি হিন্দুস্তানে। পড়ালেখাও করেছি হিন্দুস্তানে। তখন পর্যন্ত হিন্দুস্তানের বাইরে একটা সফরেরও সুযোগ হয় নি। হজ্বব্রত পালনের উদ্দেশ্যে ১৯৪৭ সালে প্রথম যে-সফরটা হয়েছিলো, তাও এ-কিতাব লেখার তিন বছর পর। সত্যি কথা হলো, এ ছিলো এক দুঃসাহসিক ইলমী অভিযান, বিশেষ কোনো প্রস্তুতি ছাড়াই। এমন একটি গভীর বিষয়ে কলম ধরা— সত্যিই দুঃসাহসিকতা। এর জন্যে প্রয়োজন ছিলো—

এমন একটি কলম, যা আমার কলমের চেয়ে শক্তিশালী ও ক্ষুরধার,
এমন জ্ঞান ও প্রজ্ঞার,
যা আমার জ্ঞান ও প্রজ্ঞার চেয়ে দৃঢ়মূল ও পরিপক্ক,
এমন অভিজ্ঞতার, যা আমার অভিজ্ঞতার চেয়ে দীর্ঘ ও সমৃদ্ধ—
একজন লেখক হিসাবে। কিন্তু আল্লাহ যা চান তা-ই করেন,
তা-ই হয়।
তা-ই হয়েছে।

এক প্রচণ্ড আগ্রহবোধ আমার মনকে আলোড়িত করছিলো। পেছনে সরে আসতে চেয়েছি, পারি নি। বারবার চেয়েছি, বারবারই পরাস্ত হয়েছি।

কে যেনো আমাকে প্রচণ্ডভাবে কেবল টানছিলো, আকর্ষণ করছিলো। কিন্তু আমার কলমের দুর্বলতা, আমার জ্ঞান ও প্রজ্ঞার অপরিপক্কতা এবং আমার অভিজ্ঞতার দৈন্যদশা— কিছুই আমাকে ফেরাতে পারলো না। আমি 'যন্ত্রচালিত' হয়ে যেনো এগিয়ে যাচ্ছিলাম।

তখন যদি আমার বিবেকের সাথে একটু বোঝাপড়ায় বসতাম, কিংবা লেখকদের অভিজ্ঞতার কথা ভাবতাম, কিংবা তাঁদের ইলমী যোগ্যতা ও প্রাচুর্যের উপর নির্ভর করতাম, তাহলে আমাকে অবশ্যই পিছিয়ে আসতে হতো। আর যদি জ্ঞানী-গুণি, আলেম-উলামা কিংবা লেখক-সাহিত্যিকদের সাথে পরামর্শ করতাম, তাহলে সন্দেহাতীতভাবেই বলা যায় যে, তাঁরা আমাকে (প্রস্তুতি ছাড়া এক অনভিজ্ঞ ও আনাড়ি যোদ্ধা হিসাবে) এই তাত্ত্বিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক লড়াইয়ের ময়দান থেকে নিরাপদে 'ঘরে ফিরে যাওয়ার' পরামর্শ দিতেন। কিন্তু খুব ভালো হয়েছে যে, তেমন কারো সাথেই পরামর্শ করি নি!

* * *

এ-কিতাব প্রস্তুত করার জন্যে যে সব আরবী বরাতগ্রন্থ দেখা অপরিহার্য ছিলো তা ছিলো খুবই অপ্রতুল। সময়টা ছিলো দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী সময়। তখন চাইলেই সবকিছু হাতের নাগালে পাওয়া সম্ভব ছিলো না। আরব দুনিয়া এবং হিন্দুস্তানের মাঝে যোগাযোগ ধরতে গেলে বিচ্ছিন্নই ছিলো। হিন্দুস্তানে যে-সব ইলমী ও তাত্ত্বিক উপাদান, ঐতিহাসিক বরাত গ্রন্থ এবং সভ্যতা-সংস্কৃতি বিষয়ক গ্রন্থ পাওয়া যেতো, তা প্রয়োজনের তুলনায় ছিলো খুবই কম ও অপ্রতুল। অথচ আরব দুনিয়ায় কোনো কমতি ছিলো না। সবকিছুই একেবারে হাতের নাগালে। বিশেষত মিসর ছিলো এ-ধরনের গ্রন্থ সম্ভারের কেন্দ্র। সেখানকার লাইব্রেরীগুলো ছিলো এ-ধরনের বিষয়ে সমৃদ্ধ—কানায় কানায় পূর্ণ। তবে ইংরেজী ও উর্দূ ভাষায় এখানে তাত্ত্বিক বরাতগ্রন্থের কোনো অপর্যাপ্ততা ছিলো না। আর তা আমার হাতের নাগালেও ছিলো। লখনৌ ছিলো ইতিহাস-খ্যাত জ্ঞান ও সংস্কৃতির শহর। এখানে এমন সব সমৃদ্ধ লাইব্রেরী ছিলো, যাতে নিত্য নতুন ইংরেজী প্রকাশনাও প্রকাশ পাওয়ার প্রায় সাথে সাথেই এসে পৌঁছে যেতো। এবং সেখানে ইংরেজী ভাষায় 'ইনসাইক্লোপিডিয়া'ও বিদ্যমান ছিলো। আমি লখনৌ'র এ-লাইব্রেরীগুলোতে প্রায় নিয়মিতই যাতায়াত শুরু করলাম। কোনো কোনো কিতাব ধার নিয়ে এসে ঘরে বসে বসেও পড়তে লাগলাম।

এ ছাড়া পারিবারিক লাইব্রেরী থেকেও ভালো ফল তুলে নিচ্ছিলাম। এ সবকিছু মিলিয়েই এ-কিতাব রচনার একটা চমৎকার আনুকূল্য তৈরী হতে লাগলো। (নাকি তৈরী করে নিতে লাগলাম!) আল্লাহ্‌র মেহেরবানীতে সবকিছুই সহজ মনে হতে লাগলো। এদিকে ইউরোপীয় সম্প্রদায়ের রাজনৈতিক, সামাজিক, ধর্মীয়, নৈতিক ও সভ্যতা-সাংস্কৃতিক ইতিহাসও প্রবল উৎসাহ নিয়ে আগাগোড়া পড়তে হয়েছে। তবে ধর্ম ও বিজ্ঞানের এবং প্রশাসন ও গির্জার মধ্যকার দ্বন্দ্ব-সংঘাতের দিকটিই আমার কাছে মুখ্য ছিলো। পাশাপাশি ইউরোপের নৈতিকতার ইতিহাস এবং তার ক্রমবিকাশ ও তার কার্যকারণ সম্পর্কেও আমাকে প্রচুর পড়াশুনা করতে হয়েছে। ক্রমবিকাশের এ-ধারা ইউরোপের নৈতিকতার ইতিহাসকে একেবারে নতুন ধাঁচে ঢেলে সাজিয়েছিলো। ফলশ্রুতিতে যা বর্তমান বস্তুবাদী পরিণতিতে এসে রূপ পরিগ্রহ করেছে এবং প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের জীবনধারা ও মন-মানসে গভীর প্রভাব বিস্তার করেছে।

আমাকে আরো পড়তে হয়েছে প্রাচ্য ও মুসলিম দেশসমূহের ইতিহাস। তার ধর্ম-দর্শনের ইতিহাস। ইসলাম ও মুসলমানদের ইতিহাস। জাহিলী-ইসলামী যুগ-কেন্দ্রিক আরবদের ইতিহাস। এ-সব জানতে আমাকে যেমন পড়তে হয়েছে সংশ্লিষ্ট বিষয়ের বিশিষ্ট গ্রন্থাবলী, তেমনি পড়তে হয়েছে আরবী কবিতা ও সাহিত্য। আর তুলনামূলকভাবে এ-সব পাঠোধ্যয়ন আমার জন্যে ছিলো অনেক সহজ। কেননা আমার শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল বিস্তৃত ছিলো যুগপৎভাবে— ধর্ম-বিজ্ঞান, ইতিহাস-দর্শন ও সাহিত্যকে কেন্দ্র করে। তা ছাড়া সংশ্লিষ্ট বিষয়ের এ-সব গ্রন্থাবলীর জন্যে আমাকে ছুটে বেড়াতে হয় নি, সবই ছিলো প্রায় আমার হাতের নাগালে। ছিলো নদওয়াতুল উলামা'র সমৃদ্ধ লাইব্রেরী। ছিলো অন্যান্য পারিবারিক লাইব্রেরী। তা ছাড়া ভারত উপমহাদেশের অনুবাদ, সংকলন ও প্রকাশনা জগতের সাথেও আমার একটা নিবিড় যোগাযোগ ছিলো, সার্বক্ষণিক ও অবিচ্ছিন্ন। ফলে গবেষণাধর্মী উন্নত মানের পত্র-পত্রিকাসহ যা কিছুই প্রকাশ পেতো, খুব সহজেই আমি তা সংগ্রহ করে নিতাম।

পাশাপাশি সহায়ক ভূমিকা পালন করেছিলো আমার স্বতন্ত্র বুদ্ধি ও মনোবৃত্তিক গঠন, ইসলামের শাশ্বত নীতি-আদর্শের প্রতি এবং মানব প্রজন্মকে সঠিক পথের দিশাদানে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-

এর নেতৃত্ব ও ইমামতির প্রতি আমার অটল অবিচল আস্থা ও বিশ্বাস। আর এ-চিন্তা-দর্শনের কারণেই আমার ভিতরে এ-বিশ্বাসবোধও জোরালোভাবে কাজ করছিলো যে, পাশ্চাত্য সভ্যতা-সংস্কৃতির প্রকৃতিতে এবং পাশ্চাত্য শিবিরের মন-মানসেই রয়েছে অসম্পূর্ণতা ও শূন্যতা, যা অবিচ্ছিন্নভাবে মিশে আছে তাদের সর্বসত্ত্বার সাথে। যা ভয়ঙ্কররূপে কায়িত হয় তাদের শাসনে-ত্রাসনে-নেতৃত্বে।

আর লক্ষ্য স্থির করে এই যে এতোটা পথ আসতে পারা— এতে আমার কোনো কৃতিত্ব নেই। সবটুকু কৃতিত্ব যাঁর, তিনি আমার শ্রদ্ধেয় বড় ভাই নদওয়াতুল উলামা'র রেক্টর সায়্যিদ আবদুল আলী হাসানী রহ.। তাঁর মাঝে অনন্য সম্মিলন ঘটেছিলো ইসলামী ও আধুনিক সভ্যতার। ইসলামকে অনুধাবন করেছিলেন তিনি তার মর্মমূলে প্রবেশ করে। তাঁর চিন্তা-দর্শন ছিলো খুবই ভারসাম্যপূর্ণ। বাড়াবাড়ি ও কট্টরপন্থা থেকে অনেক দূরে।

যাই হোক; এ ভাবে আমি আমার বিভিন্নমুখী পড়াশুনা থেকে উপকৃত হতে লাগলাম। —যা ছিলো কখনো কখনো পরস্পর বিরোধী এবং চিন্তা জগতের নবীনত্ব কাটিয়ে উঠতে না-পারা পাঠকের জন্যে অস্বস্তিকর— কিন্তু আমি আমার কাঙ্খিত ও ইতিবাচক ফলাফল অনায়াসে বের করে নিয়ে আসতে পারছিলাম। অবাক হওয়ার মতো বিষয়ই বটে! কী থেকে কী বেরিয়ে আসে!!

مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَناً خَالِصاً سَائِغاً لِلشَّارِبِين.

'গোবর ও রক্তের মাঝ থেকে নি:সৃত খাঁটি দুধ, যা পানকারীদের জন্যে উপাদেয়।' -নাহল: ৬৬

এ-ইতিবাচকতার বাগান থেকেই ফুল কুড়াতে-কুড়াতে সর্বযুগে সর্বকালে ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব এবং ইসলামের নেতৃত্বের উপযুক্ততার প্রতি আমার আস্থা ও বিশ্বাস অনেক বেড়ে গেলো। আমার মন ফুঁড়ে বেরিয়ে এলো এ-দ্যুতিত বিশ্বাস: হ্যাঁ .. মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামই শেষ নবী। তিনিই সবার ইমাম ও পথ প্রদর্শক। তাঁর-দেখানো পথ ছাড়া কোথাও নেই আলো।

আমি জানতাম কিতাবের বিষয়বস্তু কতো গভীর ও ঝুঁকিপূর্ণ এবং কী নতুন ও অভিনব। উপায়-উপকরণ তো একেবারেই কম। বয়সটাও একেবারেই কাঁচা। সাহায্য-সহযোগীও একদম হাতে-গোনা। তবুও আমি পেছনে ফিরে আসতে পারলাম না। ফিরে আসার পথও ছিলো না। এক

অজানা শক্তি যেনো আমাকে সামনে টেনে নিয়ে যাচ্ছিলো প্রবল গতিতে। কার ইশারা পেয়ে যেনো আমার বিবেক আমার কানে কানে বারবার ফিসফিস করে বলছিলো : 'এগিয়ে যেতে হবে। অবশ্যই এগিয়ে যেতে হবে। এমন একটা কিতাব যে বড়ো প্রয়োজন!'

আগেই বলেছি কিতাবের বিষয়বস্তু বড়ো নতুন ও অভিনব। ফলে তা অনেকেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে এবং অনেকের ভিতরেই বিস্ময়বোধ সৃষ্টি করেছে। ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين (মাযা খাসিরাল আলামু বিনহিতাতিল মুসলিমীন!) এই শিরোনামকে সামনে রেখে প্রশ্ন জাগে: বিশ্ব মানবতা ও বিশ্ব পরিস্থিতির পরিণতির সাথে মুসলমানদের সত্যিই কি কোনো গভীর সম্পর্ক আছে? .. থাকলে না হয় বলা যেতো— ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين (মুসলমানদের অধঃপতনে বিশ্ব কী হারালো?)! অথবা এ প্রশ্নও জাগে : মুসলমানদের অগ্রগতি ও উন্নতিতে এবং মুসলমানরা যদি মানবতার নেতৃত্ব ও কর্তৃত্বভার কাঁধে তুলে নেয়, তাহলে বিশ্ব কি সত্যি লাভবান হবে? কী ধরনের লাভবান হবে? কোন্ সে সুফল বয়ে আনবে?

এ-কিতাব-রচনাকালে এবং তার পূর্ববর্তী সময়ে সাধারণভাবে মুসলমানদেরকে বিচার করা হতো বিশ্ব-ইতিহাসের-বিচারে। তাদেরকে ভাবা হতো অন্যান্য জাতি ও সম্প্রদায়ের মতোই একটি জাতি ও সম্প্রদায়। লেখক এই গন্ডিবদ্ধ সীমানা অতিক্রম করেছেন সাহসিকতার সঙ্গে এবং বেরিয়ে এসেছেন আরব-আজমের লেখকদের উপর চাপিয়ে-দেয়া এ-প্রচলিত সীমানা ও আওতা থেকে। সুতরাং লেখক বিশ্বকে বিচার করতে চান মুসলমানদের অবস্থার আলোকে অর্থাৎ তাদের উত্থান-পতনের আলোকে। এ-দুই প্রেক্ষিতের মাঝে কোনো মিল নেই। একেবারে বৈপরিত্যের সম্পর্ক। আগের ধারণায় বিশ্ব ছিলো মানদণ্ড— মুসলমানদেরকে বিচার করার জন্যে, আর লেখকের বিশ্লেষণে বিশ্ব বিচারের মানদণ্ড হলো— মুসলমানরা। অর্থাৎ আগের বিবেচনায় মুসলমানরা অন্যান্য জাতি-গোষ্ঠির মতোই একটি জাতি-গোষ্ঠি। বিশ্ব প্রেক্ষাপটে যা কিছুই ঘটবে তা মুসলমানদেরকে নতশিরে মেনে নিতে হবে। বিষয়টা আরেকটু খোলাসা করে বললে বলা যায়— আগের বিবেচনায় মুসলমানদেরকে বিচার করার ধারা ও পন্থাটা ছিলো এমন— 'এ ঘটনা'র কারণে কিংবা 'সে সাম্রাজ্য'-এর পতনে মুসলমানরা কী হারালো? কী পরিমাণ ক্ষতিগ্রস্ত হলো? পাশ্চাত্যের

শিল্প-বিপ্লবের ফলেই বা তাদের কী ক্ষতি হলো? মুসলমানদের অনেক কেল্লা ও দূর্গ যে পাশ্চাত্য দখল করে নিয়েছে,তাতেই বা কী পরিমাণ ক্ষতিগ্রস্ত হলো তারা? অর্থনৈতিক সঙ্কটে, রাজনৈতিক দৈন্যে এবং সমরশক্তির অপ্রতুলতায় কী পরিমাণ ক্ষতির মুখোমুখি হয়েছে মুসলমানরা?....

হ্যাঁ .. এভাবেই 'অন্য মানুষ' ভাবতো এবং মুসলমানদেরকে বিচার করতো। কিন্তু আল্লাহ আমার হৃদয়-মন খুলে দিলেন। অবস্থান নিলাম আমি বিপরীতে। ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين নিয়ে লেখার তীব্র আকর্ষণ ও দায় অনুভব করলাম। বারবার আমার বিবেকের পর্দায় দোল দিয়ে যেতে লাগলো এ জিজ্ঞাসা—

ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين

ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين

ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين

মুসলমানদের অধঃপতনে বিশ্ব কী হারালো?!

মুসলমানদের অধঃপতনে বিশ্ব কী হারালো?!

মুসলমানদের অধঃপতনে বিশ্ব কী হারালো?!

এ-জিজ্ঞাসায় যেনো জীবন্ত হয়ে উঠেছে যে, মুসলমানরাই বিশ্বব্যাপী সবকিছুতে প্রভাব বিস্তারকারী জাতি। নির্দিষ্ট কোনো ভৌগলিক সীমানায় নয়, নির্দিষ্ট কোনো দেশে নয়, মুসলমানরা কি বিশ্ব প্রেক্ষিতেই এমন অবস্থানে নেই, যাতে অনায়াসে বলা যেতে পারে— 'নিশ্চয়ই পৃথিবী মুসলমানদের অধঃপতনে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে? নিশ্চয়ই পৃথিবী কিছুটা হলেও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে— বিশ্ব নেতৃত্ব থেকে মুসলমানদের ছিটকে পড়ার কারণে।' আমার আশঙ্কা, অনেক লেখকই —তাঁদের অনেক অবদান ও কীর্তি সত্ত্বেও— মুসলমানদেরকে মানদণ্ডের এ-আসনটাতে বসাতে ব্যর্থ হয়েছেন। এ-দিকটা নিয়ে তারা একটু ভাবেন নি পর্যন্ত। লেখক-গবেষকদের এ-একদেশদর্শিতার কারণ আসলে কী?... মূলত ইসলামী ইতিহাসের বিকৃতি, সঙ্কীর্ণ দৃষ্টিকোণ থেকে ইসলামের ইতিহাসকে বিচার-বিশ্লেষণ, সংস্কৃতিমনা নতুন প্রজন্মের ভিতরে ইসলামী ইতিহাস-ঐতিহ্যের প্রবল শূন্যতা ও দৈন্যই অনেক লেখক-গবেষককে সত্যচ্যুত করেছে। ফলে তারা মুসলমানদের সঙ্কট ও সমস্যার মাঝে এবং

বিশ্ব ও মানবতার সঙ্কট ও সমস্যার মাঝে গভীর যোগসূত্র থাকা সত্ত্বেও তা চিহ্নিত করতে নিদারুণভাবে ব্যর্থ হয়েছেন। তারা অজানা হীনমন্যতার নির্মম শিকার হয়ে কেবলি ভাবছেন : কোথায় বিশ্ব নেতৃত্ব আর কোথায় পড়ে আছে মুসলমানরা! দারিদ্রের কষাঘাতে তারা জর্জরিত। দুর্বলতা কখনোই তাদের পিছু ছাড়ছে না। পাশ্চাত্যের দাসত্ব থেকেও তো তারা বেরিয়ে আসতে পারছে না। আধুনিকতার জোয়ার ও বিপ্লবের সামনেও তারা একেবারে গা ভাসিয়ে-দেয়া এক জাতি।.... তাহলে 'বিশ্ব পরিণতি' বা 'মানবতার পরিণতি'কে মুসলমানদের পরিণতির সাথে জুড়ে দেয়া কি আদৌ সমীচীন ও সঙ্গত?

না! অনেক মানুষই তখন বিশ্বাস করতে পারতো না যে, মুসলমানদের রয়েছে একটা গুরুত্ব ও সম্মান এবং প্রভাব ও অবস্থান। এ-দৃষ্টিকোণ থেকে অবশ্যই মুসলমানদেরকে নিয়ে একটি পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণধর্মী গ্রন্থ প্রণয়ন ছিলো— সময়ের দাবি। কোনো লেখক যদি সাহস করে এ-বিষয়ে কোনো কিতাব প্রণয়ন করতে চান, তাহলে অবশ্যই তিনি সাধুবাদ পাওয়ার উপযুক্ত। যে-কিতাবে আলোচিত হবে মুসলমানদের অধঃপতনের কারণে বিশ্ব মানবতা ও সাম্প্রতিক বিশ্ব কী পরিমাণ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। নি:সন্দেহে বিষয়টা খুবই নাজুক ও ঝুঁকিপূর্ণ এবং তাত্ত্বিকতার গভীর অরণ্যে-ঢাকা এক ধরনের দু:সাহসিক অভিযান। কিন্তু আল্লাহ সাহায্য করলেন। আল্লাহ চাইলে কী না হয়? পাথর থেকেও তো পানি নির্গত হয়!

দ্বিধা ও ভয় নিয়ে এক সময় লেখার কাজ শেষ করলাম। কারণ লেখার জগতে আমি একেবারেই নবীন। বিশেষত আরবী ভাষায়।[১] আরবী ভাষার সাথে আমার সম্পর্ক ছিলো এমন এক ছাত্রের, আরবী ভাষা ও সংস্কৃতি এবং ইসলামী জ্ঞানের প্রাণকেন্দ্র থেকে বিচ্ছিন্ন অনেক দূর-দুনিয়ায় যার জন্ম ও বসবাস। এ জন্যেই বারবার আমার মনে তলোয়ার হাতে লড়াকু বেশে উদয় হচ্ছে এই সন্দেহ : সুদূর আরব মুলুকের ইসলামী মনীষীদের কাছে এ-কিতাব পাবে কি কোনো গ্রহণযোগ্যতা ও সমাদৃতি?

এর মধ্যে আমি একটা কাজ করলাম। মিসরের নামকরা প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান لجنة التأليف والترجمة والنشر (সংকলন, অনুবাদ ও প্রকাশনা পরিষদ)

---

[১] এই বই লেখার পূর্বে লেখকের দু'টি শিশুতোষ সিরিজ القراءة الراشدة ১, ২, ৩ ও قصص النبيين ১, ২ এবং مختارات من أدب العرب প্রকাশিত হয়। এ সবই পাঠ্য কিতাব। যা প্রণীত হয়েছিলো মুসলিম শিশু-কিশোরদের আরবী ভাষা ও সাহিত্যের পাঠ্য হিসাবে।

বরাবর কিতাবের বিষয়বস্তুর ধারাবিন্যাস ও বিষয়সূচীটা পাঠিয়ে দিলাম। মিসরের প্রখ্যাত লেখক ও গবেষক 'আরবলীগ'-এর সংস্কৃতি বিভাগের প্রধান ড. আহমদ আমীন ছিলেন এই পরিষদের চেয়ারম্যান। উল্লেখ্য যে, তাঁর বই ছিলো ব্যাপকভাবে পাঠকনন্দিত। বিশেষত فجر الإسلام (ইসলামের ঊষা) এবং ضحى الإسلام (ইসলামের সকাল) সিরিজদ্বয় বোদ্ধা মহলে বেশ সাড়া জাগিয়েছিলো। আমি নিজেও তার মুগ্ধ পাঠক। গভীর অভিনিবেশ ও মুগ্ধতা নিয়ে তা আমি পড়ে শেষ করেছি। কিছু কিছু জায়গা ছাড়া সবক্ষেত্রেই আমি তাঁর মতামতের সাথে ঐকমত্য প্রকাশ করে মন্তব্য করেছি। বড়ো দক্ষ কলম সৈনিক ছিলেন তিনি। মানুষের সহজাত কামনা-বাসনার সাথে একীভূত হয়ে স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে দেদীপ্যমান ভাষায় তিনি লিখতেন। আমি মনে প্রাণেই আশা করছিলাম তাঁর প্রতিষ্ঠান থেকেই কিতাবটা বের হোক। কেননা আরব জাহান জুড়ে এ-প্রতিষ্ঠানের যেমন একটা গুরুত্ব ছিলো তেমনি এখান থেকে প্রকাশিত সকল কিতাবেরই আলাদা একটা তাত্ত্বিক মূল্যায়ন ছিলো। এখান থেকে প্রকাশিত বই পড়ার জন্যে শিক্ষিত যুবশ্রেণী উদগ্রীব অপেক্ষায় বসে-বসে প্রহর গোনে চলে। যাইহোক; বিষয়সূচিটা তাঁর কাছে পাঠিয়ে তো দিলাম, কিন্তু পরে আর কোনো খোঁজ-খবর নিতে পারলাম না। ফলে জানতেও পারলাম না এর ভাগ্যে কী ঘটেছে। নেতিবাচক কিছু ঘটলেও অবাক হওয়ার কিছুই নেই। কারণ এ-কিতাবের লেখক একদম অজানা। (আরব মুলুকে তখন তার কোনো পরিচিতি ছিলো না।) জ্ঞান-গবেষণায়ও তার বিশেষ কোনো অবদান নেই। তার কোনো সুপারিশকারীও নেই। তার পক্ষে উচ্চারিত হয় নি কোনো প্রশংসাবাণীও। তার উদ্দেশ্যে লিখিত হয় নি কোনো স্তুতিবাক্যও।

কিন্তু তবুও একদিন সব দ্বিধা-দ্বন্দ্ব দূর হয়ে গেলো। সরে গেলো অনিশ্চয়তার পর্দা। উন্মোচিত হলো আশার রাঙা প্রভাত। চিঠি পেলাম ড. আহমদ আমিনের হঠাৎ করেই। বিষয়সূচিতে আশ্বস্ত হয়ে এবার তিনি কিতাবের নমুনা চেয়ে পাঠালেন। আশা-নিরাশায় দুলতে দুলতে পাঠিয়ে দিলাম কিতাবের একটা ছোট্ট অংশ।

কিতাবের বিষয়বস্তু, বিষয়বস্তুর উপর আলোকবর্ষণকারী শিরোনাম-উপশিরোনামসমূহ এবং অন্যান্য আলোচনা ড. আমিনকে প্রভাবিত করলো। কিন্তু যে কারণে তিনি চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিতে দ্বিধায় ভুগছিলেন তা হলো— এ-কিতাব বের হয়ে এসেছে এক ধর্মীয় আলেমের

কলম থেকে। পাশ্চাত্য দুনিয়ার প্রভাবমুক্ত বহু দূর-দুনিয়ায় যিনি বড় হয়েছেন, শিক্ষিত হয়েছেন। সুতরাং লেখক যে প্রাচীনধারার দীনি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের গণ্ডিবদ্ধ ভাষা-সংস্কৃতির নিগড়ে বন্দি হয়ে আছেন তা প্রায় নিশ্চিত বলেই ধরে নেয়া যায়। যেমন এখানে আল-আযহার ও অন্যান্য প্রাচীনপন্থী দীনি প্রতিষ্ঠানের উলামায়ে কেরামের ভিতরে পরিলক্ষিত হয়। ড. আমিন তাই আমাকে জিজ্ঞাসাই করে বসলেন— 'লেখক কি বাইরের (পাশ্চাত্যের) বরাতগ্রন্থসমূহ থেকেও উপকৃত হয়েছেন?' জবাবে লেখক যখন 'হ্যাঁ' বললেন এবং বিভিন্ন ইংরেজি বরাতগ্রন্থের একটি তালিকাও তাঁর কাছে পাঠিয়ে দিলেন তখন তিনি বেশ আশ্বস্ত হলেন। জানিয়ে দিলেন— তাঁর সংস্থা থেকে শিগগিরই বইটি প্রকাশিত হচ্ছে। পাশাপাশি বইটির শিল্প ও তাত্ত্বিক মান সম্পর্কেও নিজের মুগ্ধতার কথা লেখককে জানালেন।

যে দিন ড. আমিনের পক্ষ থেকে এ-বার্তা নিয়ে চিঠিটা এসেছিলো, সে দিনটা ছিলো আমার জীবনের আনন্দ ও উচ্ছ্বাসমাখা একটি বিশেষ দিন। আজো লেখকের মনে তা আনন্দোচ্ছ্বাসের ঢেউ তোলে। কান পাতলেই লেখক যেনো শুনতে পায় সে ঢেউয়ের আনন্দ-খেলানো গর্জন!

এরপর কেটে গেলো কয়েক মাস। তখনো আমি জানি না, বইটি আলোর মুখ দেখেছে কি না। তখন সময়টা ছিলো ১৩৬৯ হিজরী। (১৯৫১ সালের জানুয়ারী মাস।) আমি মক্কায় অবস্থান করছিলাম। এখানে বসেই সিদ্ধান্ত নিলাম মিসর সফরের। পাশাপাশি সিরিয়া। আমি ভিসার জন্যে সিরিয়ার দূতাবাসে গেলাম। খুব সহজেই ভিসা পেয়ে গেলাম। দূতাবাস ছেড়ে বের হওয়ার মুহূর্তে ভাবলাম, রাষ্ট্রদূতের সাথে একটু দেখা করে যাই। তখন রাষ্ট্রদূত ছিলেন অধ্যাপক জাওয়াদ মুরাবিত। বড়ো পণ্ডিত মানুষ ছিলেন তিনি। শিল্প-সাহিত্যের সাথেও ছিলো তাঁর গভীর সম্পর্ক। অল্প সময়েই আমরা ডাক পেলাম। হাজির হলাম উপরে তাঁর কাছে। অনেক বিষয় নিয়েই সেদিন তাঁর সাথে কথা হয়েছিলো। এক পর্যায়ে মিসরের কবি-সাহিত্যিক ও লেখকদের নিয়েও কথা শুরু হলো। আলোচনা ক্রমেই প্রাণবন্ত ও উপভোগ্য হয়ে উঠলো। হঠাৎ তিনি বললেন : 'হিন্দুস্তানের উলামা ও লেখকদের লেখায় যে প্রভাব ও হৃদয়গ্রাহিতা আমি লক্ষ্য করেছি তা এখানে আমি খুঁজে পাই না। যেমন কিছুদিন আগে আমি মিসর গিয়েছিলাম। দেখলাম এক বিক্রয়কেন্দ্রে একটা বই রাখা। নাম ماذا خسر

العالم بانحطاط المسلمين (মুসলমানদের অধঃপতনে বিশ্ব কী হারালো?)। আমি তা সংগ্রহ করে পড়লাম। ভীষণ মুগ্ধ হলাম। প্রভাবিত হলাম।' রাষ্ট্রদূতের মুখে এ-কথা শুনে আমার মনে বিদ্যুত খেলে গেলো! বড়ো ব্যগ্র কণ্ঠে .. বড়ো আবেগ-প্লাবিত কণ্ঠে তাঁর কাছে জানতে চাইলাম :

'কিতাবটা কি আপনার কাছে আছে? একটু দেখতে পারি?!'

'হ্যাঁ আছে।' এই বলে তিনি আলমারী থেকে বইটি বের করে আনলেন!

এই কাকতালীয় ঘটনায় লেখক কী পরিমাণ আনন্দিত হয়েছিলেন—তা শুধুই অনুভব করা যায়, ভাষায় আর কতোটুকু প্রকাশ করা যায়?! স-ব আনন্দের কী প্রকাশ আছে? এরপর লেখক কিছুদিনের জন্যে রাষ্ট্রদূতের কাছ থেকে কিতাবটা চেয়ে নিয়ে গেলেন। কিন্তু আনন্দের এ-আকাশে লক্ষ কোটি তারার দ্যুতি যেমন ছিলো, ছিলো একপাশে বেদনার একটা শোকতারাও। ড. আমিনের ভুমিকাটি পড়ে আমি প্রচণ্ড হতাশ হলাম। তাঁর মতো একজন বিদগ্ধ গবেষক ও লেখকের কাছ থেকে এমন নিরস-কৃপণ-আবেদনহীন ভূমিকা মোটেই আশা করি নি। এক জায়গায় তিনি লিখেছেন :

'এ বইয়ে কোনো অস্পষ্টতা খুঁজে পেলে পাঠককে বুঝে নিতে হবে—লেখক অনারব—হিন্দুস্তানের এক বাসিন্দা।'

বন্ধুরা এ-ভূমিকা পড়ে কেউ-ই খুশি হতে পারেন নি। তারা বললেন : 'কিতাবের সাথে ইনসাফ করা হয় নি।' আমার মনে হয়, ড. আমিন যখন এ-ভূমিকা লিখতে বসেছিলেন তখন হয়ত তাঁর লেখার 'মুড'ই ছিলো না। অথবা হয়ত তিনি ভেবেছিলেন যে, চেনা নেই.. জানা নেই.. দেখা নেই.. এমন এক লেখকের বইয়ের ভূমিকায় বেশি উচ্ছাস প্রকাশ করা সমীচীন হবে না।

তারপরও যেমনি হোক একটি ছোট্ট ভূমিকাসহ ড. আমিনের প্রকাশনা পরিষদ থেকে বইটি বের হওয়ায় ভীষণ উপকার হয়েছিলো। অল্প সময়ের মধ্যেই তা আরব দুনিয়ার তথ্যাভিজ্ঞ বিশেষ মহলের কাছে পৌঁছে গিয়েছিলো। এও ছিলো এক বিরাট প্রাপ্তি।

যাই হোক; কিতাবটি বের হওয়ার দু' তিন মাস পর মিসরে এসে দেখলাম— লেখকের ধারণার চেয়েও বইটি অনেক বেশি সমাদৃতি পেয়েছে। বিশেষত ইলমী ও দীনি হালকায়। ব্যাপকভাবে তা পঠিত হয়েছে

শিক্ষিত মহলে। ইসলাম ও মুসলমানদের উত্থান ও জাগরণ-স্বপ্নে যারা বিভোর তারা কিতাবটিকে বড়ো আগ্রহভরে গ্রহণ করলেন। তখন 'ইখওয়ানুল মুসলিমীন' এর উপর থেকে নিষেধাজ্ঞা পুরোপুরি তুলে নেয়া না-হলেও কিছুটা শিথিল করা হয়েছে। তাদের মুরুব্বী ও রাহনুমা শায়খ হাসানুল বান্না'র করুণ শাহাদতে তাদের সকলের হৃদয়-মন— বেদনাঘেরা, শোকাহত। এ-কিতাব তাদের শোকাকুল বেদনার্ত হৃদয়ে সান্ত্বনার শীতল পরশ বুলিয়ে দিলো। তারা যেনো তাদের মতাদর্শ ও চিন্তার পক্ষে লড়াই করার জন্যে এক নতুন অস্ত্র ও নতুন উপকরণ পেয়ে গেলেন। ইখওয়ানের যে সকল কর্মী বন্দি হলো তাদের হাতেও পৌঁছে গেলো এ-কিতাব। জেলে বসেই তারা পড়লেন এ-কিতাব। হলেন আলোড়িত ও অনুপ্রাণিত। এমন কি তাদের নিয়মিত প্রশিক্ষণ-সিলেবাসেও এটি অন্তর্ভুক্ত হলো। আদালতে বাদি-বিবাদি'র তুমুল তর্কের সময়েও এ-কিতাব থেকে উদ্ধৃতি পেশ করা হতে লাগলো। সংসদের আলোচনা ও বক্তব্যেও এ-কিতাব জায়গা করে নিলো। তারা সবাই লেখককে স্বত:স্ফূর্ত আবেগ-ভালোবাসায় আপন করে নিলো। লেখক যদিও তাদের মাঝে এই প্রথম বেড়াতে এসেছেন। কিন্তু কোনো কিছুতেই কোনো বেগ পেতে হয় নি। নতুনত্ব— ঘনিষ্ঠতায় কোনো বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারলো না। লেখকের আসার আগেই তার কিতাব সবার কাছে তাকে তুলে ধরেছে। সবার কাছে তার নির্ভরযোগ্যতা সৃষ্টি করেছে। সবার সাথে ছায়াঘেরা-মায়াঘেরা পরিবেশের ছাউনিতে বসে কথা বলার সুযোগ করে দিয়েছে।

প্রখ্যাত লেখক, সাহিত্যিক ও ইসলামী গবেষক সায়্যিদ কুতব এ কিতাবকে বড়ো উষ্ণভাবে স্বাগত জানিয়েছিলেন এবং এর প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে তিনি তাঁর ঘনিষ্ট মহল ও ছাত্রদেরকেও তা পড়তে বলেছিলেন। সায়্যিদ কুতবের বাসভবনে প্রতি শুক্রবার একটা বৈঠক হতো, অনেকটা সাহিত্য আসরের মতো। বিভিন্ন ইসলামী বিষয় নিয়ে আলোচনা হতো। উপস্থিত সদস্যদের কারো লেখা নিয়েও 'সাহিত্য সমালোচনা' ধরনের আলোচনা হতো। একদিন আমিও সে বৈঠকে হাজির হওয়ার দাওয়াত পেলাম, সায়্যিদ কুতবের পক্ষ থেকে। আর আনন্দের ব্যাপার হলো— সে দিন আলোচনার বিষয়বস্তু ধার্য করা হলো-ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين (মুসলমানদের অধঃপতনে বিশ্ব কী হারালো?)! কথা ছিলো— তাঁর এক ছাত্র —যিনি ফুয়াদ আল-আউয়াল বিশ্ববিদ্যালয়ের ফারেগ ছিলেন—

কিতাবের সারমর্ম ও বিষয়বস্তু লিখিত আকারে পেশ করবেন এবং তার উপরই আলোচনা হবে। লেখক বড়ো আনন্দভরে.. বড়ো কৃতজ্ঞতাভরে এ-আমন্ত্রণ গ্রহণ করে সেখানে উপস্থিত হলেন এবং আলোচনায় অংশ নিলেন। লেখক হিসাবে উপস্থিত সদস্যদের বিভিন্ন প্রশ্নেরও উত্তর দিলেন। নিঃসন্দেহে মহান শহীদের পক্ষ থেকে এ-আয়োজন ছিলো লেখকের জন্যে বড়ো আনন্দ ও সৌভাগ্যের বিষয়।

সে বৈঠকে বসেই লেখকের মনে একটা বাসনা উদয় হলো। সায়্যিদ কুতবের মতো একজন আদর্শনিষ্ঠ, ঈমানী চেতনাস্নাত শক্তিমান লেখকের কাছ থেকে ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين -এর জন্যে একটা ভূমিকা লিখিয়ে নিলে কেমন হয়!!

সায়্যিদ কুতব বড়ো সুন্দর করে 'হ্যাঁ' বললেন। তাঁর শক্তিশালী ও প্রাণময় ভূমিকা কিতাবের অবস্থান ও মর্যাদাকে অনেক বাড়িয়ে দিয়েছে।[১]

এ-গ্রন্থের আরেকজন গুণগ্রাহী ব্যক্তি হলেন আল-আযহার বিশ্ববিদ্যালয়ের শরীয়া অনুষদের অধ্যাপক এবং جماعة الأزهر للتأليف والترجمة والنشر -এর প্রধান ড. মুহাম্মদ ইউসূফ মূসা। তিনি একদিনেরও কম সময়ে এ-গ্রন্থটি পড়ে শেষ করে গ্রন্থের শেষে লিখে রেখেছিলেন এই অমর বাক্যটি—

إن قراءة هذا الكتاب فرض على كل مسلم يعمل لإعادة مجد الإسلام

'যারা ফিরিয়ে আনতে চায় ইসলামের হৃত-গৌরব ও মর্যাদা—তাদেরকে এ-গ্রন্থটি পড়তেই হবে।'

---

[১] লক্ষ্য করুন তাঁর ভূমিকার অংশ বিশেষ:

'এ-গ্রন্থের আরেকটি বৈশিষ্ট্য হলো, এতে ইসলামী চেতনা ও ভাবধারাকে গভীরভাবে অনুধাবন করার জন্যে খুব স্পষ্ট করে আলোচনা করা হয়েছে। তাই আমরা বলতে পারি— এ-গ্রন্থ নিছক ধর্মীয় ও সমাজ জীবনের উপর একটি গবেষণা গ্রন্থই নয়, বরং ইসলামী দৃষ্টিকোণের প্রতিফলন ঘটিয়ে কীভাবে ইতিহাস লিখতে হয়— তারও একটি চমৎকার নমুনা। নিঃসন্দেহে এ-গ্রন্থ মানব জীবনের উপর ইতিবাচক প্রভাব বিস্তারকারী সব বিষয়ের একটি বিরল সমষ্টি—এক সুসংহত শব্দচিত্র। লেখক তাঁর এই সুসংহত ও সুবিন্যস্ত পংক্তিমালায় ইতিহাসকে বড়ো সুন্দর করে উপস্থাপন করেছেন। সেই সাথে মুসলিম উম্মাহকে দিয়েছেন সঠিক দিক নির্দেশনা।'

তিনি আরো বলেন:

'এই গ্রন্থ— ইতিহাস কীভাবে রচিত হওয়া উচিত, তার একটি প্রকৃষ্ট ও হৃদয়গ্রাহী উদাহরণ। ইউরোপীয় ঐতিহাসিকদের 'ষ্টাইল' থেকে মুখ ফিরিয়ে (যা 'আউলা-ঝাউলা' হয়ে আছে অসঙ্গতি ও অসামঞ্জস্যতায়, সত্য-বিচ্যুতি ও বিকৃতিতে এবং জ্ঞান-গবেষণার হাজারো দৈন্যে) ইতিহাসমুখী আলোচনায় গবেষণায় কীভাবে কলম ধরতে হবে— সে দিক-দিশাও এখানে দেদীপ্যমান।' (সায়্যিদ কুতবের ভূমিকা থেকে)

যাই হোক; তিনি নিজের প্রকাশনা থেকে এই গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণ বের করার আগ্রহের কথা আমাকে জানালেন। আমি সানন্দে রাজি হয়ে গেলাম। তখন ড. আমিনের কাছ থেকে সম্মতি নিয়ে সামনে অগ্রসর হলেন। গ্রন্থের জন্যে তিনি নিজে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকাও লিখলেন। অপরদিকে লেখকের একজন বিশিষ্ট বন্ধু ড. আহমদ আশ শিরবাসীও লেখকের জীবনের টুকরো কথা নিয়ে চমৎকার একটি লেখা এ-সংস্করণের সাথে সংযুক্ত করে দিলেন। এ-লেখাটি কীভাবে তৈরী হলো এবং গ্রন্থের সাথে সংযোজিত হলো তা আমি প্রথমে বুঝতেই পারি নি। বুঝতে পেরেছি গ্রন্থ প্রকাশের পর! বন্ধুবর ড. আহমদ আশ-শিরবাসী আলাপে-আলাপে লেখকের কাছ থেকে লেখকের পরিবার, পরিবেশ, সমাজ ও ছাত্রজীবন সম্পর্কে প্রশ্ন করে-করে এ-লেখাটি দাঁড় করিয়েছিলেন আমার একেবারে অজান্তেই। শিরোনাম ছিলো—

صورة وصفية ـــــ أخي أبو الحسن

(আমার ভাই আবুল হাসান! কিছু কথা, কিছু গুণ!)

কিতাবের দ্বিতীয় সংস্করণের সময়কালটা ছিলো ১৯৫৩ সাল। এ-সংস্করণের পর কিতাবটি এতোই সমাদৃত হলো যে, প্রাচ্যে-প্রতীচ্যে বিভিন্ন ভাষায় তা একের পর এক অনূদিত হয়ে আসতে লাগলো। এ-মুহূর্তে বইটির ত্রয়োদশ (বৈধ) সংস্করণ চলছে।

সংক্ষেপে .. অতি সংক্ষেপে কিন্তু স্পষ্ট উচ্চারণে এ-ই হলো বইটির জন্ম কাহিনী। সমস্ত প্রশংসা শুধু আল্লাহ্‌র।

উলুমে শরীয়া'র বিভিন্ন শাখায় শায়খ নদভী'র অংশগ্রহণ, ব্যুৎপত্তি ও অবদান

উলুমে শরীয়া'র কোন্ কোন্ শাখায় শায়খ নদভী'র সাবলীল বিচরণ ছিলো? কোন্ কোন্ বিষয়ে তাঁর লেখালেখি কেন্দ্রিভূত ছিলো? যা যা পড়েছেন, জেনেছেন, তার সব নিয়েই কি তিনি কলম ধরেছেন না-কি নির্দিষ্ট কিছু বিষয়েই তা কেন্দ্রিভূত ছিলো?...... এ প্রশ্নের উত্তর জানতেই এখানে আমাদেরকে একটু থামতে হবে।

আবুল হাসান আলী নদভী দারুল উলুম নদওয়াতুল উলামা ও দারুল উলুম দেওবন্দের উলামা-মাশায়েখের গভীর সান্নিধ্য ও শিষ্যত্বে উলুমে শরীয়া'র বিভিন্ন শাখায় ইলম হাসিল করেছেন।

না, সব বিষয় নিয়ে তিনি লিখেন নি।

তাঁর লেখক-সত্ত্বা আবর্তিত হয়েছে দাওয়াত এবং ইসলামী চিন্তা-দর্শনকে কেন্দ্র করে।

ইসলামী চিন্তা-দর্শনের গূঢ় রহস্য ও তাৎপর্যকে কেন্দ্র করে।

বিভিন্ন বাতিল ফেরকা ও শয়তানি মতবাদের অসারতা ও মুখোশ উন্মোচনকে কেন্দ্র করে।

ইসলামী ইতিহাস-ঐতিহ্যের হৃত-গৌরব পুনরুদ্ধারকে কেন্দ্র করে।

ইসলাম ও রিসালাতে মুহাম্মদীকে ঘিরে দানা-বেঁধে-ওঠা সংশয়-সন্দেহের অপনোদনকে কেন্দ্র করে।

শায়খ নদভী ও কুরআনে কারীম

কুরআন গবেষণায় তাঁর অন্যতম দ্যুতিত অবদান হলো- تأملات في سورة الكهف (সূরায়ে কাহফঃ চিন্তার আলোকমালা) গ্রন্থটি। পরবর্তীতে এটি الصراع بين الإيمان والمادية (ঈমান ও বস্তুবাদের লড়াই) নামে প্রকাশিত হয়। এ ছাড়া এ-বিষয়ে তিনি আরো লিখেছেন- النبوة والأنبياء في ضوء القرآن (কুরআনের আলোকে নবুয়ত ও নবী)। কুরআনের টুকরো কথা নিয়ে কিংবা নির্দিষ্ট কোনো আয়াতকে কেন্দ্র করে রয়েছে তাঁর অসংখ্য পুস্তিকা। (সম্প্রতি এ বিষয়ে قرآني إفــــــادات নামে উর্দূতে একটি গুরুত্বপূর্ণ কিতাব প্রকাশিত হয়েছে।)

তাঁর কিতাব ও প্রবন্ধ-নিবন্ধের পাঠক খুব সহজেই অনুভব করতে পারবেন যে, তিনি কুরআনে কারীমের কতো বড় স্বাদগ্রহণকারী ও বোদ্ধা ছিলেন। কুরআনে কারীমের আয়াত দ্বারা প্রামাণ্য উদ্ধৃতি পেশ— তাঁর লেখা ও বলার বৈশিষ্ট্য ছিলো। বিশেষত ঈমানী এবং সামাজিক দৃষ্টিকোণকে প্রতিফলিত করে। এর উদাহরণ প্রচুর, অসংখ্য।

শায়খ নদভী ও ইলমে হাদীস

অনুরূপভাবে হাদীস শাস্ত্রেও শায়খ নদভী পূর্ণতা অর্জন করেন এবং শীর্ষ অবস্থানে উপনীত হন। সমকালীন হাদীসতত্ত্ববিদগণের কিতাবের জন্যে তিনি যে মহামূল্যবান ভূমিকা লিখে দিয়েছেন, তা তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

তাঁর এ-সব ভূমিকা আলাদা গ্রন্থাকারেও প্রকাশিত হয়েছে— তার গুরুত্ব বিবেচনা করে। শিরোনাম دراسات في الحديث النبوي (হাদীসে নববী গবেষণা)। এতে মোট আটটি ভূমিকা রয়েছে :

১. আল্লামা শায়খুল হাদীস মুহাম্মদ যাকারিয়া রহ. রচিত الأبواب والتراجم للبخاري-এর ভূমিকা।

২. শায়খ আল্লামা তাকী উসমানী লিখিত تكملة فتح الملهم في شرح صحيح مسلم -এর ভূমিকা।

৩. ভারত উপমহাদেশের প্রখ্যাত হাদীস বিশারদ আল্লামা রশিদ আহমদ গাঙ্গূহী রহ. লিখিত الكوكب الدري على دامع الترمذي -এর ভূমিকা।

৪. বিশিষ্ট মুহাদ্দিস আল্লামা খলিল আহমদ সাহারানপুরী রহ. লিখিত بذل المجهود على سنن أبي داؤد -এর ভূমিকা।

৫. আল্লামা শায়খুল হাদীস মুহাম্মদ যাকারিয়া রহ. লিখিত أوجز المسالك إلى مؤطأ الإمام مالك -এর ভূমিকা।

৬. আল্লামা শায়খুল হাদীস মুহাম্মদ যাকারিয়া রহ. লিখিত لامع الدراري على جامع البخاري -এর ভূমিকা।

৭. বিশিষ্ট ঐতিহাসিক (শায়খ নদভী'র পিতা) আল্লামা আবদুল হাই আল-হাসানী রহ. লিখিত تهذيب الأخلاق-এর ভূমিকা।

৮. মাওলানা আবু সাহবান রুহুল কুদস লিখিত روائع الأخلاق -এর ভূমিকা।

এই আটটি ভূমিকা ছাড়াও উক্ত পুস্তিকাটিতে আরো দু'টি গুরুত্বপূর্ণ লেখা স্থান পেয়েছে। প্রথমটি ইমাম মালিক ও তাঁর মুয়াত্তা সম্পর্কে আর দ্বিতীয়টি نبذة عن تاريخ الحديث والمحدثين في الهند সম্পর্কে। শেষোক্ত লেখাটিতে তিনি মুসলিম হিন্দুস্তানের চিত্র তুলে ধরেছেন এবং ইসলামের বিজয়াভিযানের পর সেখানে লেখক, মুসান্নিফ, মুহাদ্দিসগণের আগমনের ইতিহাস নিয়ে আলোকপাত করেছেন। যাঁদের কেন্দ্রবিন্দু ছিলেন হিন্দুস্তানের শ্রেষ্ঠ হাদীসবেত্তা শাহ ওয়ালী উল্লাহ ইবনে আবদুর রহিম দেহলভী রহ.। সে সময় শাহ ওয়ালী উল্লাহ দেহলভী রহ. এবং তাঁর বংশধর ও শাগরিদদের মেহনতের বদৌলতে সারা হিন্দুস্তান জুড়ে সৃষ্টি হয় এক মহান ইলমী জাগরণ। বিশেষত ইলমে হাদীসকে কেন্দ্র করে। ইলমে

হাদীসের আলোয় দেদীপ্যমান যে-সব শহর তখন সবচে' বেশি আলোচিত ছিলো তা হলো— দিল্লী, লখনৌ, পানিপথ, দেওবন্দ, মুরাদাবাদ, গাঙ্গূহ ও অন্যান্য শহর ও এলাকা।

এ ছাড়া 'হাদীস তত্ত্বে' শায়খ নদভী'র আরো দু'টি গবেষণা প্রবন্ধ রয়েছে। একটি হলো– مدخل إلى دراسة الحديث النبوي الشريف আর অপরটি হলো– دور الحديث في تكوين المناخ الإسلامي وصيانته । শেষোক্ত গবেষণাটি মূলত একটি বক্তৃতা, যা তিনি *'রাবেতায়ে আলমে ইসলামী'*র সেমিনারে পেশ করেছিলেন।

শায়খ নদভী রহ. এর জীবনীকাররা 'হাদীস তত্ত্ব'-এ তাঁর অংশগ্রহণের বিভিন্ন দিক নিয়ে প্রচুর লেখালেখি করেছেন। এ-সব লেখা নদওয়াতুল উলামা'র গবেষণা মুখপত্র البعث الإسلامي তে ছাপা হয়েছে।

শায়খ নদভী ও ইতিহাস

যে ক্ষেত্রে শায়খ নদভী অত্যন্ত দাপট ও প্রাধান্যের সাথে এবং অতি স্বাচ্ছন্দ ও সাবলীলতার সাথে বিচরণ করেছেন, তা হলো— ইসলামের ইতিহাস ও ঐতিহ্য। এ-ইতিহাস লেখার সূচনা করেছেন তিনি 'সীরাতে নববী' রচনার মাধ্যমে। 'সীরাতে নববী'ই তো আসলে ইসলামের ইতিহাসের মূল উৎস! মূল সূচনা!!

ইসলামের ইতিহাস রচনায় শায়খ নদভী যে ঐতিহাসিক অবদান রেখেছেন, এ-সংক্ষিপ্ত শব্দচিত্রে তার মূল্যায়ন ও চিত্রায়ন অসম্ভব। শিরোনামের মতো করে শুধু বলা যায়—

ইতিহাসের মহা সমুদ্রে ডুব দিয়েছেন যে সকল মনীষী—
তিনি তাদের একজন।
যারা জানেন ইতিহাসের রহস্য ও তাৎপর্য এবং ভিতর ও বাহির—
তাদেরও তিনি একজন।
যাদের কাছে ইতিহাসের দূর–দিগন্তও,
রাঙা প্রভাতের মতো আলোকোজ্জ্বল ও স্পষ্ট—
তাদেরও তিনি একজন।
যারা জানেন ইতিহাসের শক্তি ও ক্ষমতা এবং দৈন্য ও দুর্বলতা—
তাদের নামের পাশেও তাঁর নাম তারার মতো জ্বলজ্বল করে।
এই উম্মতকে গাফলতের নিঁদ থেকে জাগাতে..

অন্যান্য জাতি-গোষ্ঠির মধ্যে এ-উম্মতের শ্রেষ্ঠত্ব তুলে ধরতে..
বিশ্বময় ইসলাম ছড়িয়ে দিতে উম্মতকে উদ্বুদ্ধ ও সতর্ক করতে—
তিনি ইতিহাসকে সুসংহত ও সুবিন্যস্ত করেছেন।
আবেগময় ভাষায় তা লিপিবদ্ধ করেছেন।

ইতিহাসকে কেন্দ্র করে তাঁর এ-অমর জ্ঞান-গবেষণা উদ্ভাসিত হয়েছে তাঁর সর্বাধিক আলোচিত গ্রন্থ ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين -এর পাতায়-পাতায় এবং رجال الفكر والدعوة في الإسلام (ইসলামের চিন্তানায়ক ও দাঈগণ) গ্রন্থের ছত্রে-ছত্রে। رجال الفكر والدعوة في الإسلام গ্রন্থে ইসলামের ইতিহাসকে তিনি নতুন ধারায় .. নতুন ভাষায় .. নতুন চেতনায় .. নতুন প্রাণময়তায়— গ্রন্থিত করেছেন। এ-গ্রন্থে (যা মূলত দামেস্ক বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের উদ্দেশ্যে প্রদত্ত তাঁর একটি অমর বক্তৃতামালার সংকলন) তিনি তুলে ধরেছেন যে, উম্মতের ঈমানী শূন্যতা ও ক্ষতিপূরণ করার জন্যে যুগে-যুগে মুজাদ্দিদ পাঠানো— আল্লাহ্‌র বিধান। এ-শূন্যতা ও ক্ষতি উক্ত মুজাদ্দিদ ছাড়া আর কেউ পূরণ করতে পারেন না। যুগ ঃ বা শতাব্দীর ব্যবধানে একেকজন মুজাদ্দিদ এসে-এসে উম্মতের ঈমানের বিরান বাগিচাকে বসন্তময় করে দিয়ে যান। ফুলে-ফলে-সৌরভে আমোদিত করে দিয়ে যান। ঠিক এমন দৃষ্টিকোণ্ থেকেই তিনি আলোচনা করেছেন উমর ইবনে আবদুল আযিয রহ., হাসান বসরী রহ., আবদুল কাদের জিলানী রহ., জালালুদ্দীন রূমী রহ.সহ অন্যান্যদের সম্পর্কে।

এখানে আমি আরেকটি কথা উল্লেখ করতে চাই। শায়খ নদভী এ-ইতিহাস লিখেছেন এমন সব বরাতগ্রন্থের সাহায্য নিয়ে, যেগুলোকে সচরাচর কেউ কোনো বরাতগ্রন্থই মনে করে না।

পরবর্তীতে এ-সিরিজে যুক্ত হয়েছেন ইমাম সারহান্দি, যিনি মুজাদ্দিদে আলফে সানী হিসাবে অধিক পরিচিত, হাকীমুল ইসলাম মহান সংস্কারক আহমদ ইবনে আবদুর রহিম, যিনি শাহ্ ওয়ালিউল্লাহ নামে অধিক প্রসিদ্ধ এবং সবশেষে যুক্ত হয়েছেন আল্লাহ্‌র পথের মহান বীর ও মুজাহিদ শহীদ আহমদ ইবনে ইরফান, যিনি সায়্যিদ আহমদ শহীদ নামে বেশী প্রসিদ্ধ। শায়খ নদভী রহ. এর গর্বিত পূর্ব পুরুষ তিনি। যে খান্দানের পূর্ব পুরুষেরা হিন্দুস্তানের আকাশে নক্ষত্রের মতো জ্বলজ্বল করে জ্বলছে।

শেষ দিকে المرتضى (চতুর্থ খলিফা হযরত আলী রা. এর জীবনেতিহাস) গ্রন্থটি লিখে ইসলামের ইতিহাসকে সমৃদ্ধ করেছেন এবং অনেক অজানা প্রশ্নের সূক্ষ্ম ও সুন্দর জবাব দিয়েছেন।

পাঠক! মোদ্দাকথা হলো; ইসলামের ইতিহাস ছিলো শায়খ নদভী'র বড়ো প্রিয় বিষয়। এ জন্যেই লক্ষ্য করবেন যে, ইসলামের ইতিহাসের বর্ণোজ্জ্বল আকাশে দেদীপ্যমান 'রবি-শশী-গ্রহ-তারা'দের নিয়ে লিখেছেন— তাঁর একান্ত নিজস্ব বর্ণময় উপস্থাপনায়। যাঁদের কেউ ছিলেন ইলম ও তত্ত্ব-দর্শন এবং ফিকির ও চিন্তা-দর্শনের দিকপাল। যেমন ইমাম গাযালী ও ইমাম ইবনে তাইমিয়া রহ. আর কেউ ছিলেন ইসলাহ ও সংস্কার আন্দোলনের এবং আত্মার জগতের রাহবার ও দিক দিশারী। যেমন মুজাদ্দিদে আলফে সানী ও শাহ ওয়ালীউল্লাহ দেহলভী রহ.। কেউবা ছিলেন জিহাদ ও রাজনীতির ময়দানে সিপাহসালার ও দিক দিশারী। যেমন উমর ইবনে আবদুল আযিয ও সালাহুদ্দীন আইয়ূবী রহ.।

শায়খ নদভী ও ফিক্হ

কিন্তু ফিক্হ নিয়ে শায়খ নদভী লিখেন নি। যদিও এ বিষয়েও তিনি যথেষ্ট পড়াশুনা করেছিলেন। তাঁর কালজয়ী গ্রন্থ الأركان الأربعة (আরকানে আরবাআ বা চার স্তম্ভ) সালাত, সিয়াম, যাকাত ও হজ্ব-এর হাকিকত ও তাৎপর্য এবং মানুষের মনে-সমাজে-জীবনে তার প্রভাব সম্পর্কে তিনি এই গ্রন্থে অনবদ্য আলোচনা করেছেন। এখানেও তিনি ফিকহী দৃষ্টিকোণ থেকে কোনো আলোচনা করেন নি। অর্থাৎ এ-কিতাবের ভাষা ও উপস্থাপনা — 'দাঈ ও মুরুব্বী'র ভাষা ও উপস্থাপনা, মোটেই নয়— কোনো 'ফকীহ'-এর ভাষা ও উপস্থাপনা।

এমনটা কেনো হলো? কী এর রহস্য? ... আমার কাছে মনে হয় এর কারণ হলো—

এক. তিনি ইতিহাসের যেমন গভীরে প্রবেশ করেছেন ফিকহের তেমন গভীরে প্রবেশ করেন নি।

দুই. তাঁর লেখক-সত্তার বিশেষ অনুরাগ মিশেছিলো ফিকহের আনুষঙ্গিকতা ও টুকরো কথার তুলনায় দাওয়াত ও চিন্তা-দর্শনের সাথে।

তিন. তাঁর প্রচণ্ড আল্লাহভীতি ও তাকওয়াবোধও এ ক্ষেত্রে একটি অন্যতম কারণ। অর্থাৎ হালাল-হারামের ব্যাপারে ফতওয়া দেয়ার মতো

কঠিন দায়িত্ব ও ঝুঁকি তিনি নিতে চান নি। তাই এ থেকে তিনি নিজেকে নিরাপদ দূরত্বে সরিয়ে রেখেছিলেন। এ জনেই আমরা লক্ষ্য করেছি যে, *'রাবেতায়ে আলমে ইসলামী'* -এর *'ফিকাহ একাডেমী'* এর তিনি একজন গুরুত্বপূর্ণ সদস্য হওয়া সত্ত্বেও ফিকাহ নিয়ে সেখানে তিনি কোনো আলোচনার অবতারণা করেন নি এবং কোনো কিছুই লিখেন নি। তাই আমার মনে হয় —লেখালেখির ক্ষেত্রে তাঁর চিন্তাধারাটা সম্ভবত ছিলো এই— ইচ্ছে করেই তিনি ফিকহী গবেষণায় মনোযোগ দেন নি। এ-বিষয়টি বরং তিনি ছেড়ে দিয়েছিলেন ফিকাহ শাস্ত্রে অভিজ্ঞ ও পারদর্শী— এ-ময়দানের যাবতীয় শর্ত পূরণকারী কোনো মুফতি'র দায়িত্বে।

কিন্তু এ ক্ষেত্রে মুহাম্মদ আল-গাযালী ছিলেন তাঁর চেয়ে ব্যতিক্রম। তিনি ছিলেন প্রথম সারির একজন দাঈ। দাওয়াত মিশেছিলো তাঁর রক্তে-মাংসে। চিন্তায়-চেতনায়। অনুভব-অনুভূতিতে। তবুও ফিকাহ শাস্ত্রে প্রবেশ করতে মোটেই তিনি কুণ্ঠিত হন নি। এমন কি অনেক ফিকহী মাসআলায় তিনি বিতর্কেরও জন্ম দিয়েছেন। এ জন্যে অনেকেই তাঁর উপর ক্ষুব্ধ ছিলেন এবং তাঁর অনেক মতামতকেই মেনে নিতে পারেন নি। আর তাদের সংখ্যাটাও বেশ ভাবিয়ে তোলার মতো। তাঁর যে সব বিষয় ও বক্তব্য নিয়ে বিতর্ক ও মতভেদের সূচনা হয়েছে তার কিছু ছিলো এই–

১. دية المرأة

২. الجهاد هل هو دفاعي أم هجومي

৩. الشورى أهي معلمة أم ملزمة

৪. الغناء والموسيقى

এ সব বিষয়ে শায়খ মুহাম্মদ আল-গাযালী'র দৃষ্টিভঙ্গি অনেকেই মেনে নেন নি। বিশেষত তাঁর السنة النبوية بين أهل الفقه وأهل الحديث গ্রন্থটি প্রকাশিত হওয়ার পর। অপরদিকে শায়খ নদভী এ-ধরনের যুদ্ধে অবতীর্ণ হন নি। ফলে তাঁর মতাদর্শ নিয়ে কোনো বিভাজনও তৈরী হয় নি। তিনি বরং মনে-প্রাণে চাইতেন বন্ধন— হৃদয়ে-হৃদয়ে। যা গড়ে উঠবে প্রধানত ঈমানী ভ্রাতৃত্বের উপর। ইবাদতের নিষ্ঠার উপর। সুকুমারবৃত্তির অবিচলতার উপর। আল্লাহ্‌র কাছে জীবনে-মরণে দায়বদ্ধ থাকার দৃঢ়তার উপর।

এখানে এসেই দু'টি নদীর প্রবাহ একটিমাত্র মোহনায় মিশে যায়। অর্থাৎ শায়খ নদভী এবং শায়খ হাসানুল বান্না ছিলেন এ ক্ষেত্রে এক ও

অভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গির মানুষ। হাসানুল বান্নাও শায়খের মতো চাইতেন ভাঙার বদলে শুধু গড়তে এবং বিচ্ছিন্নতার বদলে শুধু ঐক্যবদ্ধ করতে। হাসানুল বান্না'র প্রসিদ্ধ নীতির একটি নীতি ছিলো—

'لكل مسلم لم يبلغ درجة النظر في الأحكام الشرعية أن يتبع ماما من أئمة الدين، ويحسن به أن يتعرف على أدلة إمامه ما استطاع، وأن يتقبل كل إرشاد مصحوب بالدليل متى صح عنده صلاح من أرشده وكفايته، وأن يستكمل نقصه العلمي ن كان من أهل العلم حتى يبلغ درجة النظر

'শরীয়তের হুকুম-আহকাম ও বিধি-বিধানে পূর্ণতা অর্জন না-করা পর্যন্ত এবং সঠিক পর্যবেক্ষণ-ক্ষমতা হাসিল না-করা পর্যন্ত প্রত্যেক মুসলমানের উচিত যে কোনো একজন ইমামের অনুসরণ করা। আর উক্ত ইমামের দলিল প্রমাণ সম্পর্কে সাধ্য অনুযায়ী অবহিত হওয়াটা একান্ত বাঞ্চনীয়। শরীয়তের মানদণ্ডে উক্ত ইমাম যদি 'অনুসরণীয়' হওয়ার যোগ্য হন, তাহলে তার সকল দিক নির্দেশনাই মেনে চলতে হবে। কেউ যদি 'আহলে ইলম' হন, তাহলে ইলমের ক্ষেত্রে তার সকল শূন্যতা দূর করে পূর্ণতা অর্জনে অবশ্যই তাকে সচেষ্ট হতে হবে। ধাপে ধাপে শরীয়তের হুকুম-আহকাম ও বিধি-বিধান সম্পর্কে পূর্ণতা অর্জন করতে হবে এবং সঠিক পর্যবেক্ষণ ক্ষমতাও অর্জন করতে হবে।'

শায়খ নদভী'র কিতাবের তালিকা

এখন আমরা আরবী বর্ণমালার ক্রমানুসারে তাঁর আরবী কিতাবসমূহের একটি তালিকা পাঠকের খিদমতে পেশ করছি।

أ

১- الاجتهاد ونشأة المذاهب الفقهية

(ইজতিহাদ এবং ফিকহী মাযহাবের সূচনা ও উৎপত্তি),

প্রকাশক: ইসলামী গবেষণা একাডেমি, নদওয়াতুল উলামা, লখনৌ, ভারত।

২- أحاديث صريحة في أمريكة

(আমেরিকায় বসে স্পষ্ট ভাষায় বলতে চাই),

প্রকাশক: আর রিসালাহ ফাউণ্ডেশন,বৈরুত, লেবানন।

৩- إذا هبت ريح الإيمان

(বইলো যখন ঈমানের হাওয়া),

প্রকাশক: আর রিসালাহ্ ফাউণ্ডেশন, বৈরুত, লেবানন।

৪- أحاديث صريحة مع إخواننا العرب المســــــــــــــلمين

(আমার মুসলিম আরব ভাইদেরকে স্পষ্ট ভাষায় বলতে চাই),

প্রকাশক: দারে আরাফাত, দায়েরায়ে শাহ আলামুল্লাহ, রায়বেরেলী, লখনৌ।

৫- ارتباط مسيرة الانسانية ومصيرها بقيام المسلمين بواجبهم ودورهم في تكوين وحدة وتوجيه الدعوة

(মানবতার পথ-পরিক্রমা ও পরিণতি এবং মুসলমানদের দায়িত্ব ও ভূমিকা, ঐক্য ও দাওয়াতের প্রতি তাদের ভূমিকা ও সঠিক দিক নির্দেশনা), প্রকাশক: ইসলামী গবেষণা একাডেমি, নদওয়াতুল উলামা, লখনৌ, ভারত।

৬- الأركان الأربعة

(ইসলামের চার স্তম্ভ),

প্রকাশক: দারুল কলম, কুয়েত. দারুল কলম, দামেস্ক।

৭- أريد أن اتحدث إلي الإخوان

(ইখওয়ানকে বলতে চাই),

প্রকাশক: ইসলামী গবেষণা একাডেমি, নদওয়াতুল উলামা, লখনৌ, ভারত।

৮- إزالة أسباب الخذلان أهم من إزالة آثار العدوان

(দুশমনের চিহ্নসমূহ নয়— সবচে' গুরুত্বপূর্ণ হলো অসহযোগিতার কারণসমূহ দূর করা)

প্রকাশক: দারে আরাফাত, রায়বেরেলী, লখনৌ, ভারত।

৯- أزمة إيمان وأخلاق

(ঈমান ও নৈতিকতার সঙ্কট),

বাগদাদে 'ফিলিস্তিন মুক্তিসংস্থা'র কেন্দ্রিয় অফিসে প্রদত্ত একটি বক্তৃতা। পরবর্তীতে এটি إلي الإسلام من جديد গ্রন্থে সংযোজিত হয়।

১০- أسبوعان في المغرب الأقصى
(মরক্কো'য় দু' সপ্তাহ),
প্রকাশক: মাতবা'আতুর রিসালাহ- মরক্কো, মুআসসাসাতুর রিসালাহ- বৈরুত।

১১- الإسلام أثره في الحضارة وفضله على الانسانية
(সভ্যতা নির্মাণে ইসলামের অবদান ও মানবতার প্রতি তার অনুগ্রহ),
প্রকাশক: ইসলামী গবেষণা একাডেমি, নদওয়াতুল উলামা, লখনৌ, ভারত।

১২- الإسلام فوق العصبيات والقوميات
(ইসলাম সাম্প্রদায়িকতা ও জাতীয়তাবাদের উর্দ্ধে),
'রাবেতায়ে আলমে ইসলামী'র প্রতিষ্ঠা-সম্মেলনে পঠিত প্রবন্ধ,
প্রকাশক: মাকতাবাতুর রাই, জেদ্দা।

১৩- الإسلام في عالم متغير
(পরির্তনশীল বিশ্বে ইসলাম),
প্রকাশক: মুআসসাসাতুল কিতাব, বৈরুত।

১৪- الإسلام في عالم متغير
(পরির্তনশীল বিশ্বে ইসলাম),
গবেষণাধর্মী প্রবন্ধ সংকলন,
প্রকাশক: দারু মাকতাবাতিল হায়াত, বৈরুত।

১৫- الإسلام والحكم
(ইসলাম ও রাষ্ট্র শাসন),
প্রকাশক: দারুল মুখতার, কায়রো, মিসর।

১৬- الإسلام والغرب
(ইসলাম ও পাশ্চাত্য),
প্রকাশক: ইসলামী গবেষণা একাডেমি, নদওয়াতুল উলামা, লখনৌ, ভারত।

১৭- المستشرقون في الإسلام
(ইসলামে প্রাচ্যতত্ত্ববিদ),
প্রকাশক: ইসলামী গবেষণা একাডেমি, নদওয়াতুল উলামা, লখনৌ, ভারত।

১৮- اسمعوها مني صرخة أيها العرب
(হে আরব জাতি! কান পেতে শুনো আমার কথা!),
প্রকাশক: ইসলামী গবেষণা একাডেমি, নদওয়াতুল উলামা, লখনৌ, ভারত।

১৯- إسمعي يا إيران!
(শোনো হে ইরান!),
প্রকাশক: দারে আরাফাত, রায়বেরেলী, লখনৌ, ভারত।

২০- إسمعي يا زهرة الصحراء!
(শোনো হে মরুফুল!),
প্রকাশক: মাকতাবাতুল মানার, কুয়েত।

২১- إسمعي يا سورية!
(শোনো হে সিরিয়া!),
ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশনা, হালব।

২২- إسمعي يا مصرُ!
(শোনো হে মিশর!),
প্রকাশক: ইসলামী গবেষণা একাডেমি, নদওয়াতুল উলামা, লখনৌ, ভারত।

২৩- أضواء على الحركات والدعوات الدينية والإصلاحية ومدارسها الفكرية ومراكزها التعليمية والتربوية في الهند، ونجاحها في إصلاح العقيدة ، ومحاربة الجاهلية والجغرافية، والدعوة إلى الدين الحنيف الخالص، والانتفاضة الإسلامية.

(হিন্দুস্তানের বিভিন্ন দীনি-দাওয়াতি-তারবিয়তি-ইসলাহি আন্দোলন এবং বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও গবেষণাগার, আকিদা-সংস্কারে এবং জাহিলিয়াত ও অসার বিশ্বাস নির্মূলে, খাঁটি একনিষ্ঠ দীনের দিকে ও ইসলামী বিপ্লব ও জাগরণের দিকে আহ্বান জানানোর ব্যাপারে সে গুলির ভূমিকা ও সফলতা নিয়ে একটি 'পর্যালোচনা'), প্রকাশক: ইসলামী গবেষণা একাডেমি, নদওয়াতুল উলামা, লখনৌ, ভারত।

২৪- أكبر خطر على العالم العربي- المؤامرات والمخططات الدقيقة العميقة لقطع العرب عن الإسلام (استعراض تاريخي: تنبيه وإنذار)

(আরব দুনিয়ার জন্যে সবচে' বড় বিপদ— ইসলাম থেকে তাদেরকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলার গভীর এবং সূক্ষ্ম ষড়যন্ত্র ও চক্রান্ত): একটি ঐতিহাসিক পর্যবেক্ষণ: হুঁশিয়ারী ও সতর্কবাণী,

প্রকাশক: দারে আরাফাত, রায়বেরেলী, লখনৌ, ভারত।

২৫- إلى الإسلام من جديد

(ইসলামের দিকে নতুন করে পথ চলা),

প্রকাশক:

> দারুল কলম, কুয়েত.

> ইসলামী গবেষণা একাডেমি, নদওয়াতুল উলামা, লখনৌ, ভারত.

> দারুল মুখতার আল-ইসলামী, কায়রো, মিসর।

২৬- إلى الراية المحمدية أيها العرب

(হে আরব জাতি! এসো মুহাম্মদী পতাকার নিচে!)

প্রকাশক: ইসলামী গবেষণা একাডেমি, নদওয়াতুল উলামা, লখনৌ, ভারত।

২৭- إلى شاطئ النجاة

(এসো মুক্তির তীরে),

প্রকাশক: মাতবাআয়ে বেদারী মালিকাউন নাসেক, ভারত।

২৮- إلى قمة القيادة العالمية

(বিশ্ব নেতৃত্ব ডাকছে তোমাকে!)

...ماذا خسر থেকে সংগৃহীত।

২৯- إلى ممثلي البلاد الإسلامية

(মুসলিম বিশ্বের প্রতিনিধিদের সমীপে)

প্রকাশক: মাকতাবাতুল ইসলাম, লখনৌ, ভারত।

৩০- الإمام الحسن البصري

(ইমাম হাসান বসরী রহ.),

رجال الفكر والدعوة في الإسلام থেকে সংগৃহীত,

প্রকাশক: দারুল মুখতার আল-ইসলামী, কায়রো।

৩১- الإمام عبد القادر الجيلاني

(ইমাম আবদুল কাদের জিলানি রহ.),

رجال الفكر والدعوة في الإسلام থেকে সংগৃহীত,

প্রকাশক: দারুল মুখতার আল-ইসলামী, কায়রো।

৩২- الإمام الذي لم يوف حقه من الإنصاف والاعتراف به أحمد بن عرفان الشهيد

(আহমদ ইবনে ইরফান শহীদ রহ. (সায়্যিদ আহমদ শহীদ): মিলে নি যাঁর প্রাপ্য ইনসাফ ও স্বীকৃতি),

প্রকাশক: ইসলামী গবেষণা একাডেমি, নদওয়াতুল উলামা, লখনৌ, ভারত।

৩৩- الإمام محمد بن إسماعيل البخاري وكتابه صحيح البخاري

(ইমাম বুখারী এবং তাঁর হাদীস গ্রন্থ: সহীহ বুখারী),

প্রকাশক: দারে আরাফাত, রায়বেরেলী, লখনৌ, ভারত।

৩৪- الأمة الإسلامية وحدها ووسيطتها وآفاق المستقبل

(মুসলিম উম্মাহ: ঐক্য ও মধ্যপন্থায় যারা ছুঁইতে পারে ভবিষ্যতের দিগন্ত),

প্রকাশক: দারুস সাহওয়া, কায়রো।

৩৫- أمريكة وأوروبة وإسرائيل

(আমেরিকা-ইউরোপ-ইসরাঈল),

প্রকাশক: ইসলামী গবেষণা একাডেমি, নদওয়াতুল উলামা, লখনৌ, ভারত।

৩৬- إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب

(নিশ্চয় এতে রয়েছে উপদেশ ঐ ব্যক্তির জন্যে, হৃদয় যার উপদেশ গ্রহণে প্রস্তুত),

প্রকাশক: হোসাইন ইবনে মুহাম্মদ, বোম্বাই, ভারত।

৩৭- أهمية الحضارة في تاريخ الديانات وحياة أصحابها

(বিভিন্ন ধর্ম ও তার অনুসারীদের ইতিহাসের আলোকে সভ্যতার গুরুত্ব),

প্রকাশক:

> দারে আরাফাত, রায়বেরেলী, লখনৌ, ভারত।

> মাকতাবাতুদ দার, মদিনা মোনাওয়ারা।

৩৮- أهمية نظام التربية والتعليم في الأقطار الإسلامية وأثره البعيد في اتجاهاتها وقياداتها

(মুসলিম বিশ্বে ইসলামী শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ ব্যবস্থার গুরুত্ব এবং মন-মানস ও নেতৃত্ব গঠনে তার সুদূর প্রসারী প্রভাব),

প্রকাশক: মাকতাবাতুল আমানাহ আল-আম্মাহ, নদওয়াতুল উলামা, লখনৌ, ভারত।

ب

৩৯- بين الانسانية وأصدقائها

(মানবতা এবং তার বন্ধুরা),

প্রকাশক: মাতবাআয়ে বেদারী মালিকাউন নাসেক, ভারত।

৪০- بين الجباية والهداية

(হিদায়াত এবং জিবায়াত (জোর জবরদস্তি),

প্রকাশক: মাকতাবাতুল ইসলাম, লখনৌ, ভারত।

৪১- بين الدين والمدنية

(দীন ও নগরসভ্যতা),

প্রকাশক: মুআসসাসাতুর রিসালাহ, বৈরুত।

৪২- بين الصورة والحقيقة

(আসল ও নকল),

প্রকাশক: ইসলামী গবেষণা একাডেমি, নদওয়াতুল উলামা, লখনৌ, ভারত।

৪৩- بين العالم وجزيرة العرب

(বিশ্ব ও আরব ব-দ্বীপ),

১৯৫০ সালে জেদ্দাস্থ সৌদি রেডিওতে উপস্থাপিত দু'টি কথিকা, পরে মিসর থেকে ১৯৫২ সালে পুস্তিকাকারেও তা প্রকাশিত হয়।

৪৪- بين نظريتين

(দু'টি পথ),

প্রকাশক: ইসলামী গবেষণা একাডেমি, নদওয়াতুল উলামা, লখনৌ, ভারত।

ت

৪৫- تأملات في القرآن الكريم

(কুরআনে কারীম: চেতনার গভীরে),

প্রকাশক: দারুল কলম, দামেস্ক।

৪৬- تأملات في سورة الكهف

(সূরা কাহফ: ভাবনার গভীরে),

প্রকাশক:

> মুআসসাসাতুর রিসালাহ, বৈরুত।
> দারুল ইরশাদ, বৈরুত।
> দারুল মুখতার, কায়রো।

৪৭- ترجمة السيد الإمام أحمد بن عرفان الشهيد

(সীরাতে সায়্যিদ আহমদ শহীদ রহ.),

প্রকাশক: মাতব'আতুল মিনার, মিসর।

৪৮- ترشيد الصحوة الإسلامية

(ইসলামী জাগরণের দিক দিশা),

প্রকাশক:

> দারে আরাফাত, রায়বেরেলী, লখনৌ, ভারত।
> দারুস সালাম, কায়রো।

৪৯- تضحية شباب العرب قنطرة إلى سعادة البشرية
(আরব-তারুণ্যের জীবন-কুরবান-ই মানবতার সৌভাগ্যের সেঁতুপথ),
প্রকাশক: দারে আরাফাত, রায়বেরেলী, লখনৌ, ভারত।

৫০- تعالوا نحاسب نفوسنا وقاداتنا
(আসুন! হিসাব নিই— নিজেদের এবং শাসকবর্গের),
প্রকাশক: দারে আরাফাত, রায়বেরেলী, লখনৌ, ভারত।

৫১- التفسـير السـياسـي للإسلام
(ইসলামের রাজনৈতিক ব্যাখ্যা),
প্রকাশক:
> ইসলামী গবেষণা একাডেমি, নদওয়াতুল উলামা, লখনৌ, ভারত।
> দারে আরাফাত, রায়বেরেলী, লখনৌ, ভারত।
> দারুল কলম, কুয়েত।
> মুআসসাসাতুর রিসালাহ্, বৈরুত।
> দারু আফাকিল গাদ, মিসর।

ث

৫২- ثورة في التفكير
(চিন্তা-বিপ্লব),
إلى الإسلام من جديد -এ পরবর্তীতে তা সংযোজিত হয়েছে।

ج

৫৩- جوانب السيرة المضيئة في المدائح النبوية الفارسية والأردية
(ফারসী-উর্দূ ভাষায় রাসূল প্রশস্তিগাথা'র আলোকিত দিগন্তসমূহ),
প্রকাশক: দারুস সাহওয়া, কায়রো।

ح

৫৪- حاجة البشرية إلى معرفة صحيحة ومجتمع إسلامي
(সঠিক জ্ঞান-প্রজ্ঞা ও ইসলামী সমাজের তালাশে),
প্রকাশক: দারুস সাহওয়া, কায়রো।
এই গ্রন্থে মোট চারটি 'মুহাদারা' (বক্তব্য বা ভাষণ) অন্তর্ভূক্ত হয়েছে।

১. النبوة هي الوسيلة الوحيدة للمعرفة الصحيصحة

২. مطالبة القرآن الانقياد التام والاستسلام الكامل

৩. المجتمع الإسلامي المعاصر

৪. حاجة العالم إلى مجتمع إسلامي مثالي

৫৫- حاجة العالم إلى الدعوة الإسلامية

(ইসলাম ও জীবন),

মাকতাবাতুল হায়াত, কুয়েত।

৫৬- حاجة العالم إلى مجتمع إسلامي مثالي أفضل

(সর্বোত্তম আদর্শ ইসলামী সমাজ ব্যবস্থা ছাড়া পৃথিবীর মুক্তি নেই),

প্রকাশক: ইসলামী গবেষণা একাডেমি, নদওয়াতুল উলামা, লখনৌ, ভারত।

৬৬- الحاجة إلى التركيز على جانب حاسم

(প্রয়োজন— চূড়ান্ত লক্ষ্য স্পর্শ করা),

প্রকাশক: দাওয়াত ও ইসলামী চিন্তা-দর্শন উচ্চতর একাডেমি, নদওয়াতুল উলামা, লখনৌ।

৬৭- حديث مع الغرب

(পাশ্চাত্যের সাথে কিছু কথা),

প্রকাশক:

> দারুল ইরশাদ, বৈরুত।

> দারুল মুখতার, মিসর।

৫৮- الحضارة الغربية الوافدة وأثرها في الجيل المثقف كما يراه شاعر الهند الكبير لسان العصر السيد أكبر حسين الإله آبادي

(হিন্দুস্তানের বিশিষ্ট কবি .. সময়ের সাহসী উচ্চারণ আকবর ইলাহাবাদীর দৃষ্টিতে জেঁকে-বসা পাশ্চাত্য সভ্যতা এবং আধুনিক প্রজন্মের উপর তার (ক্ষতিকর) প্রভাব)),

প্রকাশক:

> আন্তর্জাতিক ইসলামী সাহিত্য সংস্থা, ভারত উপমহাদেশীয় কেন্দ্রিয় কার্যালয়, লখনৌ, ভারত।

> দারুস সাহওয়া, কায়রো।

৫৯- حكمة الدعوة وصفة الدعاة

(দাওয়াতের হিকমত ও কৌশল এবং দাঈ'র গুণ ও বৈশিষ্ট্য),

প্রকাশক:

> ইসলামী গবেষণা একাডেমি, নদওয়াতুল উলামা, লখনৌ, ভারত।

> দারুল বাশাইর আল-ইসলামিয়া, বৈরুত।

خ

৬০- خليج بين الإسلام والمسلمين

(কোথায় মুসলমান আর কোথায় ইসলাম),

প্রকাশক: ইসলামী গবেষণা একাডেমি, নদওয়াতুল উলামা, লখনৌ, ভারত।

৬১- خواطر وفصول

(কিছু স্মৃতি .. কিছু কথা),

প্রকাশক: মাকতাবাতুল ইসলাম, লখনৌ, ভারত।

د

৬২- الداعية الكبير الشيخ محمد إلياس الكاندهلوي ودعوته

(মহান দাঈ আল্লামা মুহাম্মদ ইলিয়াস কান্ধলভী রহ. ও তাঁর দাওয়াত),

প্রকাশক: আল মারকাজুল আরাবী লিল কিতাব, শারজা, সংযুক্ত আরব আমিরাত।

৬৩- دراسة السيرة النبوية من خلال الأدعية المأثورة المروية

(আদইয়ায়ে মা'সূরা'র আলোকে সীরাতে নববী),

প্রকাশক:

> দারুল মুখতার, মিসর।

> ইসলামী গবেষণা একাডেমি, নদওয়াতুল উলামা, লখনৌ, ভারত।

৬৪- درس من الحوادث

(ঘটনা ও শিক্ষা),

أحاديث صريحة مع إخواننا العرب المسلمين কিতাবের সাথে সংযুক্ত করা হয়েছে।

> প্রকাশক: ইসলামী গবেষণা একাডেমি, নদওয়াতুল উলামা, লখনৌ, ভারত।

৬৫- دعوة وتاريخ

(দাওয়াত ও ইতিহাস),

প্রকাশক: আলহাজ মুহাম্মদ ইমরান খান নদভী, আমিদ: দারুল উলুম নদওয়াতুল উলামা, লখনৌ।

৬৬- الدعوة الإسلامية في العصر الحاضر وجبهاتها الحاسمة ومجالاتها الرئيسة

(বর্তমান যুগে ইসলামী দাওয়াত: ময়দান ও ক্ষেত্র),

প্রকাশক: ইসলামী গবেষণা একাডেমি, নদওয়াতুল উলামা, লখনৌ, ভারত।

৬৭- الدعوة الإسلامية في الهند وتطوراتها

(হিন্দুস্তানে ইসলামী দাওয়াত ও তার ক্রমবিকাশ),

প্রকাশক: ইসলামী গবেষণা একাডেমি, নদওয়াতুল উলামা, লখনৌ, ভারত।

৬৮- الدعوة إلى الله حماية المجتمع من الجاهلية وصيانة الدين من التحريف

(আল্লাহর দিকে দাওয়াত: জাহিলিয়াতমুক্ত সমাজ ও বিকৃতিমুক্ত দীন),

প্রকাশক: ইসলামী গবেষণা একাডেমি, নদওয়াতুল উলামা, লখনৌ, ভারত।

৬৯- الدعوة والدعاة مسئولية وتاريخ

(দাওয়াত ও দাঈ: দায়িত্ব ও ইতিহাস),

প্রকাশক: রাবেতায়ে আলমে ইসলামী, মক্কা মোকাররমা।

৭০- دورالإسلام الإصلاحي في مجال العلوم الانسانية

(মানব বিজ্ঞানে ইসলামের সংস্কার আন্দোলন),

প্রকাশক: দারুস সাহওয়া, কায়রো, মিসর।

৭১- دور الإسلام في تقدم البلاد التي دخلها

(বিজিত অঞ্চলে ইসলাম: উন্নয়ন ও সংস্কার ভূমিকা),

হযরত মাওলানার পিতা লিখিত ঐতিহাসিক কিতাব: الثقافة الإسلامية في الهند গ্রন্থের ভূমিকা, যা প্রকাশ করেছিলো দামেস্ক ইসলামী গবেষণা একাডেমি।

৭২- دور الإسلام في نهضة الشعوب

(জাতীয় জাগরণে ইসলামের ভূমিকা),

মদীনায় প্রদত্ত একটি বক্তৃতা।

৭৩- دور الأمة الإسلامية في إنقاذ البشرية وإسعادها

(মানবতার মুক্তি ও আনন্দের বার্তা বয়ে আনে ইসলাম),

প্রকাশক: ইসলামী গবেষণা একাডেমি, নদওয়াতুল উলামা, লখনৌ, ভারত।

৭৪- دور الجامعات الإسلامية المطلوبة في تربية العلماء وتكوين الدعاة وحماية الأقطار الإسلامية من التناقض والمجابهة (উলামা ও দাঈ গঠনে এবং ইসলামী বিশ্বকে দ্বন্দ্ব-সংঘাত থেকে হেফাজত করায় ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের ভূমিকা),

প্রকাশক: ইসলামী গবেষণা একাডেমি, নদওয়াতুল উলামা, লখনৌ, ভারত।

৭৫- دور الحديث في تكوين المناخ الإسلامي وصيانته

(ইসলামী পরিবেশ গঠন ও সংরক্ষণে হাদীসে নববী'র ভূমিকা),

প্রকাশক: ইসলামী গবেষণা একাডেমি, নদওয়াতুল উলামা, লখনৌ, ভারত।

৭৬- دور المسلمين القيادي والاجتهادي في الهند

(হিন্দুস্তানের নেতৃত্ব ও সংস্কারে মুসলমানদের ভূমিকা),

নদওয়াতুল উলামা, লখনৌ, ভারত।

ر

৭৭- ربانية لا رهبانية

(রুহবানিয়াত নয়— চাই রাব্বানিয়াত),

প্রকাশক:
> ইসলামী গবেষণা একাডেমি, নদওয়াতুল উলামা, লখনৌ, ভারত।
> দারুশ শারক, বৈরুত।
> দারুল ফাতাহ, বৈরুত।
> দারুল কলম, দামেস্ক।

৭৮- رجال الفكر والدعوة في الإسلام ১-৪
(ইসলামের চিন্তানায়ক ও দাঈগণ- ১-৪),
প্রকাশক:
> প্রথম সংস্করণ— দামেস্ক বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশনা বিভাগ।
> দারুল কলম, কুয়েত।
> দারুল কলম, দামেস্ক।

৭৯- ردة .. ولا أبا بكر لها
('বুদ্ধিবৃত্তিক ধস নেমেছে ঐ ..
কে ঠেকাবে .. আবু বকর কই!')
প্রকাশক:
> ইসলামী গবেষণা একাডেমি, নদওয়াতুল উলামা, লখনৌ, ভারত।
> দারুল মুখতার আল-ইসলামী, কায়রো, মিসর।
> দারুল মাতবূয়াত আল-হাদিসাহ, জিদ্দা, সৌদি আরব।

৮০- رسائل الأعلام
(বড়দের চিঠি),
প্রকাশক:
> ইসলামী গবেষণা একাডেমি, নদওয়াতুল উলামা, লখনৌ, ভারত।
> দারুস সাহওয়া, কায়রো, মিসর।

৮১- رسالة التوحيد
(তাওহীদের পযগাম),
প্রকাশক:
> প্রকাশনা বিভাগ, নদওয়াতুল উলামা, লখনৌ, ভারত।
> ইসলামী গবেষণা একাডেমি, নদওয়াতুল উলামা, লখনৌ, ভারত।

৮২- رسالة سيرة النبي الأمين إلى إنسان القرن العشرين

(রাসূলে আরাবী'র সীরাতের পয়গাম— বিংশ শতাব্দীর মানুষের কাছে),

প্রকাশক: দারুল হেরা লিল কিতাব, কায়রো, মিসর।

৮৩- روائع إقبال

(ইকবাল সাহিত্যের নন্দনধারা),

প্রকাশক:

> দারুল কলম, কুয়েত।

> ইসলামী গবেষণা একাডেমি, নদওয়াতুল উলামা, লখনৌ, ভারত।

> মজলিসে নাশরিয়াতে ইসলাম, করাচি।

> দারুল কলম, দামেস্ক।

৮৪- روائع من أدب الدعوة في القرآن والسيرة

(কুরআনে কারীম ও সীরাতে নবববীতে দাওয়াতী সাহিত্যের নন্দনধারা),

প্রকাশক:

> আরবী ভাষা ও সাহিত্য অনুষদ, নদওয়াতুল উলামা, লখনৌ, ভারত।

> দারুল কলম, কুয়েত।

س

৮৫- سياسة التربية والتعليم السليمة

(তা'লিম-তারবিয়াতের নিরাপদ দর্শন),

প্রকাশক: ইসলামী গবেষণা একাডেমি, নদওয়াতুল উলামা, লখনৌ, ভারত।

৮৬- سيرة خاتم النبيين (للأطفال)

(শিশু-কিশোর শেষ নবী),

এটি মূলত কাসাসুন নাবিয়্যিনের পঞ্চম খণ্ড।

প্রকাশক:

> মুআসসাসাতুর রিসালাহ, বৈরুত।

> সাংবাদিকতা ও প্রকাশনা বিভাগ, নদওয়া, লখনৌ, ভারত।
> মজলিসে নাশরিয়াতে ইসলাম, করাচি।

৮৭- السيرة النبوية
(নবীয়ে রহমত),
প্রকাশক:
> দারুশ শুরূক, জিদ্দা, সৌদি আরব.
> দারুল কলম, দামেস্ক।
> ইসলামী গবেষণা একাডেমি, নদওয়াতুল উলামা, লখনৌ, ভারত।
> মজলিসে নাশরিয়াতে ইসলাম, ঢাকা, বাংলাদেশ।
> ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, বাংলাদেশ।

ش

৮৮- شاعر الإسلام الدكتور محمد إقبال
(ইসলামের কবি ড. মুহাম্মদ ইকবাল),
আল্লামা ইকবাল সম্পর্কে দু'টি বক্তৃতা, যা পরবর্তীতে روائع إقبال -এ সংযোজিত হয়েছে।
প্রকাশক: মাতবা'আয়ে দারুল কিতাব আল-আরাবী।

৮৯- شخصيات وكتب
(বড়দের জীবন কথা .. বড়দের কীর্তিগাথা),
প্রকাশক:
> দারুল কলম, দামেস্ক।
> আরবী ভাষা ও সাহিত্য অনুষদ, নদওয়াতুল উলামা, লখনৌ, ভারত।
> দারস সাহওয়া, কায়রো, মিসর।

ص

৯০- الصراع بين الإيمان والمادية
(ঈমান ও বস্তুবাদের লড়াই),
প্রকাশক:

> দারুল কলম, কুয়েত।
> দারুল কলম, দামেস্ক।
> দারুল মুখতার আল-ইসলামী, মিসর।

৯১- الصراع بين الفكرة الإسلامية والفكرة الغربية في الأقطار الإسلامية
(মুসলিম বিশ্বে ইসলামী ও পাশ্চাত্য সভ্যতার সংঘাত),
প্রকাশক:
> দারুল কলম, কুয়েত।
> দারুল কলম, দামেস্ক।

৯২- صلاح الدين الأيوبي
(সালাহুদ্দীন আইয়ূবী),
প্রকাশক: দারে আরাফাত, রায়বেরেলী, লখনৌ, ভারত।

৯৩- صورتان متضادتان
(দুটি বিপরীত চিত্র),
> প্রকাশক: আরবী ভাষা ও সাহিত্য অনুষদ, নদওয়াতুল উলামা, লখনৌ, ভারত।
> দারুস সাহওয়া, কায়রো, মিসর।
> দারুল কলম, দামেস্ক।
> ইসলামী ঐতিহ্য সংরক্ষণ সংস্থা, কাতার।

ط

৯৪- الطريق إلى السعادة والقيادة للدول والمجتمعات الإسلامية الحرة
(সৌভাগ্য ও নেতৃত্ব: স্বাধীন ইসলামী সমাজ ও রাষ্ট্রের জন্যে),
প্রকাশক: মুআসসাসাতুর রিসালাহ, বৈরুত।

৯৫- الطريق إلى المدينة
(মদীনা, আমার মদীনা!),
প্রকাশক:
> আরবী ভাষা ও সাহিত্য অনুষদ, নদওয়াতুল উলামা, লখনৌ, ভারত।

> মাকতাবায়ে ইলমিয়া, মদীনা।
> দারুল কলম, দামেস্ক।
> দারুল মুখতার আল-ইসলামী, মিসর।

ع

৯৬- عاصفة يواجهها العالم الإسلامي والعربي

(যে তোফান মুকাবিলা করছে মুসলিম ও আরব বিশ্ব),
প্রকাশক: ইসলামী গবেষণা একাডেমি, নদওয়াতুল উলামা, লখনৌ, ভারত।

৯৭- العرب والإسلام

(আরব জাতি ও ইসলাম),
প্রকাশক:
> ইসলামী গবেষণা একাডেমি, নদওয়াতুল উলামা, লখনৌ, ভারত।
> আল মাকতাবুল ইসলামী, বৈরুত।
> দারুল মানারাহ, জিদ্দা।

৯৮- العرب يكتشفون أنفسهم

(আরব জাতি: আত্ম পরিচয়ের সন্ধানে),
প্রকাশক: ইসলামী গবেষণা একাডেমি, নদওয়াতুল উলামা, লখনৌ, ভারত।

৯৯- على الخشبة

(আলাল খাশাবাহ),
প্রকাশক:
> ইসলামী শিক্ষা পরিষদ, লখনৌ।
> দারে ইবনে কাসীর, দামেস্ক।

১০০- العقيدة والعبادة والسلوك

(আকিদা-ইবাদত-তাযকিয়া— ইসলামী জীবন বিধান),
প্রকাশক:
> ইসলামী গবেষণা একাডেমি, নদওয়াতুল উলামা, লখনৌ, ভারত।

> দারে ইবনে কাসীর, দামেস্ক।

> দারুল কলম, কুয়েত।

> দারুল বশির, মিসর. (منهاج الصالحين) শিরোনামে।

১০১- العوامل الأساسية لكارثة فلسطين

(ফিলিস্তিন সমস্যার মূল কারণসমূহ),

প্রকাশক: দারুর রিসালাহ, বৈরুত।

غ

১০২- غارة التتار على العالم الإسلامي وظهور معجزة الإسلام

(মুসলিম বিশ্বে তাতারি-আগ্রাসন এবং ইসলামের মু'জিযার জ্বলন্ত প্রকাশ),

প্রকাশক: দারুল মুখতার আল-ইসলামী, মিসর।

ف

১০৩- فاستخف قومه فأطاعوه

প্রকাশক: নদওয়াতুল উলামা, লখনৌ, ভারত।

১০৪- الفتح للعرب المسلمين

(আরব মুসলমানদের বিজয়ধারা),

প্রকাশক:

> ইসলামী গবেষণা একাডেমি, নদওয়াতুল উলামা, লখনৌ, ভারত।

> দারুল মুখতার আল-ইসলামী, মিসর।

১০৫- فضل البعثة المحمدية على الانسانية

(বিশ্ব মানবতার প্রতি নবুয়তে মুহাম্মদী'র অনুগ্রহ),

প্রকাশক: ইসলামী গবেষণা একাডেমি, নদওয়াতুল উলামা, লখনৌ, ভারত।

১০৬- في ظلال البعثة المحمدية على الانسانية

(মানবতার উপর নবুয়তে মুহাম্মদী'র ছায়া),

প্রকাশক: ইসলামী গবেষণা একাডেমি, নদওয়াতুল উলামা, লখনৌ, ভারত।

১০৭- في مسيرة الحياة ১-৩
(জীবন সফরে ১-৩),
প্রকাশক: দারুল কলম, দামেস্ক।

ق

১০৮- القاديانية ثورة على النبوة المحمدية والإسلام
(কাদিয়ানী মতবাদ: নবুয়তে মুহাম্মদী এবং ইসলামের বিরুদ্ধে একটি বিদ্রোহ),
প্রকাশক: রাবেতায়ে আলমে ইসলামী, মক্কা মুকাররমা।

১০৯- القاديانية مؤامرة خطيرة وثورة على النبوة المحمدية
(কাদিয়ানী মতবাদ: নবুয়তে মুআম্মদী'র বিরুদ্ধে এক গভীর ষড়যন্ত্র),
প্রকাশক: ইসলামী সম্মেলন কার্যালয়, নদওয়াতুল উলামা, লখনৌ, ভারত।

১১০- القادياني والقاديانية
(কাদিয়ানী সম্প্রদায় ও কাদিয়ানী মতবাদ),
প্রকাশক:দারুস সাউদিয়া, জিদ্দা।

১১১- قارنوا بين الربح والخسارة
(লাভ ক্ষতি),
প্রকাশক: ইসলামী গবেষণা একাডেমি, নদওয়াতুল উলামা, লখনৌ, ভারত।

১১২- القراءة الراشدة للأطفال ১-৩
(আল-কিরাআতুর রাশিদাহ ১-৩),
প্রকাশক:
> সাংবাদিকতা ও প্রকাশনা বিভাগ, দারুল উলুম নদওয়াতুল উলামা, লখনৌ, ভারত।
> মজলিসে নাশরিয়াতে ইসলাম, করাচি, পাকিস্তান।

১১৩- القرن الخامس عشر الهجري الجديد في ضوء التاريخ والواقع
(ইতিহাস ও বাস্তবতার আলোকে নতুন হিজরী পনের শতক),

প্রকাশক:
> ইসলামী গবেষণা একাডেমি, নদওয়াতুল উলামা, লখনৌ, ভারত।
> মাতাবিয়ুর রাশিদ, মদীনা মোনাওয়ারা।

১১৪- قصص من التاريخ الإسلامي للأطفال
(ইসলামী ইতিহাসের গল্প),
প্রকাশক: আন্তর্জাতিক ইসলামী সাহিত্য সংস্থা।

১১৫- قصص النبيين للأطفال ১-৫
(শিশু-কিশোর সিরিজ কাসাসুন নাবিয়্যিন ১-৫),
প্রকাশক:
> মুআসাসাতুর রিসালাহ, বৈরুত।
> মুআসাসাতুস সাহাফাহ ওয়ান নাশ্‌র, নদওয়াতুল উলামা, লখনৌ, ভারত।
> মজলিসে নাশরিয়াতে ইসলাম, করাচি, পাকিস্তান।

১১৬- قصة كتاب يحكيها مؤلفه
(লেখকের বলা একটি বইয়ের কাহিনী),
প্রকাশক: ইসলামী গবেষণা একাডেমি, নদওয়াতুল উলামা, লখনৌ, ভারত।

১১৭- قيمة الأمة الإسلامية بين الأمم
(বিভিন্ন জাতি ও সম্প্রদায়ের মাঝে মুসলিম উম্মাহর শ্রেষ্ঠত্ব ও অবস্থান),
প্রকাশক: ধর্ম মন্ত্রণালয়, কাতার।

ك

১১৮- كارثة التعصب اللغوي والثقافي
(ভাষা ও সংস্কৃতিভিত্তিক গোঁড়ামি'র খেসারত),
প্রকাশক: মুআসাসাতুল কিতাব, বৈরুত।

১১৯- كيف دخل العرب التاريخَ
(আরব জাতি যখন ইতিহাসের স্রষ্টা),
প্রকাশক: ইসলামী গবেষণা একাডেমি, নদওয়াতুল উলামা, লখনৌ, ভারত।

১২০- كيف ينظر المسلمون إلي الحجاز وجزيرة العرب

(হিজাযভূমি ও আরব-বদ্বীপের কাছে মুসলমানদের প্রত্যাশা),

প্রকাশক:

> দারুল ই'তিসাম, কায়রো, মিসর।

> ইসলামী গবেষণা একাডেমি, নদওয়াতুল উলামা, লখনৌ, ভারত।

১২১- كلمة عن أدب التراجم والحديث عن الكتب

প্রকাশক: আরবী ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ, নদওয়াতুল উলামা।

১২২- كيف توجه المعارف في الأقطار الإسلامية

(মুসলিম বিশ্বে জ্ঞান বিস্তারের পন্থা),

প্রকাশক: গবেষণা, ফতওয়া ও সর্বোচ্চ দাওয়াত সংস্থা, রিয়াদ, সৌদি আরব।

م

১২৩- المأساة الأخيرة في العالم ودراستها من الناحية الدينية والخلقية والمبدئية والدعوية وتحليل أسبابها وانعكاساتها

(সর্বশেষ বৈশ্বিক ট্রাজেডি: দীনি-নৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে তার বিশ্লেষণ ও চিত্রায়ন), ১৯৯০ সালে ইরাক কর্তৃক কুয়েত-আগ্রাসন-পরবর্তী প্রতিক্রিয়ায় প্রদত্ত শায়খ নদভী'র একটি গুরুত্বপূর্ণ ভাষণ।

প্রকাশক: ইসলামী গবেষণা একাডেমি, নদওয়াতুল উলামা, লখনৌ, ভারত।

১২৪- المأساة الفلسطينية في بيروت

(বৈরুতে ঘটে যাওয়া ফিলিস্তিনী ট্রাজেডি),

১৯৮২ সালে বর্বর ইহুদী কর্তৃক সাবরা-শাতিলার হত্যাযজ্ঞ পরবর্তী বেদনাসঞ্জাত প্রতিক্রিয়ায় শায়খ নদভী,

প্রকাশক: নদওয়াতুল উলামা, লখনৌ, ভারত।

১২৫- ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين

(মুসলমানদের অধঃপতনে বিশ্ব কী হারালো?),

প্রকাশক:

> অনুবাদ, সঙ্কলন ও প্রকাশনা পরিষদ, কায়রো, মিসর (১৯৫১ সাল)।

> মাতবা'আতু দারিল কিতাব আল-আরাবী, মিসর. (১৯৫১ সাল)।

> দারুল আরুবাহ, কায়রো, মিসর।

> দারুল কিতাব আল-আরাবী, বৈরুত।

> দারে উমর ইবনে খাত্তাব, আলেকজান্দ্রিয়া।

> মাকতাবাতুল মা'আরিফ, কায়রো, মিসর।

> মাকতাবাতুস সুন্নাহ, কায়রো।

> মাকতাবাতুল ঈমান, আল-মানসূরাহ, মিসর।

> দারুল আনসার, কায়রো, মিসর।

> দারুল জিল, বৈরুত।

> মাকতাবাতু নিযার মোস্তফা আল-বায, রিয়াদ, সৌদি আরব।

> আল-ইত্তেহাদ আল-ইসলামী লিল মুনাজ্জামাত আত তুল্লাবিয়্যাহ, কুয়েত।

> ইসলামী ঐতিহ্য সংরক্ষণ সংস্থা, কাতার।

> খলীফা বিন হামাদ আলে সানী, কাতার।

> মজলিসে নাশরিয়াতে ইসলাম, করাচি, পাকিস্তান।

> দারুল কলম, কুয়েত।

> দারুল কলম, দামেস্ক।

১২৬- المجتمع الإسلامي المعاصر فضله وقيمته، حاجاته ومتطلباته، وطرق الانتفاع به

(আধুনিক ইসলামী সমাজ: তার অবদান ও অবস্থান এবং প্রয়োজন ও চাহিদা),

প্রকাশক: ইসলামী গবেষণা একাডেমি, নদওয়াতুল উলামা, লখনৌ, ভারত।

১২৭- محمد رسول الله الأعظم وصاحب المنة الكبرى على العالم، ومسئولية العالم المتمدن المنصف الأدبية والخلقية نحوه

(মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম- এর কাছে বিশ্ব ঋণী এবং তাঁর প্রতি সভ্য দুনিয়ার কর্তব্য)

প্রকাশক:
> দারে আরাফাত, রায়বেরেলী, লখনৌ, ভারত।
> দারুস সাহওয়া, কায়রো, মিসর।

১২৮- مختارات من أدب العرب ১-২
(মুখতারাত ১-২),
প্রকাশক:
> দারুশ শুরুক, জিদ্দা।
> সাংবাদিকতা ও প্রকাশনা বিভাগ, নদওয়াতুল উলামা, লখনৌ।
> মজলিসে নাশরিয়াতে ইসলাম, করাচি।

১২৯- المدخل إلى دراسات الحديث
(হাদীস অধ্যয়নের প্রবেশদ্বার),
প্রকাশক:
> ইসলামী গবেষণা একাডেমি, নদওয়াতুল উলামা, লখনৌ, ভারত।
> দারুস সাহওয়া, কায়রো।

১৩০- المد والجزر في تاريخ الإسلام
(ইসলামের ইতিহাসে জোয়ার ভাটা),
প্রকাশক:
> ইসলামী গবেষণা একাডেমি, নদওয়াতুল উলামা, লখনৌ, ভারত।
> দারুল কলম, দামেস্ক।

১৩১- مذكرات سائح في الشرق العربي
(মধ্যপ্রাচ্য ঘুরে-আসা এক পরিব্রাজকের ডায়রী),
প্রকাশক: মুআসাসাতুর রিসালাহ, বৈরুত।

১৩২- المرتضى (سيرة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه)
(আল- মুরতাযা (আমীরুল মু'মিনীন আলী রা. এর জীবন চরিত),
প্রকাশক:
> ইসলামী গবেষণা একাডেমি, নদওয়াতুল উলামা, লখনৌ, ভারত।
> দারুল কলম, দামেস্ক।

১৩৩- مستقبل الأمة العربية الإسلامية بعد حرب الخليج

(আরব মুসলিম উম্মাহর ভবিষ্যত: উপসাগরীয় যুদ্ধের পর),

প্রকাশক:

> ইসলামী গবেষণা একাডেমি, নদওয়াতুল উলামা, লখনৌ, ভারত।

> দারুস সালাম, কায়রো।

১৩৪- المسلمون تجاه الحضارة الغربية

(মুসলিম উম্মাহ্ ও পাশ্চাত্য সভ্যতা),

প্রকাশক: দারুল মুজতামা'আ, জিদ্দা।

১৩৫- المسلون في الهند

(হিন্দুস্তানের মুসলমানরা),

প্রকাশক:

> ইসলামী গবেষণা একাডেমি, নদওয়াতুল উলামা, লখনৌ, ভারত।

> দারুল ফাতহ, দামেস্ক।

১৩৬- المسلمون ودورهم

(মুসলিম উম্মাহ্ এবং তাদের ভূমিকা),

প্রকাশক: মাকতাবাতুল আমাল, কুয়েত।

১৩৭- مصادر العلوم الإسلامية

(ইসলামী জ্ঞানের উৎসধারা),

প্রকাশক:

> দারু মাকতাবাতিল হায়াত, বৈরুত।

> মুআসসাসাতুল কিতাব, বৈরুত।

১৩৮- المسلمون وقضية فلسطين

(ফিলিস্তিন ও মুসলিম উম্মাহর সমস্যা),

প্রকাশক:আদ দার আল-কুওয়াইতিয়্যাহ, কুয়েত।

১৩৯- مطالبة القرآن: الانقياد التام والاستسلام الكامل

(কুরআনের দাবি: পূর্ণ আনুগত্য   পূর্ণ আত্মসমর্পণ),

প্রকাশক: ইসলামী গবেষণা একাডেমি, নদওয়াতুল উলামা, লখনৌ, ভারত।

১৪০- مع الإسلام
(ইসলামের সাথে),

১৪১- معقل الانسانية
(মানবতার আশ্রয়গাহ),
প্রকাশক: দাওয়াত ও উচ্চতর ইসলামী গবেষণা একাডেমি, নদওয়াতুল উলামা, লখনৌ, ভারত।

১৪২- دليل المعهد العالي للدعوة والفكر الإسلامي بدار العلوم لندوة العلماء، الهند
(নদওয়াতুল উলামা পরিচালিত ইসলামী দাওয়াত ও উচ্চতর গবেষণা একাডেমি)।

১৪৩- ملة إبراهيم وحضارة الإسلام يجب أن ندعو إليها على بصيرة وثقة
(মিল্লাতে ইবরাহিমী ও ইসলামী সভ্যতা: এসো সবাই তার দিকে),
প্রকাশক: ইসলামী গবেষণা একাডেমি, নদওয়াতুল উলামা, লখনৌ, ভারত।

১৪৪- من الجاهلية إلى الإسلام
(জাহিলিয়াত থেকে ইসলাম),
প্রকাশক:
> মাকতাবাতুল ইসলাম, লখনৌ।
> জামা'আতু আনসারিস সুন্নাহ, কায়রো।
> আল-মারকাজুল ইসলামী, জেনেভা।

১৪৫- من دون أحد
(ওহুদের ঐ ময়দান থেকে!),
প্রকাশক: ইদারাতু তা'লিমাতিল ইসলাম, লখনৌ, ভারত।

১৪৬- من غار حراء
(হেরার ঐ জ্যোতি দেখো ..),
প্রকাশক: মাকতাবাতুল মানার, কুয়েত।

১৪৭- من نفحات الإيمان
(ঈমানের বসন্ত হাওয়া),
প্রকাশক: মাকতাবাতুল ইসলাম, লখনৌ, ভারত।

১৪৮- من نهر كابل إلى نهر اليرموك
(কাবুল নদ থেকে ইয়ারমুক নদ),
প্রকাশক: মুআসসাসাতুর রিসালাহ, বৈরুত।

১৪৯- منهج أفضل في الإصلاح للدعاة والعلماء
(দাঈ ও উলামায়ে কেরামের সংস্কার কর্মের শ্রেষ্ঠ পন্থা),
প্রকাশক: ইসলামী গবেষণা একাডেমি, নদওয়াতুল উলামা, লখনৌ, ভারত।

১৫০- موقف العالم الإسلامي تجاه الحضارة الغربية
এটি শায়খ নদভী'র বিশিষ্ট কিতাব- الصراع بين الفكرة الإسلامية والفكرة الغربية في الأقطار الإسلامية (মুসলিম বিশ্বে ইসলামী সভ্যতা ও পাশ্চাত্য সভ্যতার সংঘাত) এর ভিন্ন নাম।

১৫১- موقف المسلم إزاء أسلافه الجاهليين
(জাহিলী যুগের পূর্ব পুরুষদের ব্যাপারে মুসলমানদের অবস্থান).

ن

১৫১-النبوة والأنبياء في ضوء القرآن
(কুরআনের আলোকে নবী ও নবুয়ত),
প্রকাশক: দারুল কলম, দামেস্ক।

১৫২- النبوة هي الوسيلة الوحيدة للمعرفة الصحيحة والهداية الكاملة
(নবুয়ত-ই সঠিক জ্ঞান ও পরিপূর্ণ হিদায়াত প্রাপ্তির একমাত্র পথ),
প্রকাশক: ইসলামী গবেষণা একাডেমি, নদওয়াতুল উলামা, লখনৌ, ভারত।

১৫৩- النبي الخاتم
(শেষ নবী),

প্রকাশক:
> ইসলামী গবেষণা একাডেমি, নদওয়াতুল উলামা, লখনৌ, ভারত।
> দারুল মুখতার আল-ইসলামী, কায়রো।

১৫৪- النبي الخاتم والدين الكامل وما لهما من أهمية في تاريخ الأديان والملل
(শেষ নবী ও পরিপূর্ণ দীন: বিভিন্ন ধর্ম ও জাতির ইতিহাসের আলোকে তার গুরুত্ব),
প্রকাশক: ইসলামী গবেষণা একাডেমি, নদওয়াতুল উলামা, লখনৌ, ভারত।

১৫৫- نحن الآن في المغرب
(আমরা এখন মরক্কো'য়!)
প্রকাশক: ইসলামী গবেষণা একাডেমি, নদওয়াতুল উলামা, লখনৌ, ভারত.

১৫৬- نحو تكوين مجتمع إسلامي جديد
(এসো গড়ি নতুন করে সেই ইসলামী সমাজ!),
প্রকাশক: ইসলামী গবেষণা একাডেমি, নদওয়াতুল উলামা, লখনৌ, ভারত।

১৫৭- ندوة العلماء: تاريخها ورسالتها
(নদওয়াতুল উলামা: ইতিহাস ও পয়গাম),
প্রকাশক: ইসলামী গবেষণা একাডেমি, নদওয়াতুল উলামা, লখনৌ, ভারত।

১৫৮- ندوة العلماء: مدرسة فكرية شاملة
(নদওয়াতুল উলামা: একটি ব্যাপকভিত্তিক 'ফিকরি মাদরাসা'),
প্রকাশক: নদওয়াতুল উলামা।

১৫৯- نظامان إلهيان للغلبة والانتصار
(বিজয় ও সফলতার দুটি ইলাহি নিযাম),
প্রকাশক: ইসলামী গবেষণা একাডেমি, নদওয়াতুল উলামা, লখনৌ, ভারত।

১৬০- نظام التربية والتعليم في الأقطار الإسلامية وأثره البعيد في اتجاهاتها وقياداتها

(মুসলিম বিশ্বে তা'লিম ও তারবিয়াত এবং মন-মানস ও নেতৃত্ব গঠনে তার সুদূর প্রভাব),

প্রকাশক: তা'মিরাত ও উন্নয়ন বিভাগ, নদওয়াতুল উলামা।

১৬১- نظرات في الأدب

(আদব বা সাহিত্য নিয়ে কিছু কথা),

প্রকাশক: আন্তর্জাতিক ইসলামী সাহিত্য সংস্থা।

১৬২- نظرات على الجامع الصحيح للإمام البخاري وميزات أبوابه وتراجمه

(বুখারী শরীফ এবং তার সন্নিবেশনের বৈশিষ্ট্য),

প্রকাশক: ইমাম আহমদ ইবনে ইরফান শহীদ রহ.একাডেমি, রায়বেরেলী. লখনৌ, ভারত।

১৬৩- نظرة جديدة إلى التراث الأدبي العربي

(আরবী সাহিত্যের ঐতিহ্য নিয়ে কিছু নতুন কথা),

প্রকাশক: আন্তর্জাতিক ইসলামী সাহিত্য সেমিনার, নদওয়াতুল উলামা, লখনৌ, ভারত।

১৬৪- نظرة مؤمن واعٍ إلى المدنيات المعاصرة الزائفة

(সচেতন মুসলমানের দৃষ্টিতে অসারতাপূর্ণ আধুনিক নগর সভ্যতা),

প্রকাশক:

> দারে আরাফাত, রায়বেরেলী, লখনৌ. ভারত।

> ইসলামী গবেষণা একাডেমি, নদওয়াতুল উলামা, লখনৌ, ভারত।

১৬৫- نفحات الإيمان بين صنعاء وعمان

(সান'আ ও আম্মানে বইলো যখন ঈমানের শীতল হাওয়া),

প্রকাশক:

> ইসলামী গবেষণা একাডেমি, নদওয়াতুল উলামা, লখনৌ, ভারত।

> দারুস সাহওয়া, কায়রো।

> মুআসসাসাতুর রিসালাহ, বৈরুত।

ه

১৬৬- هلال رمضان يتكلم
(কথা বলে রমজানের এই চাঁদ!),
প্রকাশক: মাকতাবাতুল ইসলাম, লখনৌ, ভারত।

و

১৬৭- وأذن في الناس بالحج
(দাও হজ্বের ঘোষণা মানুষের মাঝে),
প্রকাশক: ইসলামী গবেষণা একাডেমি, নদওয়াতুল উলামা, লখনৌ, ভারত।

১৬৮- وامعتصماه!
(বাঁচাও, বাঁচাও হে মু'তাসিম!),
প্রকাশক: ইসলামী গবেষণা একাডেমি, নদওয়াতুল উলামা, লখনৌ, ভারত।

* * *

উপসংহার

বলেছেন তাঁরা আবুল হাসান আলী নদভী সম্পর্কে

*** আমিন আল-হোসাইনী :**

'নদভী .. নিষ্ঠাবান মু'মিন! তিনি শুধু রোগই নির্ণয় করতেন না, ঔষধও বাতলে দিতেন!'

*** আল-বাহি আল- খাওলী :**

'নদভী .. এক মর্দে মু'মিন! আল্লাহ্‌র পথের মুজাহিদ!'

*** মুহাম্মদ আল-আরাবী :**

'নদভী .. প্রতিভাধর অনুসন্ধানী সাহিত্যিক! আলেম, ঐতিহাসিক! বংশ কৌলিন্যের শীর্ষ চূড়ায় তাঁর দ্যুতিময় অবস্থান!'

*** হাসান মুহাম্মদ আল-মিশাত :**

'নদভী .. আল্লামা! মহান কীর্তিপুরুষ!'

*** সায়্যিদ আলাভী আব্বাস মালেকী :**

'নদভী .. আকাবির-কাফেলার গর্বের ধন! উত্তরসুরীদের অহঙ্কার! আলেম, আল্লামা! জ্ঞান সমুদ্র! বুদ্ধিদীপ্ত তাপস! সুকুমারবৃত্তির মোহন পরশে হৃদয়কাড়া তাঁর চরিত্র! সুন্নতে নববী'র একনিষ্ঠ নিশান বরদার! কী কী বলবো আমি তাঁর সম্পর্কে?! গর্ব করার কী নেই তাঁর মাঝে?! শ্রেষ্ঠত্ব-মহত্ত্ব-কৃতিত্ব-মহানুভবতা মিশে আছে তাঁর রক্তের কণিকায়-কণিকায়! এক হাতে তাঁর কলম আরেক হাতে তলোয়ার!!'

*** আবদুল আযিয বিন আবদুল্লাহ বিন বায :**

'নদভী ..আল্লামা! দান-অবদানে চির অম্লান তাঁর জীবন!'

*** মুহাম্মদ বাহজাহ আল-বিতার :**

'নদভী .. ইলমের বিস্তৃত শাখা-প্রশাখায় পরিব্যাপ্ত বিশাল এক মহিরূহ! অবদানে-অবদানে ইসলামী সাহিত্যকে করেছেন তিনি সমৃদ্ধ ও গৌরবদীপ্ত! উম্মাহকে-জাতিকে দিয়েছেন বড়ো অপার করে! তাঁর দুর্লভ সব গুণের কথা বলতে-বলতে শেষ-যে হবে না! সে-যে বড়ো মিষ্টি! বড়ো হৃদয়কাড়া!!'

*** মুহাম্মদ বাহজাহ আল-আসারী :**

'নদভী .. আল্লামা! গবেষক, লেখক, চিন্তাবিদ!'

*** আবদুল আযিয আল-মোবারক :**

'নদভী .. ইসলামের মহান দাঈ! ইসলামের পক্ষে আজীবন লড়াই করে গেছেন কখনো কলমের ভাষায় কখনো মুখের ভাষায়! তাঁর জ্ঞান-বুদ্ধি ও অনুভব-উপলব্ধি ছলছল প্রবাহে বহমান ছিলো সঠিক ও স্বচ্ছ ধারায়! সমন্বয়ের প্রশ্ন এলে তিনিই ছিলেন সেরা সমন্বয়কারী! তিনি নববী বংশধারার নির্যাস! তিনি মুহাম্মদে আরাবী'র পরিবারের সদস্য!'

*** আবদুল ফাত্তাহ আবু গুদ্দাহ :**

নদভী .. আল্লামা! দাঈ, উম্মাহর অমর প্রাপ্তি, উম্মাহর অফুরান ভালোবাসা!'

*** ড. মোস্তফা আস সিবাঈ :**

'নদভী .. ইসলাম ও ইসলামী দাওয়াতের মহা সম্পদ। তাত্ত্বিক নৈপুণ্যে ভাস্বর তাঁর লেখা ও গ্রন্থনা। ইসলামী শরীয়তের গভীর রহস্য ও গূঢ় তাৎপর্য উপলব্ধি করেছিলেন তিনি বড়ো গভীর করে! মুসলিম বিশ্বের সমস্যা চিহ্নিতই করেন নি তিনি শুধু, দরদী বন্ধুর মতো বাতলে গেছেন তার সমাধানও।'

*** সায়্যিদ কুতব :**

'নদভী .. উম্মতের কল্যাণ-চিন্তায় নিবেদিত এক মহান পুরুষ! তাঁকে জেনেছি আমি তাঁর ব্যক্তিত্বে .. তাঁর কলমে। তাঁর ভিতরে দেখেছি আমি

মু'মিনের হৃদয়, মু'মিনের জ্ঞান, মু'মিনের প্রজ্ঞা। হ্যাঁ .. তাঁর ভিতরে দেখেছি আমি উম্মতের কল্যাণ-চিন্তায় নিবেদিত এক মহান পুরুষকে। ভাবতেন তিনি— শুধু ইসলামকে নিয়ে, শুধু ইসলামের জন্যে, শুধু ইসলামের সার্থে। এ ছিলো তাঁর জীবনের সবচে' বড় প্রত্যয় ও অঙ্গিকার। আমি আল্লাহ্‌র নামে শপথ করেই বলতে পারি— এ আমার অকপট সাক্ষ্য।'

*** সালেহ্ আল-ইশমাভী :**

'নদভী .. তিনি আলেম, তিনি আমেল, তিনি আরেফবিল্লাহ্!'

*** মুহাম্মদ মাহমুদ আস সাওয়াফ :**

'নদভী .. আল্লামা, আল্লাহ্‌র পথের মুজাহিদ।'

*** মুহাম্মদ আহমদ বাশমিল :**

'নদভী .. মহান মুজাহিদ, আল্লাহ্‌র কাছেই ছিলো তাঁর সবকিছু চাওয়ার এবং পাওয়ার।'

*** যাকি আলী :**

'নদভী .. ইসলামী চিন্তা-দর্শনের আকাশে তিনি এক জ্বলজ্বলে নক্ষত্র। তিনি ইসলামী লেখক-সাহিত্যিকদের সবুজ উদ্যানে প্রতিভার সৌরভ-ছড়ানো এক তাজা ফুল।'

*** আনোয়ার আল-জুনদি :**

'তাঁর লেখক সত্ত্বায় রয়েছে অপরূপ রূপময়তায় কারুকার্যময় এবং অপূর্ব নন্দনতত্ত্বে উদ্ভাসময়— এক ব্যতিক্রমী ধারা ও 'ষ্টাইল'। যা বলতে চান তিনি তা বলেন বড়ো দক্ষতায়, বড়ো হৃদয়ছোঁয়া ভাষায়।'

*** মুহাম্মদ রাবে হাসানী নদভী :**

'শায়খ নদভী .. দীন নিয়ে গর্ব করেন যে মুসলমানরা, তাঁদের তিনি আদর্শ। যাঁরা ইসলামের মর্যাদা ও ঐতিহ্যের পথে সংগ্রাম করেন, তাঁদেরও তিনি আদর্শ। যাঁরা ইসলামের পক্ষে প্রতিরোধ লড়াইয়ে রত, যাঁরা

ইসলামের রূহ ও প্রাণময়তায় অভিষিক্ত, যাঁরা ইসলামের প্রকৃত 'মেযাজ' বা প্রকৃতি সম্পর্কে সজাগ-সচেতন, তাঁদেরও তিনি একজন।'

*** উমর ইবনে মুহাম্মদ আস সুবায়্যিল :**

'নদভী .. এক মহান কীর্তিপুরুষ। জিহাদ করে গেছেন আজীবন হকের পথে .. দীনের পথে।'

*** মুহাম্মদ হামিদুদ্দীন আল-হুসামী :**

'নদভী .. একাই যেনো এক জাতি। মহান দুর্লভ ব্যক্তিত্ব। তাঁর দর্শন-চিন্তা অসংখ্য বিষয় ও বৈচিত্রে বিস্তৃত। দর্শন-চিন্তায় তিনি যেনো এক চলন্ত বিশ্বকোষ। কালের গর্ভে এমন প্রতিভাধর মনীষী বড়ো কম জন্মায়।'

*** আবদুল হালিম ওয়াইস :**

'নদভী .. এক মহান বুযুর্গ, একদিনের জন্যেও দায়িত্ব-বিস্মৃত হন নি। একদিনের জন্যেও কারো দ্বারমুখী হন নি। একদিনের জন্যেও দুনিয়া লাভের প্রতিযোগিতায় নামেন নি।'

*** মারগুবুর রহমান কাসেমী :**

'শায়খ নদভী .. মহান বুযুর্গ। দীন ইলম ও মানবতা মিশেছিলো তাঁর রক্তের কণায় কণায়।'

*** মুহাম্মদ আবদুহু ইয়ামেনী :**

'নদভী .. ইসলাম ও ইসলামী দাওয়াতের তরে জীবন বিলিয়ে-দেয়া এক মহান পুরুষ। তাঁর জীবন প্রবাহ, তাঁর সূচনা-সমাপ্তি, তাঁর শুরু-শেষ সবই ছিলো— শুধু ইসলামকে কেন্দ্র করে .. ইসলামের দাওয়াতকে ঘিরে।'

*** ওয়াজেহ রশিদ নদভী :**

'তিনি ইতিহাস নির্মাণের মহান সেনাপতি। চিন্তা-সংস্কারের মহান পথিকৃত।'

*** নূর আলম আমিনী :**

'লেখক, বক্তা। আদর্শ চিন্তাবিদ।'

*** মুহাম্মদ লোকমান আজমী নদভী :**

'নদভী .. ব্যতিক্রমী বৈশিষ্ট্যে দেদীপ্যমান। সবক্ষেত্রে। যেমন ইলমী ময়দানে তেমনি দাওয়াতি যিন্দেগীতে।'

*** সায়্যিদ হামেদ :**

'নদভী .. ঈমান ও সততা কেন্দ্রিক চেতনায় যিনি জ্বলেন, কতো জ্বলেছেন!!'

*** ইশরাত আলী সিদ্দিকী :**

'নদভী .. সেই দুর্লভ ব্যক্তিত্ব, যাঁর মাঝে সমাবেশ ঘটেছিলো নেতৃত্ব দানের সকল গুণাবলির।'

*** আবদুল হালিম মাহমুদ :**

'নদভী ..আল্লাহ্‌র রিযা ও সন্তুষ্টি যাঁর সবচে' বড় চাওয়া পাওয়া। আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের পথে চলেছেন তিনি এই ইখলাস ও নিষ্ঠাকে পাথেয় বানিয়েই। তিনি মানুষকে ইসলামের দিকে ডেকেছেন ইসলামের শ্রেষ্ঠ নমুনা ও আদর্শ দ্বারা .. তাঁর কালজয়ী গ্রন্থসম্ভার দ্বারা .. হৃদয়োৎসারিত বক্তৃতামালা দ্বারা। হ্যাঁ .. তিনি এ ভাবেই উম্মতকে দিক নির্দেশনা দিয়েছেন। সত্য পথের সন্ধান দিয়েছেন। তাঁর উদ্দেশ্যে শুধু বলতে চাই:

جزاه الله خير ما يجزي عالما

সমাপ্ত

অনুবাদক পরিচিতি

নাম : ইয়াহইয়া ইউসুফ নদভী
পিতা : ইউসুফ বিন হাতিম রহ.
শিক্ষা :

* হিফযুল কুরআন : মাদরাসায়ে নূরিয়া, আশরাফাবাদ, ঢাকা
* এসো আরবী শিখি থেকে জালালাইন : মাদরাসায়ে নূরিয়া, আশরাফাবাদ, ঢাকা
* মিশকাত : জামেআ কুরআনিয়া আরাবিয়া লালবাগ, ঢাকা
* দাওরায়ে হাদীস : দারুল উলুম নদওয়াতুল উলামা, লখনৌ, ভারত

শিক্ষক : মাদরাসাতুল কাউসার আল-ইসলামিয়া, শ্যামলী, ঢাকা

প্রকাশিত গ্রন্থ :

১. আলোর দিগন্তে- হযরত উমর রা. (অনুবাদ)
২. আল কালিমাত (অনুবাদ)
৩. শিশু-কিশোর সীরাত সিরিজ ১-১০
৪. তুমি সেই রানী (অনুবাদ)
৫. গল্পে আঁকা ইতিহাস ১-৭ (অনুবাদ)
৬. রমজান আমার ভালোবাসা
৭. আবু গারিবের বন্দি (অনুবাদ)
৮. জীবন গড়ার গল্প ১-৩
৯. তোমার স্মরণে হে রাসূল (অনুবাদ)
১০. তুমি সেই রাজা .. তুমি সেই রানী (অনুবাদ)

প্রকাশের অপেক্ষায় :

১. গল্পে আঁকা সীরাত
২. আশারায়ে মুবাশশারা ১-১০

www.almodina.com

সায়্যিদ আবুল হাসান আলী নদভী রহ. সম্পর্কে আরব উলামা-মাশায়েখ ও লেখকদের মন্তব্য :

'শায়খ নদভী .. ইসলামের মহান দাঈ! ইসলামের পক্ষে আজীবন লড়াই করে গেছেন, কখনো কলমের ভাষায় কখনো মুখের ভাষায়! তাঁর জ্ঞান-বুদ্ধি ও অনুভব-উপলব্ধি ছলছল প্রবাহে বহমান ছিলো সঠিক ও স্বচ্ছ ধারায়! সমন্বয়ের প্রশ্ন এলে তিনিই ছিলেন সেরা সমন্বয়কারী! তিনি নববী বংশধারার নির্যাস! তিনি মুহাম্মদে আরাবী'র পরিবারের সদস্য!'

-আবদুল আযিয আল-মোবারক

'শায়খ নদভী .. আল্লামা! দাঈ, উম্মাহর অমর প্রাপ্তি, উম্মাহর অফুরান ভালোবাসা!'

-আবদুল ফাত্তাহ আবু গুদ্দাহ রহ.

'শায়খ নদভী .. ইসলাম ও ইসলামী দাওয়াতের মহা সম্পদ। তাত্ত্বিক নৈপুণ্যে ভাস্বর তাঁর লেখা ও গ্রন্থনা। ইসলামী শরীয়তের গভীর রহস্য ও গূঢ় তাৎপর্য উপলব্ধি করেছিলেন তিনি বড়ো গভীর করে! মুসলিম বিশ্বের সমস্যা চিহ্নিতই করেন নি তিনি শুধু, দরদী বন্ধুর মতো বাতলে গেছেন তার সমাধানও।'

-ড. মোস্তফা আস সিবাঈ রহ.

'শায়খ নদভী .. উম্মতের কল্যাণ-চিন্তায় নিবেদিত এক মহান পুরুষ! তাঁকে জেনেছি আমি তাঁর ব্যক্তিত্বে .. তাঁর কলমে। তাঁর ভিতরে দেখেছি আমি মু'মিনের হৃদয়, মু'মিনের জ্ঞান, মু'মিনের প্রজ্ঞা। হ্যাঁ .. তাঁর ভিতরে দেখেছি আমি উম্মতের কল্যাণ-চিন্তায় নিবেদিত এক মহান পুরুষকে। ভাবতেন তিনি শুধু ইসলামকে নিয়ে, শুধু ইসলামের জন্যে, শুধু ইসলামের সার্থে। এ ছিলো তাঁর জীবনের সবচে' বড় প্রত্যয় ও অঙ্গিকার। আমি আল্লাহ্‌র নামে শপথ করেই বলতে পারি এ আমার অকপট সাক্ষ্য।'

-সায়্যিদ শহীদ কুতব রহ.

'তাঁর লেখক-সত্ত্বায় রয়েছে অপরূপ রূপময়তায় কারুকার্যময় এবং অপূর্ব নন্দনতত্ত্বে উদ্ভাসময় এক ব্যতিক্রমী ধারা ও 'ষ্টাইল'। যা বলতে চান তিনি তা বলেন বড়ো দক্ষতায়, বড়ো হৃদয়ছোঁয়া ভাষায়।'

-আনোয়ার আল-জুনদি

'শায়খ নদভী .. ইসলাম ও ইসলামী দাওয়াতের তরে জীবন বিলিয়ে-দেয়া এক মহান পুরুষ। তাঁর জীবন প্রবাহ, তাঁর সূচনা-সমাপ্তি, তাঁর শুরু-শেষ সবই ছিলো শুধু ইসলামকে কেন্দ্র করে .. ইসলামের দাওয়াতকে ঘিরে।'

-মুহাম্মদ আবদুহু ইয়ামেনী

মেরুল বাড্ডা, ঢাকা, মোবাইল : ০১৭৬২-৫৯৩৩৪৯, ০১১৯৭-৩৯৭৩৩৯, ০১৭২৩-০১৬৬২৬

মধ্য বাড্ডা, মোল্লা পাড়া, আদর্শ নগর, ঢাকা।
ফোন : ০২-৯৮৮১৫৩২, মোবাইল : ০১৯২৪-০৭৬৩৬৫, ০১৭১৫-০২৩১১৮

www.almodina.com